ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ

(প্রথম খণ্ড)

আশা প্রকাশনী, কলিকাতা

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫

লেখকের কথা ৯

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ ১৭

বিচ্ছিন্নতার আলোচনা ৩৪

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে ৫৬

আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা ৬৪

বিচ্ছিন্নতা ভাবনার একদিক ৮২

মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব ৯০

পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব-সমাজচেতনা ও বিচ্ছিন্নতা ১১০

অটোমেশন প্রসঙ্গে ১২২

শিল্পী-মানসে সমকালীন বিরোধের প্রতিফলন ১৩২

শিল্পীমনের ভবিষ্যৎ : মনোবিদের জল্পনা ১৪৪

রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ভূমিকা ১৫৩

দেশে দেশে ছাত্ররোষ, গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা ১৮৪

নয়াবাম মানসিকতার একদিক ২১০

মার্কুস, ফ্রয়েড ও বিপ্লব ২২৭

ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব ২৪৬

বিচ্ছিন্নতা বিপ্লব উন্মত্ততা ২৫৮

শিক্ষা ও বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে ২৭৩

তরুণ বিপ্লবীর পত্র ২৮৫

আক্রামকের মন ও সমাজ ২৯৯

পরিশিষ্ট ৩২৩

ভূমিকা

"মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, একদিকে সে স্বতন্ত্র আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব।" —কথাটি রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাই। কিন্তু কথাটা নতুন নয়। সম্ভবত অস্বীকার করে এমন লোকও বিশেষ নেই। যারা অস্বীকার করে তারা বরং বলে "দুটো নয়, মানুষের মধ্যে দুশো দিক আছে।" অর্থাৎ অগণিত ও অভাবনীয় মানুষের প্রকৃতি। আসলে তারা প্রথমত ওই মূল দুটি দিকের ভেতরকার বৈচিত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেন; দ্বিতীয়ত সেই দুটি দিকের দ্বন্দ্ব-মিলনে, ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের বিচিত্রতর ও পরিবর্তমান ব্যক্তিমানসের কথা বলতে চান। ঠিক কাজই করেন। তবে সাধারণভাবে মূলত দুটি দিককেই তারাও স্বীকার করে। দুয়ে মিলেই প্রকৃত মানবসত্তা। মুসকিল এ নিয়ে নয়, মুসকিল এ দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে, আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে এবং ইতিহাসের বিশেষ পর্বের মধ্যে তাদের আবর্তিত গতিরূপ নিয়ে। কারণ, এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-মিলনে মানব প্রকৃতির বিকাশ, আর সেই দ্বন্দ্বের প্রধান মূল আর্থিক-সামাজিক দ্বন্দ্ব। প্রসঙ্গত মনে রাখতে পারি—রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এই মানবসত্তাকেও মিলিত করে আছে এক বিশ্বসত্তা। কিন্তু বস্তুবাদী বিশ্ববোধও তাঁর কাছে কম সত্য নয়—কারণ, বস্তু বিজ্ঞানে বিশ্বাসও তাঁর তেমনি বলিষ্ঠ। দুই অনুভূতিকে তিনি মেলাতে চেষ্টা করেছেন বরাবর;—শেষ চেষ্টা 'মানুষের ধর্ম'। তাঁর শেষ দিককার চিত্রের প্রকৃতি ও তাঁর ত্রিশের দশক থেকে ক্রম-ঘনায়িত কঠিন অধ্যাত্ম যন্ত্রণার অর্থ না বুঝলেও নয়। তাতে দেখা যায়—যুগ-যন্ত্রণার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও স্পষ্ট সংশয় অস্থিরতা:—'মিলে না উত্তর', আর তার সঙ্গেই এই বোধ—'এ জীবন স্বপ্ন নয়'—এবং সংকল্প—'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ'—নিশ্চয়ই সে বিশ্বাসে চিড় ধরবার মত কারণ ভেতরের বাইরের সংকটের মধ্যেই তখন কবি অনুভব করছিলেন। সেই মানুষের মধ্যেকার দুই দিকের ভারসাম্য ফ্যাশিজম-এর ইতরতায় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবে আঘাত না খেয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিককার কবিতায় যাঁরা সাম্প্রতিক 'একান্ত সাত্তিক' (একজিস্টেনশিয়ালিষ্ট) মতবাদের ছায়া দেখেন, দেখেন 'আংষ্ট' ('angst'), তাঁরা ওই ছায়াটার থেকেও অনেক গভীর যে সত্য—রবীন্দ্রচিত্তের সমগ্রতাবোধ ও বিশ্বমানবতাবোধ—তাকে যথোচিত মূল্য দিতে বিস্মৃত হন। 'সমগ্রভাবে' তাঁরা রবীন্দ্রজীবনও দেখেন না, সমগ্র ভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে চান না। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের মধ্যেও

সম্পূর্ণতার সাধক, যন্ত্রণা-বেদনাকে নিয়েই আনন্দের অন্বেষক, আর 'বিচ্ছিন্নতা'র নয়—সমগ্রতার উপাসক।—এই কথা দিয়েই আমরা আরম্ভ করতে পারি আমাদের দেশে 'বিচ্ছিন্নতা'র বিচার।

কারণ, আমাদের ইতিহাস অজস্র ঘটনায় ভাবনায় পাক খেতে খেতে এসেছে—ঘূর্ণা পথে আবর্তমান ও পরিবর্তমান, আমাদের ভাবনা একটি পরম ভাস্বর আলোক-স্তরে এসে পৌছেছিল। সেই শেষস্তর রবীন্দ্রভাবনা। আমাদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস রবীন্দ্র-ভাবনার মধ্য দিয়ে এরূপে এ যুগের পৃথিবীর বাস্তব ও জটিল অভিব্যক্তিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছে, হতে চেষ্টা করেছে সমগ্র মানব ইতিহাসের অঙ্গ। নিশ্চয়ই মানব ইতিহাসের এই পর্ব এখনো দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ে পৌছয় নি—রবীন্দ্রনাথ তার আভাস পেয়েছিলেন কিন্তু রূপ দেখে যাননি। তথাপি এই ঐতিহাসিক স্তরে নেই ব্যক্তির নির্বিশেষ 'একাকীত্বে'র নামে 'সংযুক্তি'র প্রতি বিরূপতা,—সমগ্রের থেকে সত্তার বিচ্ছিন্নতা এবং অন্ধ বিক্ষোভ ও 'আংষ্ট'।

পৃথিবীর এই সংকটকালে, অবশ্য আমাদেরও ঘরে বাইরে যে সংকট, তাতে আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মন আলোড়িত না হয়ে পারে না। কিন্তু 'আংষ্ট' আমাদের সাহিত্যেশিল্পে সে মন্থনে উদিত হয়েছে, ততটা একথা মনে হয় না, যতটা মনে হয় উদিত হয়েছে আমাদের আত্মার দৈন্যে; তা অনেকাংশে কৃত্রিম। যে রক্তাক্ত অধ্যায় দুই দুইটি মহা সংগ্রামের ফলে পাশ্চাত্য জগতে সম্ভূত, আমাদের সৃষ্টির গায়ে সেই রক্তের দাগ দুফোঁটাও নেই। দ্বিতীয়ত যে সমগ্রতার চেতনা রবীন্দ্র-সাধনা, আমাদের নিজস্ব রিকৃথ, তারও চিহ্ন দেখি না আমাদের এই শিল্প সমাজের বিচ্ছিন্নতাবিলাসে বা অ্যাবসার্ড-মার্কা আদিখ্যেতায়।

নিশ্চয়ই আমার এ কথার অর্থ এ নয় যে, যুগ-সংকট আমাদের স্পর্শ করে না—আমাদের এ দেশের জীবন কোনো মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিত একটি অবাস্তব জগৎ যাতে বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্পের কোনো কাঁপন লাগে না। বরং আমার বক্তব্য ঠিক তার বিপরীত। পুঁথিপড়া 'আংষ্ট' ও পুঁথিপড়া 'বিচ্ছিন্নতা' নয়, শত দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন মানবাত্মার স্বাক্ষর আমরা আমাদের সাহিত্যেও চাই, এবং চাই সেই সঙ্গে মানবাত্মার সেই সামগ্রিক চেতনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দানে ইতিহাসের যে মানববিকাশ এখন অবশ্যম্ভাবী, সমাজে-রাষ্ট্রে যে সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবী বিন্যাস অনিবার্য, চাই তার সম্বন্ধে সচেতনতা; 'মহামানবের অভ্যুদয়ের' উপযোগী সক্রিয় আয়োজন—জ্ঞানে-কর্মে, বিশেষ করে শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে, সেই সচেতন আত্মপ্রকাশ।

'বিচ্ছিন্নতা' আসলে সাময়িক আনুষঙ্গিক লক্ষণ—এবং তা কায়েমি স্বার্থেরই

নানা দিককার চক্রান্তে এত প্রবল ও এত উৎকট। 'আনুষঙ্গিক' হিসাবে যদি আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ উদ্ভূত হয় তবে তাকে খণ্ডিত দৃষ্টির সৃষ্টি, প্রয়াস বলুন,—শ্রদ্ধা না করি তাকে কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা করব না—যদি থাকে তাতে সততার স্বাক্ষর, সৃষ্টির প্রাণবীজ। কিন্তু সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই চাইব বিজ্ঞানের সত্যের স্বীকৃতি, সমগ্রতাবোধ, মহামানবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যুক্তিসমৃদ্ধ জীবন-প্রত্যয়। সংক্ষেপে, চাইব জীবনাগ্রহ,—ফ্যাশন-মাফিক এ্যালিয়েনেশন-কপচানো নয়;—চাইব আমাদের শিল্পীদের আরও একটু নিজে ভাবা, আরও একটু নিজে বোঝা, আরও একটু মানুষকে চেনা। এবং সত্যই নিজেকেও চেনা। কারণ, সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন মানব-বিকাশ তো ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতর অভ্যুদয়ের আয়োজন; সে তো সমূহের নিকট আত্মবলি নয়, নিশ্চয়ই সমগ্রের দিকটা বিচিত্র মানব-সত্তার বিলুপ্তি নয়।

এই বোধ থেকে আমি একদিকে যেমন অনেক সময়েই 'বিচ্ছিন্নতার' তর্কে অনুভব করেছি কতকটা অনীহা, তেমনি বুঝতে চেয়েছি—ইতিহাসের মধ্যে তার উদ্ভবের তাৎপর্য। একদিকে তা সুপ্রাচীন—কিন্তু মানুষ আরও সুপ্রাচীন; আর জন্মগত ভাবেই তো মানুষ সম্বন্ধে সত্য এ কথা—'মানুষ সামাজিক জীব'। সামাজিক না হলে মানুষের উদ্ভবও হ'ত না। দু দণ্ডও থাকত না মানুষের প্রাণ। তার জীবন-সংগ্রামেই তার শ্রমবিভাগ আসে, আসে শ্রেণীবিভাগ, আর আপনার শ্রম থেকে মানুষের আপনারও বিচ্ছেদ। কার্ল মার্কস্ তাঁর সর্বাঙ্গীণ দর্শনে এ্যালিয়েনেশনের এই মূল রূপ দেখেন ও ব্যাখ্যা করে যান।—আর আজ বুর্জোয়া-যুগের শেষে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অদ্ভুত বিকাশের মধ্যে সাম্যবাদী মানব-বিকাশকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে সেই কায়েমি স্বার্থের প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে এই সমাজ-দ্বন্দ্ব তত্ত্ব এক ভয়াবহ পরমাদ রূপে, ফ্যাশিজম্, ইম্পীরিয়ালিজম্ ইত্যাদি নানা বিকৃতিতে। 'এ্যালিয়েনেশন' হয়ে উঠেছে তাদের দর্শনের ও শিল্পের শেষ হাতিয়ার। মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব, যেমন, ফ্রয়েডের পরে নয়া-ফ্রয়েড তত্ত্ব প্রতিক্রিয়াকে জুগিয়েছে হাতিয়ার। একজিস্টেনশিয়ালিজম এনেছে একই সঙ্গে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, আত্মরতি ও নেতিবাদ। এ্যালিয়েনেশন ইতিহাসে এমন কিছু নতুন নয়, তার আতিশয্যের আড়ম্বর নতুন।—আর, তা যুক্তিবাদের, বিজ্ঞানের, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের অস্ত্র। অস্ত্রটা প্রয়োগ করছেন প্রধানত দু'দলে। মহাযুদ্ধে ও আর্থিক সংকটে দিশাহারা পাশ্চাত্য ভাবুকেরা ও শিল্পীরা। কিন্তু অস্ত্রটা গড়ে উঠছে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কামারশালায়; পুঁজিবাদের সংবাদপত্র, প্রচার-প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার

নানা প্রকাশ্য ও ছদ্ম আয়োজনে। মানতে পারি—যাঁরা এই নানাবেশী তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁরা সকলে প্রতিক্রিয়ার অনুগৃহীত, এমন নয়।—কামু আলজেরিয়ান্ স্বাধীনতার সহকারী আবার কমিউনিষ্ট বিরোধীও, সার্ত্র শান্তি ও সংস্কৃতির মুক্তমনা সংগ্রামী শিল্পী; কিন্তু আবার কার্যক্ষেত্রে তেমনি কখনো কখনো বিভ্রান্ত। সততার অভাব এঁদের নেই, শিল্প-সততার তো নিশ্চয়ই নয়। অভাব সমগ্রদৃষ্টির—বাস্তবের সমগ্র তাৎপর্যের উপলব্ধির অভাব। আমাদের এ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের সাংবাদিক সাহিত্যিকদের কার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে, জানি না। তবে স্পষ্টই দেখছি, এ তত্ত্ব অনুগৃহীত হচ্ছে শোষণ-সিদ্ধ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, নানা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরামদায়ী পরিবেশে। কারণ এ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের জীবিকার মালিকও প্রধানত ওসব মালিক-চক্র।

এ কথাও ঠিক: বুদ্ধিজীবীদেরও সাধারণত নিশ্চয়বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা আছে, যুক্তির উপর বিশ্বাস আছে, এবং আছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জাগ্রত জিজ্ঞাসা। তাই তাঁদের জানা দরকার—'বিচ্ছিন্নতার' এই হৈ-চৈটার মূল কী—তার পিছনে যে দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক সমর্থন জোটে, তার প্রকৃত অর্থ কী, কিম্বা কী তার অনুগামী ও সহগামী শক্তি সমূহ,—'ছাত্র-বিক্ষোভ', 'ম্যাস হিসটিরিয়া' প্রভৃতির অর্থ। এবং আমাদের রবীন্দ্রসাহিত্যে ও সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার কী বিভিন্ন প্রতিফলন দেখি—এই বিচার-বিশ্লেষণ আজ আমাদের ভাষায় আমাদের দেশে সকল রকমে প্রয়োজন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ 'মানব-মনের' সম্পাদক বন্ধুবর ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে শুধু তিনি এসব তত্ত্ব আজ এত বৎসর যাবৎ বিচার করেন নি, জীব-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু ক্ষেত্র থেকে, দেশ-বিদেশের বহু সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আলোচনা অনুসরণ করে, তিনি প্রবন্ধে নাটকে অক্লান্ত ভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে বর্তমান জগৎ ও জীবনের সমস্যাকে আমাদের সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক আলোচনা হিসাবেও তা বাঙলা ভাষার এক সম্পদ। আর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসাবে, আমরা 'বিচ্ছিন্নতা'র প্রশ্নের এমন দ্বিতীয় কোনো বিচক্ষণ বিচার বিশ্লেষণের কথা জানি না। যে-কোনো ভাষায় এরূপ আলোচনা অভিনন্দিত হত। অবশ্য বাংলায় তা প্রকাশের দায়িত্ব যাঁরা নিলেন তারা কম সাহস দেখালেন না। আশা করি, বাঙালি পাঠক, আমার মতই লেখক ও প্রকাশককে স্বাগত করবেন এবং তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। ইতি—

৭।১০।'৭৪ **গোপাল হালদার**

লেখকের কথা

বিচ্ছিন্নতার সঠিক সংজ্ঞার্থ-নির্ণয় অথবা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বনিরূপণে কূটতর্কজাল বিস্তার ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। বিচ্ছিন্নতার বিমূর্ত ধারণায় আমার ঔৎসুক্য নেই। বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনা যন্ত্রণা ও তাদের সংযুক্তির আকুতির সঙ্গে আমি পরিচিত; বিচ্ছিন্নতার মূর্তরূপে আমার অনুসন্ধিৎসা। বিচ্ছিন্নতার বিস্তার ও ব্যাপ্তি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়, তাই আমি বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে ভাবিত, চিন্তিত; তাই সমস্যা-সমাধানের সূত্র অনুসন্ধানে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ। পেশায় আমি চিকিৎসক। প্রায় ২৫ বছর ধরে মনের রোগ নিয়ে চর্চা-অনুশীলনে রত। নিউরোটিক-সাইকোটিক-সুইসাইডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাকে বিচ্ছিন্নতার চর্চায় প্রেরণা জুগিয়েছে। পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, প্রজাতি থেকে, সত্তা থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্নতার মূর্ত প্রতীকের সঙ্গে নিত্য-সংস্পর্শে আমি বিচ্ছিন্নতা সমস্যার বাস্তব সমাধানের সূত্র অন্বেষণে সচেষ্ট হব, এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া, সমাজে সুস্থ বলে স্বীকৃত বহু লোকের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ দেখেছি। জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষের মধ্যে মানুষে মানুষে বিভেদ বিযুক্তিরই নিদর্শন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণীবিন্যাস কতগুলি সামান্য দৈহিক, মানসিক বৈশিষ্ট্য, আর্থনীতিক স্বার্থ, অথবা আদর্শবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সংযুক্তির প্রয়াস, অন্যদিকে আবার এই প্রয়াসের ফলে গঠিত গোষ্ঠী সম্প্রদায় শ্রেণী সংগঠন প্রজাতি বিচ্ছিন্নতার কারণ। মানুষকে না হলে মানুষের চলে না, সমাজবদ্ধ না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না, আবার মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। এ-নিয়ে চিন্তানায়কদের ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। প্রজাতিকে সংযুক্ত সমন্বিত রাখার সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগমণ্ডিত আবেদন নিবেদনে সবদেশের সাহিত্যদর্শন সমৃদ্ধ। মানুষ শুধু ব্যক্তিসত্তা নয়, সমগ্র প্রজাতি সত্তা নিজের মধ্যে বহন করে, বলেছেন গ্যয়টে। তাঁর অনেক আগে অন্য একজন দার্শনিক বলেছেন: I believe that nothing human is alien to me." ভারতীয় দর্শন-কাব্যে, সব দেশের মানবদরদীর লেখাতে বাণীতে প্রচারে প্রজাতিকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা বহুকাল ধরে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মানুষ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলেছে। গত শতক থেকে এই বিভেদ বিচ্ছিন্নতা চরমে ওঠে এবং সাহিত্য-

দর্শন-বিজ্ঞান বিচ্ছিন্নতা আলোচনায় মুখর হয়। গ্যয়টে, শীলার, রুশো, ফিকটে, হেগেল, ফয়ারব্যাক প্রমুখ চিন্তানায়করা বিচ্ছিন্নতাবিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই সমস্যার মৌলিক কারণ নির্ণয় ও সমাধানের নির্দেশ তাঁরা দিতে পারেন না। ১৮৪৪ সালে মার্কস হেগেলীয় পদ্ধতিতে, কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে বিচ্ছিন্নতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং পরিণত বয়সের লেখায় বিচ্ছিন্নতাবিলোপের বাস্তব পন্থার নির্দেশ দানে সক্ষম হন।

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ কি?

এ নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা আজ সম্ভব নয়; তবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবিলোপের শেষ পর্বের অনুষ্ঠান চলেছে,—আমার এই বিশ্বাস, মনে হয়, পাঠকদের অনুমোদন লাভ করবে।

আমার বিচারবিশ্লেষণে বা বক্তব্যে মৌলিকত্বের দাবী করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে একথা জানানো উচিত, যে আমার ধারণা বিশ্বাস ও বক্তব্য কেবলমাত্র পুঁথি-কেন্দ্রিক নয়; বহু বিচ্ছিন্ন মানস-বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত।

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ, উৎপাদনসংকট ও বণ্টন-সমস্যার সমাধান নয়; কেবলমাত্র বেকারি অনশন অনাহার অসম-প্রতিযোগিতা দূরীকরণ নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য আরো সুদূরপ্রসারী ও মহত্তর। জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী ইত্যাদির আধিপত্য ও সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে তার অখণ্ড সত্তা প্রত্যর্পণে অভিলাষী এবং সর্বোপরি মানুষকে মানবিক ও ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করা তার প্রতিজ্ঞা। ব্যক্তিমুক্তি ও প্রজাতিসংযুক্তির প্রত্যাশা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। বিচ্ছিন্নতাবিলোপের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে সাম্যবাদে,—ব্যক্তিত্ববিকাশের পূর্ণপরিণতি ও মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায়। মার্কসবাদীরা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এই আশা পোষণ করেন।

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সম্ভাবনা সত্যিই আছে কি? সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি রাষ্ট্রে-স্বার্থে নিবেদিত, সমাজতন্ত্রে 'অলিগার্কির' প্রতাপ অপ্রতিহত;– এই প্রচারের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথমদিককার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভুলভ্রান্তির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছেন বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা এবং তার ফলে বিভ্রান্তি অনেক সৎ ও একসময়ের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষকেও প্রভাবিত করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয়েছে বা ভুলত্রুটি ঘটছে না—একথা বলা চলে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সামাজিক সমস্যার রাতারাতি সমাধান হবে, রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত

করার ফলে অবিলম্বে মেহনতী মানুষের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সবরকমের ভেদাভেদ দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটবে ;—এই যাদুবিশ্বাস মনে মনে যাঁরা পোষণ করতেন তাঁরা এই সব প্রচারের সহজ শিকার হতে বাধ্য। ষ্ট্যালিনের ভুলভ্রান্তি সহসা যখন তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করলেন ষ্ট্যালিনেরই অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা, তখন তাঁদের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সমাজবাদ ও সমাজতন্ত্রকে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের সামিল করে আঁকড়ে ধরেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক নেতাদের যাঁরা অভ্রান্ত ধর্মগুরু ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে করেছিলেন, তাঁরা যে ভেঙ্গে পড়বেন—এটাই স্বাভাবিক। কিছু লোক মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের উপর আস্থা হারালেন, এবং কিছু মার্কসবাদী মার্কসবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ব্যক্তিপূজার ও ষ্ট্যালিনবাদের উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা চললো। বলা হলো, ষ্ট্যালিনযুগে তরুণ মার্কসের লেখার প্রতি আগ্রহ দেখানো হয়নি, বরং বিরোধিতাই করা হয়েছে। তিরিশের দশকে সরকারী মহলে ব্যক্তিসমস্যা, মানব-বিদ্যা ও মানবতার চর্চার সময় বা সুযোগ ছিল না। তাছাড়া তরুণ মার্কসের 'এসোটেরিক' ধরনের ভারিক্কি চালের হেগেলিয় ঢঙে লেখা বেশ দুর্বোধ্য হওয়ার ফলে সাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তরুণ ও পরিণত মার্কসের রচনার মধ্যে প্রকাশভঙ্গী ও চিন্তাধারার পার্থক্য থাকলেও তাঁর প্রধান দার্শনিক ধ্যানধারণার কোনো বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। বরং বলা চলে তাঁর তরুণ বয়সের লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর পরিণত বয়সের রাজনৈতিক আর্থনীতিক বক্তব্য ও বিশ্লেষণ বোঝা অনেকটা সহজসাধ্য হয়। এই কথাগুলো বলেছেন পোল্যাণ্ডের একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক—এ্যাডাম শাফ, তাঁর "মার্কসিজম্ এ্যাণ্ড দি ইনডিভিজুয়াল" পুস্তকে, ১৯৬৫ সালে। যুগোশ্লাভিয়ার জিলাসের মত শাফ্ 'নিউ ক্লাশ'-এর সন্ধান পাননি বটে, কিন্তু তিনি 'পাওয়ার এলিট্'-এর কথা বলেন, যারা জনসাধারণ থেকে অনেক বেশি সুখসুবিধা ভোগ করছে এবং তাদের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

অ্যাডাম শাফের সমালোচনার মধ্যে অসহিষ্ণুতার প্রকাশ আছে একথা বলা বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না। ষ্ট্যালিনের আমলের চরম বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস তাঁকে অভিভূত করার ফলে তিনি লেখেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিপূজার যুগকে চরম বিচ্ছিন্নতার যুগ বলা চলে। মহত্তম মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে জনগণ এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছে, যা তাদের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে এক বিচ্ছিন্ন ধ্বংসকামী শক্তিরূপে তাদের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে নিষ্পেষিত করেছে। রাষ্ট্রনায়ক যখন নিজেকে অভ্রান্ত মনে করেন ও জনগণকে অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেন তখনই রাজনীতিক

বিচ্ছিন্নতার চরম বিকাশ ঘটে। ষ্ট্যালিনযুগের এই ব্যাখ্যায় শাফের সঙ্গে অনেকেরই মতভেদ না থাকার কথা। কিন্তু ষ্ট্যালিনযুগের কঠোর সমালোচনা হবার পরও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ষ্ট্যালিনীয় ঐতিহ্য পূর্বের মতই প্রভাবশালী থাকার সপক্ষে অ্যাডাম শাফ্ কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেননি। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ক্ষমতালোলুপতা অথবা প্রতিবিপ্লবের ভয়, সেই ষাটের দশকে ষ্ট্যালিনযুগের মত প্রবল না থাকারই কথা। মার্কসবাদী হয়েও তিনি মনে করেন না যে, ব্যক্তিসম্পত্তি বিলোপের ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার উপশম হয়েছে। অস্তিবাদী তত্ত্ব প্রচারের জন্য ১৯৫৭ সালে তিনি অনেকের সঙ্গে সার্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। সার্ত্র একটি পোলিশ মাসিকে লিখেছিলেন যে নিঃসঙ্গতাবোধ, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, মৃত্যুভয় ও সুখস্পৃহা—ধনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে সমানভাবেই বিরাজমান। অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সার্ত্রের মতই মনে করলেন যে বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ প্রায় সমানই রয়েছে। তরুণ মার্কস তাঁর 'ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক মান্যাসক্রিপ্টস'-এ যে বিচ্ছিন্নতা নিরসনের কথা বলেছেন, শাফ্ কি সেই বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবছেন? না অন্য কোনো বিচ্ছিন্নতা? শাফ এরিক ফ্রমের বিচ্ছিন্নতার ধারণা দ্বারা ইতিমধ্যে প্রভাবিত হয়েছেন। এই অভিমত আমার নিজস্ব নয়। 'সার্ভে' পত্রিকাকে কোনো মতেই কমিউনিজমের প্রতি অনুরাগী বলা চলে না। এ অভিমত 'সার্ভে' পত্রিকার। (Survey, April, 1966, pp 126-27) সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমবিভাগ বিদ্যমান; এবং শ্রমের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে তার শ্রমমূল্য গ্রহণ করে। এই ব্যাপারে শুধু শাফ্ নয়, অনেকেই বিচ্ছিন্নতার বিশেষ উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করতে চান। শ্রমবিভাগ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং 'উদ্বৃত্ত শ্রমের রাজ্যে' শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মূলে এই শ্রেণীবিভাগ—মার্কস একথা জানতেন। তিনি অখণ্ড মানুষ ও সম্পূর্ণ মানুষের কল্পনা করেছেন, কিন্তু বোধ হয় সেই কল্পনার মানুষ সমাজতন্ত্রে পাওয়া যাবে বলে মনে করেননি। সমাজতন্ত্র অখণ্ড-সত্তার মানুষ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। খাঁটি সাম্যবাদী সমাজে হয়ত সেই মানুষের সন্ধান মিলবে, যে কোনো কাজ যখন খুশী করবার শক্তি ও স্বাধীনতা যার থাকবে! উৎপাদন যতদিন মূলত কায়িক পরিশ্রমনির্ভর ছিল, ততদিন শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমজীবীর দুর্দশা ছিল অপরিমেয়। যান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রম-অপহরণ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের দুর্দশার আংশিক লাঘব ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নয়নের ফলে উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নয়ন ঘটেছে, ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন অন্তত পৃথিবীর এক

তৃতীয়াংশে শুরু হয়েছে এবং সেখানে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজও আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠেনি, ব্যক্তি ঈপ্সিত অখণ্ডতা বা নির্মোহ মুক্তি পায়নি;- বিচ্ছিন্নতা নানাভাবে আজও সেখানে রয়ে গেছে। কিন্তু একথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক পূর্বেকার সমাজের থেকে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে ?

যে সময় আডাম শাফের বইটি নিয়ে বাদানুবাদ চলছে, প্রায় সেইসময় 'সোশ্যালিষ্ট হিউম্যানিজম্' নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সিমপোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এরিক ফ্রমের সুযোগ্য সম্পাদনায় সিমপোজিয়ামের পেপারগুলি প্রথমে আমেরিকা থেকে, পরে লণ্ডন থেকে (১৯৬৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটিতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বর্তমানে আমাদের আলোচ্য। প্রবন্ধের শিরোনামা : 'সোশ্যালিজম এ্যাণ্ড দি প্রব্লেম অফ্ এ্যালিয়েনেশন'। লিখেছেন একজন যুগোশ্লাভিয়ার মার্কসবাদী। নাম প্রেড্রাগ ভারনিস্কি। ভূমিকাতেই তিনি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আশাভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন। বিপ্লব ও বিপ্লবের নেতাদের মনে হয়েছিল মানবমুক্তির অগ্রদূত ; মনে হয়েছিল সব রকমের বিচ্ছিন্নতানিরসনের ক্ষমতা তাঁদের আছে। বিচ্ছিন্নতা মোচনের জন্যই হয়তো সমাজতন্ত্র ! ষ্ট্যালিনযুগে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। এখনও অনেক সমাজতান্ত্রিক নেতা মনে করেন যে সমাজতন্ত্রে বিচ্ছিন্নতাসমস্যা নেই, থাকতেও পারে না। বিচ্ছিন্নতা কথাটি যেন তাঁদের অচেনা।

শাফের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা মিল থাকলেও, দৃষ্টিভঙ্গীর বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। ভারনিস্কি মনে করেন যে ষ্ট্যালিনবাদ রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের পর যে বিপ্লব, সে বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষম। সে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হবে দার্শনিক ও মানবিক প্রশ্নগুলোকে সামনে তুলে ধরে জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া জাগানো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ষ্টালিনের আমলে মানুষের সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ রাষ্ট্র-বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়নি, এর নেতিবাচক ভূমিকা বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা হয়নি। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটিকে অবান্তর মনে করা হয়েছে। অথচ সমাজতন্ত্রে এই প্রশ্নটিই মৌল ও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিচ্ছিন্নতার আলোচনা বা বিচার সমাজতন্ত্রে অবান্তর তো নয়ই, বরং বলা চলে সমাজতন্ত্রে এই সমস্যাই কেন্দ্রীয় সমস্যা। ষ্ট্যালিনবাদে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান কল্পনা করার ফলে রাজনৈতিক আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা চরমে ওঠে এবং ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব হারিয়ে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য বিস্মৃত হয়। ষ্ট্যালিন আমলের সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের বা কমিউনিজমের নিশ্চিত স্তর রূপে

চিত্রিত হবার ফলে এই আদর্শগত বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব, প্রসার। বুর্জোয়া সমাজের সব রকরের প্রশাসনযন্ত্রকে শুধু বজায় রাখা নয়, আরো শক্তিশালী করে তুলে বিচ্ছিন্নতা-বিলোপ সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শেষ হয়েছে—এই ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর প্রচার জণগণকে আদর্শগত ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে।

ভারনিস্কির ষ্ট্যালিন আমলের বিবরণের সন্দেহ প্রকাশ না করেও বলা চলে যে ঐসময়কার রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতার বিশ্লেষণে তিনি শাফ্-এর মত অসহিষ্ণু না হয়েও কার্যকারণের মূলে পৌঁছুতে পারেননি। তিনি স্বীকার করেছেন যে, সমকালীন সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও অন্যান্য দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির দরুণ সমাজতন্ত্রকে এমন অনেক বিধিব্যবস্থা ও সাময়িক নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতদিন শ্রেণীসমাজ ও শ্রেণীরাষ্ট্রের প্রভাব থাকবে ততদিন যুদ্ধযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নানাদিকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে খর্ব করতে হয়, যুদ্ধকালীন নিয়মানুবর্তিতাকে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিতে হয়। কিন্তু তিনি রুশ জনগণের সামন্ততন্ত্রীয় মানসিকতা ও নিরক্ষরতা, বিদেশী সাহায্যের অপ্রতুলতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেননি। একটি বৃহদায়তন অনগ্রসর দেশের শিল্পায়নক্রিয়ার ফলে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ছিল। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক আমলে পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য যে কঠোরতা ও নির্মমতার প্রয়োজন ঘটেছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে সোভিয়েটে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ষ্ট্যালিন-আমলের বিচ্ছিন্নতা-ব্যাখ্যায় এই সব দিকগুলিও বিচার্য। মনে রাখা দরকার, এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি, আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে বিচ্ছিন্নতা বিলোপের অনেক শর্ত গড়ে উঠেছে, একনায়কত্বের প্রভাব ও কুফল সম্পর্কে পার্টি ও জনসাধারণ সজাগ হয়েছেন। এশট্যাব্লিশমেণ্ট-বিরোধিতার কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সমাজতন্ত্রের সমাজেও শুরু হয়েছে। পার্টির গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের কথা তোগলিয়াত্তির পরও দু'একজন নেতার মুখে শোনা গেছে। পার্টির মধ্যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, নেতাদের আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বাভিলাসী আচরণের ও ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইতালী ও ফরাসী পার্টির মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে উঠেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়ে বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন, পরিকল্পিত সমাজ গড়ার প্রাথমিক পর্যায়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যগামিতার নৈতিকরণ ঘটবে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ও বিজ্ঞানের সর্বাত্মক প্রয়োগের ফলে। শ্রেণীহীন সাম্যের সমাজ শাফ বা ভারনিস্কির ইচ্ছামতো

গড়ে উঠবে না। Kingdom of freedom সৃষ্টি করার বাস্তব শর্তগুলোর বিকাশের জন্য একদিকে যেমন সতত সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি আবার ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষাও করতে হবে। কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার স্পৃহা কিছু লোককে বিপথে চালিত করবে না, এমন নয়। আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। প্রয়োজন হবে মানসিক ও সংস্কৃতির জগতে বিপ্লবস্রোতকে প্রবাহিত করার।

সমাজতন্ত্র থেকে উচ্চতর ব্যবস্থায় উত্তরণের সহায়ক দ্বিতীয় প্রযুক্তিবিপ্লব শুধু যে উৎপাদনে বিপ্লব ও প্রাচুর্য এনেছে তাই নয়, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি মানসিক জগতেও বিপ্লবের সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কশ্রমের চাহিদা ও প্রয়োগ বাড়ছে, সাধারণ শ্রমিককেও উৎপাদনে সংযুক্ত হতে হলে আগের তুলনায় অনেক বেশি সাধারণ ও প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করতে হচ্ছে, কাজের সময় কমছে ও বিশ্রামের সময় বাড়ছে, শ্রমবিভাগের ক্রমবিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিচালনা ও প্রশাসনে কমপিউটার ও সাইবারনেটিক্সের প্রয়োগে পরিচালনা ও প্রশাসনের মূলনীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে চলেছে। নতুন প্রযুক্তিবিপ্লবের ফলে পাওয়া কৃৎকৌশলের সর্বাত্মক প্রয়োগে একদিকে যেমন সংবাদ ও তথ্যের কেন্দ্রীভবন ঘটছে এবং ক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণে, নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে; অন্যদিকে তেমনি আবার তথ্যসংবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হবার ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। গণকযন্ত্র টেইলর (F. W. Taylor : যিনি পঞ্চাশ বছর আগেকার যান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় উদ্যম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রাধান্যকে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করেছিলেন) প্রণালীর উপযোগিতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

সমাজতন্ত্রে বিচ্ছিন্নতা আছে একথা অস্বীকার করলে সমাজতন্ত্রেরই ক্ষতি করা হয়। পণ্য-উৎপাদনে শ্রম করতে হয়, পরিচালকের নির্দেশ মানতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ সমাধা করতে হয়। সমাজের নীতি ও পার্টি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়। এ সবই বলা চলে বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন। কিন্তু আদর্শ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাজাত ও বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতা নিরসনে সচেষ্ট থাকবে। সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তিমানুষ, সমাজতন্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এই ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছিন্নতা-বিলোপ ও মুক্তি। রাষ্ট্রকে হতে হবে প্রধানত সেই কাজে নিযুক্ত। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ক্রমশ বেশিসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণের সুযোগ

পাবে। শিল্পায়নের প্রথমদিকে পরিচালক ও বিশেষজ্ঞের যে আধিপত্য ও প্রভাব ছিল, কমপিউটার সাইবারনেটিকসের দৌলতে সেই আধিপত্য ক্রমশ লোপ পাবে। ব্যক্তি যন্ত্রাঙ্গ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হবে এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সঙ্কুচিত হবে। সমাজতন্ত্রে সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ ব্যক্তিমানসকে ঐশ্বর্যশালী করবে; এই ঐশ্বর্যশালী মানুষ ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি, প্রকৃতির নিয়ম, আত্মোন্নয়নের পদ্ধতি, পরিবার-জাতি-বর্ণের গণ্ডী অতিক্রমণের উপায় সম্পর্কে অবহিত হবে। যন্ত্র ও মানুষ, বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও সমাজ, মানুষ ও প্রজাতির মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। নেতিকরণের নেতিকরণ ঘটবে। তবে এসব কিন্তু আপনা থেকে ঘটবে না, ঘটতে পারে না। আমলাতান্ত্রিকতা, পেটি বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, অতিবামপন্থী নৈরাজ্যবাদ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হবে। বিচ্ছিন্নতা দূর করার সকল প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে।

সমাজতন্ত্রে শ্রেণী নেই বটে, কিন্তু সংগ্রাম আছে এবং থাকবে। রাষ্ট্রকে বিকশিত করে ধীরে ধীরে তাকে বিনাশের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ দায়িত্ব সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের।

এ-দায়িত্ব নিতে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ এগিয়ে আসছেন কি? এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট নেতিকরণের, উৎপাদনের ক্রমবিকেন্দ্রীকরণ ও অটোমেশনের দ্রুত সম্প্রসারণের চেষ্টা তাত্ত্বিক স্তরে থেকে রূপায়নের স্তর পৌঁছেচে কি? বিচ্ছিন্নতা নিরসনের আন্তরিক প্রয়াস শুরু হয়েছে কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী খণ্ডে দিতে চেষ্টা করব।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুডে লেখা। বিভিন্ন নামে 'মানবমন' ও আন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবু মনে হয়, এদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বিদ্যমান আছে। পরিমার্জিত করার পরও কিছু কিছু পুনরুক্তিদোষ রয়ে গেছে। তারজন্য পাঠকদের কাছে আগেই ত্রুটি স্বীকার করছি।

প্রীতিভাজন অরুণাচল বসু সম্পাদনা ও প্রুফ দেখার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখা ও আনুষঙ্গিক কাজে সাহায্য করেছে। পরিশেষে মুদ্রাকর প্রেসের রবীন্দ্রনাথ দাশ ও প্রকাশক শীলা ভট্টাচার্যকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ

মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কের মত আমরা প্রচণ্ডবেগে অবস্থানকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। পুরানো মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। স্ববিরোধী কার্যকলাপ ও অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। ধর্ম, কর্ম, মন্ত্রতন্ত্রের রক্ষাকবচ যন্ত্রযুগের ভূতপ্রেতকে তাড়াতে পারছে না। মন্দির, মসজিদ, গীর্জার চত্বরে ভীড় বাড়ছে বটে, কিন্তু আশ্রয় মিলছে না। অজস্র প্রশ্ন জাগছে, উত্তর দেবার গুরুদেবের অভাব। সমস্যা অনেক, সমাধানের ইঙ্গিত নগণ্য।

এ অভিযোগ আজকের নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবীদের মনে এ অভিযোগ জমে উঠছিলো; আজকে এর প্রাবল্য ও বিস্তৃতি—দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের লেখায় প্রায়শই দেখতে পাচ্ছি একই ধরনের বিলাপ। সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নিদারুণ সংকট দেখা দিয়েছে, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ ব্যক্তিকে জীবনবিমুখ করে তুলেছে, মানবিক সম্পর্ক দূষিত হয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে, সামাজিক ও নৈতিক মান নেমে এসেছে, মানবিকতার মর্যাদা ছেড়ে দ্রব্য ও অর্থের মর্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

শিল্পে-সাহিত্যে এরই অনুরণন। টি, এস, এলিয়ট লিখেছেন, "And now you live dispersed....And no man knows or cares who is his neighbour!" আর এক জায়গায়, "Do you know—it no longer seems worthwhile to speak to anyone. No, it is not that I want to be alone. But that everyone's alone—or it seems to me." সম্প্রতি গল্প উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে তাই বারবার 'আউটসাইডার'-এর দেখা মেলে। কলিন উইলসন বলেছেন, এই 'আউটসাইডার' জীবনের ফাঁকি ধরে ফেলেছে। সামঞ্জস্যহীন জীবন! শৃঙ্খলা নেই জীবনে!

বারবুসের 'লা এনফার'-এর নায়ক তাই একটা হোটেলের ঘরে, জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, একটা ছোট্ট ফোকরে চোখ রেখে চলমান জগতের দিকে তাকিয়ে আছে। এইভাবেই নাকি সে জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। সে দেখছে বিশৃঙ্খলা আর ছন্দপাত! আনন্দ নেই, নেই ভবিষ্যৎ। এইচ, জি, ওয়েলস্-এর "Mind At The End of Its Tether" এ-ও সেই একই স্বর ধ্বনিত হয়েছে......"The end of everything we call life is close at hand and cannot be evaded." আলবার্ট কামুর 'লা এসট্রেনজারে', হেমিংওয়ের প্রথমদিকের লেখাতেও সেই একই কথা: শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা,......আর মনের বিক্ষিপ্ততা! জ্যঁ পল সাত্র্র একটি গল্পের নায়ক রোকোয়েনটিন-এর ভাষায় বলা চলে—"The nausea is not inside me; I feel it out there, in the wall, in the suspenders; everywhere around me. It makes itself one with cafe; I am the one who is within it". পচন ধরেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে...দুর্গন্ধে বমনোদ্রেক হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাদের দেশের সাহিত্যেও হালে এই ধরনের চরিত্র আমদানির চেষ্টা চলেছে এবং সে চেষ্টাটা চলছে প্রগতিবাদের নামে, নতুনত্বের অজুহাতে।

ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ যে ঘটেছে ও সমাজমানস থেকে ব্যক্তিমানস ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে—এনিয়ে দ্বিমত নেই। খণ্ডিত সত্তার প্রতিফলন দেখছি শুধু সাহিত্যিকদের লেখায় নয়, মানুষের জীবনেও। দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা জীবনকে অস্থির করে তুলেছে।

একদিকে সমাজজীবনে বিরাট সম্ভাবনা ও সাফল্যের ইঙ্গিত সূচিত হচ্ছে,

অন্যদিকে অসাফল্য ও নৈরাশ্যবোধ ব্যক্তিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। নিউরোটিক ও সুইসাইডের সংখ্যা দ্রুত-বর্ধমান। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অঙ্গীকৃত হলেও, থাকছে অলভ্য রাজ্যে। তাই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ব্যক্তি সমাজজীবন থেকে। সব কিছু ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে অন্ধ বিদ্রোহের নেশায় অথবা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর না হয় উন্মাদ আশ্রমের অতিথি হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করছে।

দার্শনিক মহলে সাড়া জেগেছে। অস্ত্রে শান দিয়ে নতুন লড়াই-এর জন্য সবাই প্রস্তুত। পজিটিভিষ্টরা ম্যাক্-এর দেউলিয়া তত্ত্ব নবকলেবরে হাজির করেছেন। একশো বছরের পুরানো কিয়েরকেগার্ড-এর অস্তিত্ববাদতত্ত্ব জেসপার, সার্ত্র, মারসেল, কামু প্রমুখের দৌলতে নতুন জৌলুষ নিয়ে জ্বলে উঠেছে। এঁরাই বোধ হয় বর্তমানে সব থেকে বেশী সক্রিয়।

"আমি আছি"—শুধু এইটুকু সত্য, আর সব ধোঁয়া। বিচার-বিবেচনা, কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ণয়—এঁরা বলছেন, অর্থহীন। জাগতিক সবকিছু বর্তমান সমাজবুদ্ধির অগম্য, রহস্যময়। মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এঁরা চান না, কেন না সেটা অসম্ভব; মানুষ তো বিচ্ছিন্ন হয়েই আছে, বলতে গেলে শত্রুপুরীতেই বাস করছে। সমাজ আর রাষ্ট্রের দাপটে ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে। এ বিচ্ছিন্নতার তরঙ্গ রোধিবে কে? পারমাণবিক যুদ্ধরোধের প্রয়োজনই-বা কি? মরতে শেখাই এই অস্তিত্ববাদীদের জীবনদর্শন। কামুর ভাষায়, "Death and the absurd are here the principles of the only reasonable freedom."

ধর্মধ্বজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য জেগেছে। ধর্মরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশায় এঁরা মেতে উঠেছেন। নতুন ধর্ম, নতুন দুর্গ গড়বার আশায় পশ্চিমী পণ্ডিতগণ ইষ্টার্ন মিষ্টিকদের জীবনী লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। বিজ্ঞানযুগের মিথ্যা অভিমান ছাড়বার জন্যে মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন। যন্ত্র ছেড়ে আবার তন্ত্র-মন্ত্রের যুগে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? গেল কয়েক বছরে ওদেশে ক্যাথলিক পার্টিগুলির প্রভাব বেড়েছে। এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পানাকাঙ্ক্ষীর ভিড়ও বাড়তির দিকে। জগন্নাথের স্নানযাত্রায় বা কুম্ভমেলায় পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও কমেছে বলে মনে হয় না। গুরুদেব, গুরুদেবীদের ভক্তসংখ্যা যে বর্ধমান, একথা পরিসংখ্যানের সাহায্য না নিয়েও বলা চলে। কিন্তু তবুও তো কমছে না

নিউরোটিক সুইসাইডের সংখ্যা। মনের ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যাচ্ছে না। জীবনতৃষ্ণা মিটছে না। নীতিবোধ ও মানবিকতাবোধের উন্নতি হচ্ছে কোথায়? কালোবাজারি ও ঘুষখোরের আধিপত্য সমানে বেড়ে চলেছে, আর তেমনি বেড়ে চলেছে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের ব্যাদানবিস্তার। সেই বিস্তার সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে থাকলেও তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, যে সব বিধি-বিধান ও প্রতিষ্ঠান অন্য এক যুগের জনকর্ম ও অভ্যাসকর্মের ওপর গড়ে উঠেছিলো, এযুগের সমস্যা সমাধানে তারা অপারগ। এ যুগের মানবিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে তারা অক্ষম।

হাহাকার ছেড়ে এবার প্রতিকারের কথায় আসা যাক্; রোগের কারণ নির্ণয় তার আগে দরকার। উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও, বুদ্ধিজীবীরা (যখন অস্তিত্ববাদ ও নির্জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হননি) এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অসুস্থতা বলে মনে করতেন। শীলার, কোলরিজ বা শেলীকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা হোত। ভ্যানগগ একটা বৈচিত্র্য। সাধারণ মানুষ এমন হয় না। কিন্তু ক্রমশ এই রোগের বিস্তার ঘটতে লাগলো। বিশেষ করে, প্রথম মহাযুদ্ধ মানুষের নীতিবোধকে দিল বেশ বড় রকমের নাড়া। ঠিক এমনি সময়ে ফ্রয়েডীয় 'নির্জ্ঞান মনের' তত্ত্ব ইউরোপ থেকে আমেরিকায় আমদানি হয়েছে। সেখানকার মনস্তাত্ত্বিকেরা জেমস-এর 'মানসিক অন্দরমহলের' আধুনিকতম সংস্করণ হিসেবে 'নির্জ্ঞান-তত্ত্ব'কে বরণ করে নিলেন। ডলারপুষ্ট ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ইউরোপে পুনঃরপ্তানী হয়ে ভাল বাজারই পেল। নৃশংসতার, জিঘাংসার, ঈর্ষা-দ্বেষের কারণ তাঁরা খুঁজে পেলেন মানুষেরই মনের গভীরে। দয়া, মায়া, প্রেম ইত্যাদি মানবিক সম্পর্কবোধ আসলে সমাজসভ্যতার একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র। আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিসর্বস্ব মানুষকে কতটুকুই বা সামাজিক করা যায়? সামাজিকীকরণের মূল্য আবার নিউরোসিস। অসম্ভব এই নির্জ্ঞান মনের দুর্বার প্রবৃত্তিকে বাঁধ দিয়ে আটকাবার চেষ্টা। ক্যানিউট-এর সাগরতরঙ্গ রোধের চেষ্টার মতই হাস্যকর। নিউরোটিক, সুইসাইড ও সমাজদ্রোহীর দল নতুন করে নিজেদের বুঝতে শিখল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দৌলতে। **"It is human nature that is wrong, not me!"**—ভাবল তারা। বেশ একটা আত্মপ্রসাদ এল। এ ছাড়া ফ্রয়েডের রতিসর্বস্ব তত্ত্বের একটা আলাদা মাদকতাও ছিল। বুদ্ধিজীবীরা এতদিনে যেন হদিশ পেলেন সমাজবিন্যাসের। ফ্রয়েডের মতে

"Man constructs his world out of appearances and science is the description and organisation of these appearances" । এই সাবজেকটিভ ধ্যানধারণার প্রসারে বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতাবোধ প্রশ্রয় পেল। নিউরোসিস ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম; এই ধারণা জন্মাল মানুষের মনে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইয়োরোপে ফ্রয়েডীয় প্রভাবে ভাঁটা পড়লেও আমেরিকায় এখনও চলছে পূর্ণ জোয়ার।

কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় ফ্রয়েডের তত্ত্বে নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে মানবতাবোধের পুনর্জন্মের জন্য হাহাকার তুলেছিলেন সমাজ-প্রেমিকের দল, ফ্রয়েড-তত্ত্ব সেই মানবতাবোধকে দিল প্রচণ্ড আঘাত। তিনি বললেন, "Society was now based on complicity in the common crime [of patricide] ; religion was based on the sense of guilt and morality was based partly on the exigencies of this society and partly on the penance demanded by the sense of guilt." নীতিবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আশা ফ্রয়েডবাদে নেই—অত্যন্ত নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর সকলেই সেটা বুঝলেন। তাছাড়া ১৯৩২ সালে আইনষ্টাইনের কাছে তিনি লিখলেন—যুদ্ধ এড়ানো যায় না। "It seems quite a natural thing, no doubt it has a good biological basis, and in practice it is scarcely avoidable." এর পর ফ্রয়েডবাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আর কিছুই রইল না।

তবু কিন্তু অনেকে আজও ইয়ুং, এ্যাডলার, ফ্রমকে নিয়ে মাতামাতি করেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে অতি সামান্য পার্থক্য এঁদের। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রায়ই এঁদের উদ্ধৃতি দেখা যায়। তাই এঁদের কথা তুলতে হচ্ছে।

ইয়ুং সম্বন্ধে একজন আমেরিকার লেখক বলেছেন, "Freud actually walked this path for a long distance himself. He went to the length of postulating unconscious fears of incests and castration that we supposedly inherited from our barbarous ancestors, Jung carried this theory of a 'racial unconscious' even further to the point of imagining

superior and inferior peoples. He carried his theories to their logical conclusion and accepted an official position from the Nazis [Furst, J, 1954 : pp 65] অলমিতি বিস্তারেণ। আর এ্যাডলার আমদানি করেছেন ক্ষমতাসর্বস্বতা, ফ্রয়েডের কামসর্বস্বতার বদলে। নীৎসে এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী। ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষমতালোলুপ। সমাজে অমানবিক যত কিছু ক্রিয়াকলাপ—এই ক্ষমতালোলুপতাই তার মূলে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্নতাবোধের মূলে রয়েছে ক্ষমতা না পাওয়ার দরুণ বিষণ্ণতা ও হীনমন্যতা। এ্যাডলারের এই বাণী সমাজের আসল সমস্যা থেকে মানুষের নজর সরিয়ে আনার একটা অপকৌশল মাত্র। যে সমাজের প্রতি তিন জনে একজন উপবাসী, যে সমাজে শতকরা তিরিশ জনের মাথার ওপর আবরণ নেই; সেখানকার সকলে ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে আছে বলা মানুষকে অপমান করা। সমাজের ওপরতলার লোভের লড়াইকে সকলের লড়াই বলে চালাবার চেষ্টা আর পশুজগতের 'স্ট্রাগল ফর এক্‌জিসটেন্স' তত্ত্বকে মানুষের সমাজে প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা—একই ধরনের অজ্ঞানতা অথবা ভণ্ডামি।

এরিক ফ্রম গেল শতকের পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো ও বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন, ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার পর থেকে তার ভিতর যে-সব গলদ দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে যে সব গলদ আজ দূষিত ঘায়ের মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সে সব গলদের দিকে ফ্রমের নজর পড়েনি তা নয়; তিনি "Escape From Freedom"-এ এই তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে ধনতন্ত্র মানুষকে দিয়েছিলো মুক্তি, দিয়েছিলো স্বাধীনতা; কিন্তু সে মুক্তি মানুষের সইল না, তাই সে স্বেচ্ছায় ফ্যাসিবাদের একনায়কত্ব বরণ করে নিয়েছে! ফ্যাসিজমের উদ্ভবের এই উৎকট তত্ত্ব অধিকাংশ মানুষ মেনে নেবেন না, আমি বিশ্বাস করি। এখানেও দেখতে পাই সেই পুরানো ফ্রয়েডীয় ধারণার প্রভাব। সেই সনাতন সহজাত প্রবৃত্তির নয়া জয় জয়কার, অবশ্য একটু প্রচ্ছন্নভাবে। 'সমাজতন্ত্রকে' বিকল্প সমাজব্যবস্থা হিসেবে ফ্রম অভিনন্দিত করলেও সে ব্যবস্থা গড়ে উঠবার যে পন্থা নির্দেশ করেছেন তাকে ইউটোপিয়ান ছাড়া কিছুই বলা চলে না। নতুন সমাজ গড়ার আগে এই "Sick society"র প্রতিটি ব্যক্তিকে মনসমীক্ষা দ্বারা সুস্থ করতে হবে—এ পরিকল্পনা উদ্ভট।

ফ্রয়েডপন্থী সমাজতাত্ত্বিকরা অনেক সময় বর্তমান সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতির কথা তুলেছেন, একথা সত্যি। তবে তাঁরা সাধারণভাবে শিশু-মাতা সম্পর্কের বিকৃতি ও শৈশবকালীন বঞ্চনা হতাশাকেই নিউরোসিস-তথা বিচ্ছিন্নতার একমাত্র বা প্রধান কারণ বলে উপস্থাপিত করেছেন। মীড বলেছেন, মানুষের চরিত্র গঠনের মূলে আছে—"nursing, weaning, toilet training and infant feeding"। শৈশবে এর যে কোন একটির বিশৃঙ্খলা ঘটলে মানুষ অসামাজিক ও মনোবিকারগ্রস্ত হতে বাধ্য।

মনে হয় মীড বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণী সংঘাত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে এড়িয়ে যাবার জন্য শিশুর জৈব প্রয়োজনবোধকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এ্যাডলারের কথা আগেই বলেছি—শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতালোলুপতাকে তিনি সর্বমানবিক সহজাত প্রবৃত্তি বলে মনে করেছেন। আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তির চেয়ে একে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে করে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

এ্যাডলার বলেছেন, "The social feeling exists within us and endeavours to carry out its purpose, it does not seem strong enough to hold its own against all opposing forces"।

বিচ্ছিন্নতার কারণ নির্ণয়ে বা প্রতিকার পরিকল্পনায় ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই আসছে না। বরং মনে হয়, ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণা মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে।

বিচ্ছিন্নতার মূল কারণের হদিশ কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানই দিতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান পাভলভের মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্র—বিষয়গত (objective) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পুষ্ট।

সমাজকে বুঝতে গিয়ে পাভলভের পূর্বসূরীরা দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। প্রাকৃতিক বিবর্তন আর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা মস্ত বড় গুণগত পার্থক্য এঁদের চোখে পড়েছে। প্রকৃতি আপনা থেকে বিবর্তিত হচ্ছে—আর সমাজ পরিবর্তনে মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। মানুষ এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র নয়। "Everything that sets men acting must find

its way through their brain" (এঙ্গেলস)। মানুষ কাজ করে সজ্ঞানে, পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী, নিৰ্জ্ঞান মনের অন্ধ জৈব-প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়। বাবুই পাখীর বাসা বাঁধা, মৌমাছির চাক গড়া—এগুলো পাভলভের ভাষায়, আনকনডিশন্ড্ রিফ্লেক্স বা ইন্‌স্‌টিংটিভ অ্যাকটিভিটি।

"What distinguishes the worst of architect from the best of bees is in this that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality" (মার্কস)। সে তার শ্রম দিয়ে নিরন্তর সজ্ঞানে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে। শুধু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বললে ঠিক হবে না। "He not only effects a change of form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives the law to his modus operandi" (মার্কস)। মানুষ কাজ করে তার জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষ কাজ করে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ চিরদিন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের পাঁচ বা সাতসালা পরিকল্পনা সেই উপলব্ধির সম্প্রসারণ। মানুষের আচার ব্যবহারের সব সময় একটা উদ্দেশ্য ও অর্থ আছে। আর সেই উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝবার জন্য অবচেতন মনে অবগাহন করার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্য ও অর্থ সময় সময় অনুমান সাপেক্ষ হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির বোধগম্য। সামাজিক স্থিতি ও পরিবর্তন মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যকলাপ-লব্ধ ফল। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে, সামাজিক পরিবর্তন অনেকাংশে বিষয়ীগত (subjective)। মোট কথা সমাজে যা ঘটছে—তার জন্য ব্যক্তিই দায়ী ;"Man must be made to understand that he is both creator and master of the world, that on him rests the responsibility of all that is evil in the world, and that to him belongs also the glory for all that is good in life" (গোর্কী)। তবে এটাও মনে রাখা দরকার খেয়ালখুশিমত এই উদ্দেশ্য আরোপ করা চলে না, খেয়ালখুশিমত পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

সব অবস্থায় সব কিছু করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বহির্বাস্তবের ওপর নির্ভর না করে যদি শুধু কল্পনার ওপর নির্ভরশীল হয়, আমরা তাকে বলি—

ইউটোপিয়ান। অতীতের শ্রমলব্ধ ফল বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ সেই বর্তমানকে পূর্বলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির খাতে প্রবাহিত করে নিয়ে চলে ভবিষ্যতের ফল-সমুদ্রের দিকে, লাভ করে নতুন জ্ঞান। নতুনতর, মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপিত হয় তার পরিকল্পনায়, তার ক্রিয়াকলাপে। সামগ্রিক আচরণের রূপান্তর ঘটে, নতুন মানবিক সম্পর্ক স্ফুরিত হয়। পুরানো দিনের নীতিবোধ, মূল্যবোধ, অভ্যাসকর্ম, যদি চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ; তাকে ভেঙে-চুরেই মানুষ এগিয়ে চলে। গড়ে ওঠে নতুন অভ্যাসকর্ম, নীতিবোধ ও মূল্যবোধ। এই ভাবেই সমাজে রূপান্তর ঘটছে কখনও দ্রুত জেট প্লেনের গতিতে, আবার কখনও ঠিক উল্টো, তুলকি চালে, পাল্কি চলার ছন্দে,—মৃদু গতিতে। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে যদি বিভ্রান্ত করা না হয় অথবা সজ্ঞানে পরিকল্পিত পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের পথে যদি স্বার্থান্বেষীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাধা না আসে, তবে সামাজিক রূপান্তর ও ব্যক্তিমানসের তদনুযায়ী পরিবর্তন [যথা নতুন কার্যক্রম ও ধ্যানধারণার উপলব্ধি] অনেকটা সহজভাবে ঘটতে পারে ও ঘটেও থাকে।

কিন্তু বাধা আসছে। পরিকল্পনামাফিক উৎপাদন ও তদনুযায়ী সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের প্রধান বাধা পুরানো ব্যবস্থায় লাভবান ব্যক্তি-মালিকানার প্রবক্তাদের তরফ থেকে আসছে। ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত তীব্রতর হচ্ছে, মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠিত যৌথশ্রমের মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন হচ্ছে, অথচ উৎপন্ন পণ্যের ভোগ বণ্টনে বা উৎপাদনের পরিকল্পনায় শ্রমিকদের কোনো অধিকার থাকছে না। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিক ও তিক্ততর হয়ে উঠছে। পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির ও সহৃদয়তার অভাব ঘটছে। নতুন পরিস্থিতিতে উৎপাদনের ব্যক্তি-মালিকানা ও পণ্যের বণ্টনবৈষম্য—ক্রমশ অচল বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতা কি উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্য ও বৈপরীত্যের ফল ? গত কয়েক বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। আণবিক বিস্ফোরণকে আয়ত্তে আনতে পারার ফলে অমিত-শক্তির অধিকারী আজ মানুষ। ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত উন্নতির ফলে যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা আজ সহজ, সুলভ। সামনে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত—যার আভাসে আজ মানুষ মাত্রই চঞ্চল। বিজ্ঞানের এই নববিপ্লবলব্ধ তথ্য-কৌশল প্রয়োগে সব রাষ্ট্রই তৎপর। কারিগরী ও বিজ্ঞানশিক্ষার নতুন পাঠক্রম তৈরী হচ্ছে দেশে দেশে।

রাষ্ট্রনায়করা বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করতে। ফলে মানুষের পুরানো শিক্ষা যে মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে তুলছিল, সেগুলো নতুন শিক্ষার সংঘাতে ভেঙে পড়ছে। মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট নির্দেশ আজ কোন কৌশলেই গোপন রাখা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের নাট্যশালায় পট-পরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত—এত দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রেখে দর্শকদের মেজাজ পরিবর্তন হচ্ছে না, কারণ মেজাজ পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় কোন চেষ্টাই নেই। নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ স্তম্ভিত। অতীত বর্তমানের চিন্তাভারপিষ্ট, নিরাপত্তাহীন জীবনের উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি ভেঙে পড়ছে ; কিন্তু কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপযোগী মানসিকতা ও হৃদয়বৃত্তি গড়ে উঠছে না। বাধা দিচ্ছে অতীতের প্রেত—মালিকানার স্বার্থ আর সেই স্বার্থপুষ্ট কৌশলী অপপ্রচার।

পরিবর্তনের দ্রুততা বা যন্ত্রদানবের স্বাধিকার প্রমত্ততা এ বিচ্ছিন্নতার কারণ নয় ; যতই বলুন না কেন রক্ষণশীল সমাজতান্ত্রিক মনস্তাত্ত্বিকদল। কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র। এই প্রসঙ্গে রবার্ট কারাওয়ে বলেছেন "The primary source of 'alienation' is the development of social production accompanied by a growing division of labour........ private ownership and the break-up of society into hostile classes led to a situation in which the social division of labour 'alienates' from the workers some of the vital functions inherent in man's intellectual activity, the freedom to dispose of the product of his own labour, to have a say in the management of production etc ......" (World Marxist Review, October 1960)। কায়িকশ্রম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা আবার শ্রমিকদের নেই বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করবার সুযোগ সুবিধা। কারাওয়ে এই প্রবন্ধে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষ [বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সকলেই] পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তার শ্রমলব্ধ ফলের ওপর অধিকার হারিয়ে ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছে। সে শ্রম করে যান্ত্রিকভাবে। যন্ত্রেরই একটা ছোট দাঁতে আটকে গিয়ে যন্ত্রের গতির সঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থ ও উদ্দেশ্য আরোপিত হচ্ছে না তার কাজে, কাজেই তার আচারব্যবহারেও

দেখা দিয়েছে অর্থহীন বিশৃঙ্খলা। বিচ্ছিন্নতার কারণ যন্ত্র নয়, যন্ত্রকে উদ্দেশ্য-পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করার স্বাধীনতার অভাব। অন্যত্র ঐ প্রবন্ধেই আছে, "Capitalism signifies the domination of things over man : under capitalism the social and personal relations between people are dominated by these things not only in their minds, but also in reality, all the way to every day life.......In a milieu where everything is bought and sold, the bourgeoisie marries not the woman but her dowry, friends are made for what can be got out of them, the thought of the legacy ousts love of parents ; man is not respected for his personal qualities but for his wealth or for the position he occupies ......" এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের জন্য শ্রম নয় ; শ্রমের জন্য মানুষ, মুনাফা বাড়াবার জন্য মানুষ। সৃষ্টির তাগিদে মানুষ এখানে কাজ করে না, কাজ করে তার জৈব প্রয়োজন মেটাতে। ঘানিগাছে জুড়ে দিয়ে তাকে অবিরত পাক দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রদানব পাক দিচ্ছে না—পাক দিচ্ছে যন্ত্রদানবের মালিকের দল। তাই মার্কস বলেছিলেন—"estranged labour makes man's species life a means to his physical existence"। শুধু শ্রমজীবী নয়, বুদ্ধিজীবীকেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাজারদরে বুদ্ধিশ্রমকে বেচতে হয়। চাহিদা তৈরীর কর্তা সেই মুনাফা সন্ধানী মালিকগোষ্ঠী। সাহিত্য শিল্পও তাই এই সমাজের উৎপাদন নীতি মেনে চলতে বাধ্য। বিচ্ছিন্নতার বিলাপ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি যত হয়—এ রোগের সমাধানের ইঙ্গিত নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কেননা সেটা মালিকগোষ্ঠীর অভিপ্রেত নয়, তাই তার চাহিদাও নেই। উদ্দেশ্য-হীন নোঙরছেঁড়া ভাবে শুধু জৈব প্রয়োজন মেটাতে কাজ করে চলেছে মানুষ।

এই পারপাস বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাভলভ কি বলেছেন দেখা যাক : "Human life consists in the attainment of every possible sort of purpose to which is applied every degree of human energy.........An analysis of the activity of animals and of human beings leads me to the conclusion that among the

reflexes there must exist a special one—the reflex of purpose—an aspiration to the attainment of a definite exciting object, using attainment and object in the broad sense of the term." [আই. পি. পাভলভ—'লেকচার্স অন কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্সেস']। পাভলভ এই রিফ্লেক্সটির ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তার প্রমাণ মেলে এই উদ্ধৃতি থেকে : "The reflex of purpose is of great and vital importance ; it is fundamental form of life energy to us all........All life, all its improvement and progress, all its culture are effected through the reflex of purpose...."। উদ্দেশ্য পরিপূরণের পথে বারবার বাধা পড়লে এই 'রিফ্লেক্স অফ পারপাস' ক্রমশ দুর্বল হয়ে একেবারে নিভে যেতে পারে। উপবাস করতে বাধ্য হলে, আমরা জানি, কয়েকদিন পরেই খিদে চলে যায়। ফুড রিফ্লেক্স আর সক্রিয় থাকে না। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষুধা যদি বারবার বাধা পায়, প্রধান পরাবর্ত (reflex) যদি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, তাহলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর তাই ঘটেও থাকে। বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হয়। মাত্র কয়েক বছর আগেও—পাভলভ লিখেছেন,—চীনদেশে নাকি টাকা দিয়ে ফাঁসী কাঠে ঝোলবার জন্য মূল আসামীর পরিবর্তে ভাড়া করা আসামী পাওয়া যেত।

বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাতেও বিকৃতি ঘটছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজের অভাবে ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে তাদের চিন্তাধারাও হয়ে উঠেছে অর্থহীন। তাই সত্যকে মনে করছে মায়া, মায়াকে মনে করছে সত্য। 'প্যারানইয়া'র প্রসার ঘটছে।

পৃথিবীটাই আজ বিচ্ছিন্ন। ভেঙে যেন দুটো আলাদা টুকরো হয়ে নতুন কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তাবিদদের দুই ভিন্নমুখী চিন্তায় সাধারণ মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক। একদল, পুরানো সমাজব্যাবস্থা ও তদনুষঙ্গিক ধ্যানধারণা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ বজায় রেখে নতুন সম্ভাবনাকে ধীরে সুস্থে পুরানোর সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে মানিয়ে নেবার পক্ষপাতী—আর একদল অতীতের শবকে অগ্রগতির পথ থেকে সরিয়ে ফেলে, নতুন শক্তি ও পদ্ধতিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সমাজব্যবস্থার আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন-প্রয়াসী।

এই সমস্যা ও দ্বন্দ্ব চিরকালের নিঃসন্দেহ, কিন্তু আজকের তীব্রতা ও জটিলতা

অভূতপূর্ব। কারণ আগেই বলেছি, মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণ যতই সুনিশ্চিত হচ্ছে, পুরানো স্বার্থের হতাশাজনিত আর্ত চীৎকার ও বাধাদান ততই বাড়ছে। তাই পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভারে বসুন্ধরা কম্পমান, মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তার সম্মুখে জীবজগতের সর্বাত্মক ধ্বংসের ছবি।

ভয় পাচ্ছে অনেকেই। ভয় থেকে জড়তা, অদৃষ্টবাদীর নিষ্ক্রিয়তা,—ফলে মানবিক সম্পর্কের অবনতি আর বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা আজ ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। সমাজ থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে ব্যক্তিমানসে অনুপ্রবিষ্ট। এর প্রকোপ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও যে একেবারে অনুভূত হচ্ছে না এমন নয়। সোভিয়েত সাহিত্যেও এক আধটা আধা-আউট-সাইডারের দেখা মিলছে। অবশ্য দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তা' হলেও অন্য দেশের কাগজপত্রে শোরগোল উঠেছে। মাঝে মাঝে Tedyboys-দেরও দেখা মিলছে সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজপথে। ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সংখ্যা অতি নগণ্য হলেও, এদের উপস্থিতি বিচ্ছিন্নতার বিস্তারের নিদর্শন।

বিচ্ছিন্নতা আর তার ফল স্বরূপ নিউরোটিক, সুইসাইডের ক্রমবৃদ্ধির মূল কারণ-গুলোর হদিশ দিতে পারা গেছে মনে হয়। এইবার দেখা যাক, প্রতিকারের উপায় আছে কি না? এবং থাকলে, তার প্রয়োগসম্ভাবনা কতদূর? পাভলভ বলেছেন, 'রিফ্লেক্স অফ পারপাস' একেবারে মরে না—হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণাধারাকে আবাহন করা চলে। জীবনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রসসিঞ্চিত করে সতেজ করে তোলা চলতে পারে। ফুড রিফ্লেক্সের বেলায় বলেছেন ;—'with regular dietetic regime, a proper amount of food and a periodicity in taking it'—মরে যাওয়া ক্ষুধাকে জীইয়ে তোলা যায়। নিউরোটিক রোগীর চিকিৎসায় পাভলভিয়ানরা এই রকম ব্যবস্থাই করে থাকেন। ফলও পাওয়া যায় দেখা গেছে। কাজেই হতাশ-রোদনের প্রয়োজন নেই। এ অবস্থা শাশ্বত সনাতন নয়। বিচ্ছিন্নতা-ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। ব্যক্তিগত চিকিৎসার কথা থাক। সমষ্টিগতভাবে এই পুঁজিবাদী সমাজেই এই ব্যাধির প্রতিরোধের কিছু কিছু ব্যবস্থা কারাওয়ের মত মার্কসবাদীরা লক্ষ্য করেছেন।

বিচ্ছিন্নতা আজ শুধু শ্রমজীবী শ্রেণীতে নিবদ্ধ নয়। একচ্ছত্র পুঁজির দাপটে ও প্রয়োজনে ক্ষুদ্রশিল্পে, ব্যবসায়েও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদের নিজস্ব

নিয়মে ছোটোখাটো মালিকরা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একচ্ছত্র পুঁজিতে আবার পরিচালকের ক্ষমতাও ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ছে। অনেক যৌথ কোম্পানি যুক্ত হয়ে করপোরেশন, কারটেল, তৈরী হয়েছে। হোল্ডিং কোম্পানির রেওয়াজ বেড়ে চলেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দৌলতে পরিচালনাও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অনেক পরিচালক তাই কারবারের শুধু অংশীদার হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মুনাফার পাহাড় জমছে বটে, কিন্তু সৃজনমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের অভাবে এঁদের মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সুযোগ সীমিত, কাজেই এঁরা বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোজগতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন অথবা উদ্দেশ্যবিহীন বন্য জীবনের নেশায় মেতে নিজেদের ধ্বংস করছেন।

'অটোমেশন' গেল দশ বছরের শিল্প-সমাজে খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আগামী কয়েক বছরে এ-প্রভাব শিল্প-অগ্রসর দেশে হয়ে উঠবে বিস্তৃত। গ্রাম ও নগরীর ব্যবধান ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে। কায়িক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমের সীমা-রেখাও সঙ্কুচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা বেকারের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে নিঃসন্দেহ।

একচ্ছত্র পুঁজিবাদের যুগে বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠছে ব্যাপক ও গভীর। শুধু শ্রমিকশ্রেণীকে নিঃস্ব করেই আজ একচ্ছত্র পুঁজির ক্ষুধা মিটছে না। প্রায় সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে সে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছে। নিঃস্বতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও তদ্দরুণ বিচ্ছিন্নতা জনসাধারণের প্রায় প্রতিটি স্তরেই আজ চোখে পড়ছে।

এই বিচ্ছিন্নতা বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের ফল। পুরানো মূল্যবোধের জিগির তুলে একে দূর করা যাবে না। নিজের নিয়মে সামাজিক ভাঙন দ্রুত এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর অর্থ, বিচ্ছিন্নতা প্রসূত এই সমাজব্যবস্থার নেতিকরণের (negation) সর্বাত্মক প্রস্তুতি তার নিজের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে। ভাঙনের পাশে পাশেই নতুন নীতিবোধ, নতুন মূল্যবোধের বনিয়াদ গড়ার কাজ চলেছে। নতুন ভাবাদর্শের, নতুন প্রতিষ্ঠানের ইমারত দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার ভিত্তিপ্রস্তরের আভাস সুস্পষ্ট। তার অস্তিত্ব বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। আগেকার দিনের সহযোগিতা ও মানবিক সম্পর্ক আজ চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রের

প্রবক্তাদের বাধা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতুন ধরনের সহযোগিতাভিত্তিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুনতর মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে।

প্রথম, জাতিসংঘ গঠন নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সংঘের সনদ দুনিয়ার মানুষের শান্তি সহযোগিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব কামনার নিদর্শন। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতিসংঘ বিশ্বের রাজনীতিতে এক নতুন পরিমণ্ডল স্রষ্টা। অনস্বীকার্য যে, ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের অন্যান্য সম্পূরক প্রতিষ্ঠান অন্তত আংশিকভাবে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত। বলতে পারি, মানব ইতিহাসে এ এক উল্লেখ্য পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়, সব দেশেই আজ শুনছি শান্তিকামী মানুষের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোচ্চার অঙ্গীকার। এ এক নতুন নীতিবোধ ও মূল্যবোধের সূচনা। সর্বধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে, যার কল্পনাও আমরা কয়েক বছর আগে করতে পারতাম না। এর মধ্যে ধনিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলেই রয়েছেন। এ আন্দোলনে আছেন ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতবর্ষ, আফ্রিকার বহু মনীষী ও চিন্তাবিদ—যাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক স্বার্থসম্পর্ক বা শ্রেণীগত ঐক্য নেই। এঁদের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা চলছে। মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে সন্ধান পেয়েছে অস্তিবাচক উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানীদের একটি বিশ্বসংস্থাও পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ চালাচ্ছেন। এইসব সংস্থার বক্তব্য ও প্রস্তাব গ্রহণে আমরা বারবার বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ দেখতে পাই। অবশ্য ঐ কথাগুলো অভিধানে ছিল, ব্যবহৃতও হত। কিন্তু আমরা এদের বিমূর্ত পরিকল্পনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম। সন্দেহাতীতভাবে এ'কথাগুলো আজ মূর্ত ও বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়, এই ধরনের আন্দোলন ছাড়াও, কিছু কিছু গঠনমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থার খবর আমরা জানি, যার মূল প্রেরণা আসছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহকর্মিতার সদিচ্ছা থেকে। উদাহরণস্বরূপ আমি ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বৎসরের ক্রিয়াকলাপের ও দক্ষিণমেরু উন্নয়ন সংস্থার নাম করব। গাগারিনের মহাশূন্য পরিক্রমায় ইয়োরোপের অনেক মানুষ এমন আন্তরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন—যা থেকে মনে হবে এ-সাফল্য ব্যক্তি বা দেশবিশেষের নয়, একে মানুষ জাতির

সাফল্য বলেই তাঁরা মনে করেছেন। ইয়োরোপের টেলিভিশনের পর্দায় গাগারিন-এর সংবর্ধনা উপলক্ষে মস্কোর অনুষ্ঠান সরাসরি এই প্রথম প্রদর্শিত ও প্রচারিত হয়েছে। এ ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

চতুর্থ, আজ জেটের যুগে পৃথিবীর পরিধি সংকীর্ণ। সংবাদ আদান-প্রদানই পরস্পরকে জানবার একমাত্র উপায় নয় আজ। টুরিস্টদের দল আজ হাজারে হাজারে এক দেশের খবর অন্য দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন; অন্য দেশের মানুষদের দেখছেন, জানছেন। এই দেখা ও জানার কিছুটা হয়তো গোয়েন্দা-চক্রের জঘন্য উদ্দেশ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধকে বাড়াচ্ছে ও বিচ্ছিন্নতারোধে সহায়ক হচ্ছে নিঃসন্দেহে। গত এক দশকে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার অজস্র সুযোগ পেয়েছেন। তাই বলছি, বিশ্বমানবতা আজ আর আভিধানিক শব্দমাত্র নয়—তা স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিউবা ও কঙ্গো, এঙ্গোলা ও লাওসের রাজনৈতিক আবহাওয়া শুধু নয়, যে-কোন দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আজ দুনিয়ার প্রতি মানুষের মানসিক আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে। লুমুম্বার নামে আজ দেখছি মস্কোতে বিশ্ববিদ্যালয়, টেগোরের নামে ন্যু-ইয়র্কে পার্ক। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে শুধু কঙ্গোলীদের মন নয়, বাংলা দেশের কবিহৃদয়ও আজ পীড়িত, বিচলিত।

পঞ্চম, অনুন্নত দেশকে সাহায্য দান নীতির মধ্যে হয়তো দাতা রাষ্ট্র বা তার মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু এই লেনদেন, দাতা-গ্রহীতা দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ছেড়ে এবার জাতীয় ক্ষেত্রে আসা যাক। অগ্রগামী দেশগুলিতে জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে একচ্ছত্র পুঁজির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে—কোথাও মৃদু কোথাও তীব্র। আন্দোলনের কারণ রাষ্ট্রবিশেষে বিভিন্ন। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার আন্দোলনের কারণ আর বেলজিয়ামের কারণ এক নয়। বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনের গুণ ও গতি আলাদা। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে লর্ড রাসেল পরিচালিত ইংলণ্ডের আধুনিক আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনগুলো মূলত যুদ্ধ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদবিরোধী কিন্তু আগের মত কেবল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনের পুরোধা। এঁরা বাইরের চাপে বা শুধু অর্থনৈতিক কারণেই এ আন্দোলনে নেমেছেন ভাবলে ভুল হবে। এর মধ্যে আছেন বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী,

ছোট ও মাঝারি কারবারী ও আরও অনেকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়—জীবনবোধের তাগিদে তাঁরা একত্র হয়েছেন। সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা মানবজাতির মুক্তিআন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে। অনগ্রসর দেশগুলোতে ভারী শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের পরিকল্পনা মাফিক পুঁজি বিনিয়োগের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একচ্ছত্র পুঁজির ষড়যন্ত্রে বা প্রভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছে না, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থাকে আমরা একচ্ছত্র-বিরোধী ব্যবস্থা বলতে পারি। রাষ্ট্রনায়কদের অসাফল্যে হয়তো জনসাধারণের মনে আপাতত নৈরাজ্যবোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলীয়মান মরীচিকা-স্বপ্ন জনসাধারণের মনে নতুন দিগন্তের স্বর্ণছবি তুলে ধরে নতুন আদর্শ ও মূল্য নিরূপণে, নতুন উদ্দেশ্য আরোপণে উৎসাহিত করছে না কি? পরিচয়-স্বল্পতার জন্য আমরা তাকে স্বাগত জানাতে পারছি না। কারাওয়ের এইসব পর্যবেক্ষণ মোটামুটি বাস্তবসম্মত।

নতুন সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে যে মানসিকতা ও মূল্যমানের প্রয়োজন, মানব-চরিত্রে ধীরে ধীরে তারই উন্মেষ ঘটছে। জীবনের নতুন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আবিষ্কৃত হচ্ছে ও সেই উদ্দেশ্য-সম্পূরক পরাবর্ত সংগঠিত হচ্ছে। "If everyone of us will cherish within himself this reflex as the most precious part of his being and if parents and instructors of all ranks will make their chief problem the strengthening and developing of this reflex in the plastic masses ……then we shall become that which we should and can be". (Pavlov)

উপসংহারে বক্তব্য, পরমাণুযুগে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অস্তিবাচক দিকের কয়েকটি ইঙ্গিতমাত্র এখানে দেবার চেষ্টা করেছি, তবে নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক দিকের শক্তি অবহেলার নয়। বিচ্ছিন্নতার নেতিকরণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়, মানুষের ভূমিকা এখানে মুখ্য। দৃষ্টি সদাজাগ্রত রেখে, সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অস্তিবাচক ধারাস্রোতকে প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। তবে সুস্থ মানবিকতাবোধ ও বিশ্বসৌভ্রাত্র বিকাশের পরিবেশ প্রস্তুত; আর মানবমস্তিষ্কে নতুন গুণসঞ্চারও সম্ভব। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশার বিলাপ ক্লীবধর্ম, অনুচিত।

২

বিচ্ছিন্নতার আলোচনা

বিজ্ঞান বিভীষিকা

'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর তিন বছর কেটে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নতুন অপ্রত্যাশিত পরিচ্ছেদ যোজিত হয়েছে। কিছু সংশয়ের নিরসন ঘটেছে, কিছু সমস্যার সমাধানের হদিশ হয়ত মিলেছে; কিন্তু অনেক বেশি প্রশ্ন, অনেক জটিলতর সমস্যা, অনেক তীব্রতর সংশয় জমে উঠেছে। বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধসম্ভাবনা অনিবার্যতার পর্যায়ে উঠে এখন সুদূরপরাহত না হলেও সাময়িকভাবে স্তিমিত। প্রতিরোধশক্তি দুর্বার হয়ত নয়, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা সংহত ও শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক মিত্র-বদল ও মিত্র-গ্রহণ নীতি অনেকের কাছেই মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। কাল যেখানে ছিল মতান্তরের সূক্ষ্ম রেখা, মনান্তরের অতলস্পর্শী গহ্বর দেখা দিয়েছে সেখানে। আবার অলঙ্ঘ্য-অনুমিত অনেক ব্যবধানের উপর রচিত হয়েছে মৈত্রী-সেতু। প্রগতির সরলরৈখিক গতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের হতাশার তীব্রতা অনুমেয়। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধিতে তাঁরা বিভ্রান্ত। মানব মুক্তির স্বপ্ন সফল হবার সম্ভাবনা কোথায়? বিচ্ছিন্নতার অবসানের চিহ্ন কই?

বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আরও

বিশদ আলোচনা করা হোক বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁরা অনেক দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। অবশ্য মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক আলোচনাই তাঁরা আমাদের কাছে আশা করেন। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার সম্যক পর্যালোচনা পদার্থ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখার বিষয়বস্তু। আমাদের আলোচনা সীমিত ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বাধ্য, যেহেতু মনোবিজ্ঞান ছাড়া অন্য সব বিষয়ে আমরা অনধিকারী। আমাদের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান-বিভীষিকার মনস্তত্ত্ব।

পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়নকে আজ ইয়োরোপ-আমেরিকার সমাজবিদ্‌রা ভীতির চোখে দেখছেন কেন? একদিন যে-বিজ্ঞানের আবাহনে ধনতন্ত্র মুখর হয়ে উঠেছিল, আজ সেই ধনতন্ত্রের কণ্ঠে বিসর্জনের বিষাদ-সঙ্গীত শুনছি কেন? বিজ্ঞান যে আশাবাদের জন্ম দিয়েছিল, যার ফলে লেখা হয়েছিল টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া', সে আশাবাদ মৃত মনে হয়। বেলামির 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড' বইটি ১৮৮৮ সালে নাকি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল কুড়িটি ভাষায় অনূদিত হয়ে; আজ তার নামও শুনি না কেন? ব্রাউনিং, শেলী, বার্ণস-এর কবিতা আজ ওদের অনুপ্রাণিত করে কি? হুইটম্যান এমার্সনের বলিষ্ঠ মানবতার বাণী আজ আমেরিকার বাতাসে শোনা যায় কি?

বর্তমানকালে এদেশে অনেকের চিন্তা ও প্রশ্ন এই রকম: জড়বাদী ধারণা আজকের বিজ্ঞান নস্যাৎ করে দিয়েছে। বস্তুর ত' বিলোপ ঘটে গেছে বহুকাল। ইলেক্‌ট্রন, ফোটোন কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি জাগাতে পারে? কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের জড়বাদ-সম্মত ব্যাখ্যা কি সম্ভব? বিজ্ঞান এখন বিমূর্ত—শুধুমাত্র গণিতের সঙ্কেত। পুরণো বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে জড়বাদ মানুষের উপকার করেনি। তবে পশ্চিমী জড়বাদী সভ্যতার বিলোপ আসন্ন। বিজ্ঞানবিরূপতা পশ্চিমী আত্মার ক্রন্দন। এ বিরূপতা স্বাভাবিক! পুরোপুরি বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দের বাণী ওরা গ্রহণ করতে পারবে কি? জানি না। এই আধুনিক বিজ্ঞানই একদিন ওদের পুরণো বিশ্বাস ফিরিয়ে দেবে। বিজ্ঞান বর্জন না করেও বোধ হয় জড়বাদী জড়তা থেকে ওরা মুক্ত হবে। ওরা বুঝতে পারছে যন্ত্র মানুষের স্থূল প্রয়োজন মেটায় মাত্র। 'ম্যান্ ডাজ নট লিভ্ বাই ব্রেড্ এ্যালোন্'—সোভিয়েতের মতো জড়বাদী দেশেও স্বীকৃত। যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই বিজ্ঞান-বিরোধিতা বোধ হয় শুভেচ্ছা-

প্রণোদিত। 'আত্মার ক্রন্দন', 'স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ'—এ সব বুঝি আধ্যাত্মিকতার বাণী! আসলে কিন্তু এ-ধারণা প্রগতিবিরোধী। বিজ্ঞান-বিভীষিকার কারণ নিহিত অন্যত্র। পশ্চিম দুনিয়া আজ দেউলে হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের সঙ্কট বেড়ে চলেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি—অটোমেশনের প্রয়োগকে ধনতন্ত্র পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না, আবার ছাড়তেও পারছে না। অটোমেশন চালু হওয়ায় আমেরিকার এক রেডিও কারখানার একটি বিভাগে দু'শ' লোকের কাজ একজনে করছে। এই দু'শ' লোক বেকার হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তাই বিলাপ করছেন এই বলে যে—স্বয়ংক্রিয়তা বিধাতার অভিশাপ।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন মুনাফার জন্য। পরিকল্পনা নেই। প্রাচুর্য তাদের কাম্য নয়, কাজেই এই বেকারত্বের সমস্যা তারা সমাধান করতে পারবে না। এখানেই তাদের অটোমেশন ভীতির মূল।

বিজ্ঞানের দ্রুত তালের সঙ্গে মানুষের চিন্তা পা মিলিয়ে চলতে পারছে না। দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকায় লেখা হচ্ছে: যন্ত্রের দুর্ধর্ষ গতি মনোরাজ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। সমাজ বিচ্ছিন্ন, পরিবার বিচ্ছিন্ন, নিজের জীবনও বিচ্ছিন্ন। কিম্বা, "আধুনিক বিজ্ঞান এমন রহস্যময়, অনিশ্চিত, সন্দেহজনক ও দ্ব্যর্থবাচক হয়ে উঠেছে যে কোথাও কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।"

আধুনিক বিজ্ঞানের এই রহস্যময় ও অনিশ্চয়তার উপর আলোকপাত করতে হলে নানা দিক থেকেই আজ ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু বক্তব্য নির্দিষ্ট রাখার জন্য শুধু আমরা জ্ঞানের তত্ত্বখণ্ড নিয়েই আলোচনা করবো। পরে প্রয়োগখণ্ড ও অটোমেশন। কবে থেকে এই নিরাশার বাণী আমরা শুনছি? প্রথম যুদ্ধের পর থেকে। আর বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব-সংকটেরও সুরু হয়েছে তার কিছুদিন আগে থেকে।

সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ও লোভের রূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শোণিত স্রোতে প্রকটিত হবার পর থেকেই পশ্চিমী দুনিয়ার দু'হাজার বছরের খৃষ্টধর্মী আশাবাদ নিরাশা-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন বলা চলে। হিরোসিমায় আণবিক বজ্রগর্জনে দ্বিতীয় যুদ্ধের যে যবনিকা পতন, সে যবনিকা যে-কোন মুহূর্তে উত্তোলিত হতে পারে। এই চিন্তায় জনমন ভীতি-বিহ্বল। যদি উত্তোলিত হয়, তবে এবার যে নাটক অভিনীত হবে, তার ভয়াবহতা আংশিকমাত্র অনুমেয়। থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের প্রথম পর্বের বলির সংখ্যাই হবে সত্তর কোটি। তেজস্ক্রিয়তার ফলে পরবর্তী

প্রতিক্রিয়া আরও ভয়াবহ বলে অভিজ্ঞমহল কর্তৃক অনুমিত। এ্যাটম্যানিয়াকদের বিরুদ্ধ-শক্তি যদিও সুসংগঠিত, শান্তিকামী মানুষের দল পূর্বাপেক্ষা যদিও সুসংবদ্ধ, তবুও যুদ্ধভীতি বর্তমান। সাম্রাজ্যবাদ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। কেননা, অর্থনীতিক প্রতিযোগিতাকে তারা ভয় পায়। উৎপাদন শক্তি বিজ্ঞানের দৌলতে আজ অপরিমিত। কিন্তু উৎপাদনকে পরিকল্পনা মাফিক নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ধনতান্ত্রিক সমাজের নেই। আংশিক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থা বা State capitalism-এর দুর্বলতা নিয়ে আলোচনার সময় এখন নয়। এখন এইটুকুই বলতে চাই, যুদ্ধভয়, অটোমেশনের ফলে বেকারত্বের ভয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব—এইসব মিলে জনমানস আজ নিরাশায় আবিষ্ট; দ্বিধা-মোহ-জরাগ্রস্ত।

এই নিরাশার অভিব্যক্তি দেখতে পাই প্রগতিমূলক সবকিছু ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপনে। বিশেষ করে নজরে পড়ে মানবপ্রগতির মূল ভিত্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা। যে প্রমেথিউসের বন্ধনমুক্তিতে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তি সূচিত হয়েছিল প্রায় চারশ বছর আগে, সেই প্রমেথিউসকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার ষড়যন্ত্র চলেছে। কোনো কোনো মহল থেকে এমন কথাও বলা হয়েছে যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা দশ বছরের জন্য 'মোরাটোরিয়ম' জারি করে বন্ধ করা হোক। পশ্চিমী দুনিয়ার সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিকের দল মনে করছেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দ্রুতগতিবেগ মানবজাতির সমস্ত আত্মিক অবনতির মূল কারণ। বিজ্ঞান জড়বাদকে সুদৃঢ় করেছে; ফলে ঘটেছে মানবাত্মার অপমৃত্যু, সত্তার সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদ। মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠছে যন্ত্রাঙ্গ, অটোমেটন। উনিশ শ' তিরিশের কাছাকাছি লেখা হয় আলডু হাক্সলীর 'ব্রেভ নিউ ওয়ারল্ড', বিশ বছর পরে প্রকাশিত হয় জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৪'। প্রথম দেখা দিল নেগেটিভ ইউটোপিয়া সৃষ্টির প্রয়াস। আজ অটোমেশনের যুগে ভাববাদী দর্শনাবিষ্ট অধ্যাপক পণ্ডিত কর্তৃক এই নেগেটিভ ইউটোপিয়ার ধারণা আরও দৃঢ়ীকৃত। নয়া-দৃষ্টবাদ (neo-positivism) ও অস্তিত্ববাদ (existentialism) দর্শনের ধোঁয়ায় বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্য আচ্ছন্ন। এখন আরও আধুনিক নিও থমিজম্ দর্শন বৈজ্ঞানিকদের বিভ্রান্ত করছে। বুর্জোয়া সমাজের সংকটকে এঁরা সারা পৃথিবীর সংকট হিসেবে

তুলে ধরতে চাইছেন,—যদিও আজ পৃথিবীর একতৃতীয়াংশে উন্নততর নতুন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত। সংকটের মূল এঁদের মতে নিহিত—সমাজের মধ্যে নয়—বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়নের মধ্যে। ধনতন্ত্র বিজ্ঞাননির্ভর হয়ে একশ' বছরে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল; আজ বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার ধারণ, পোষণ ও প্রয়োগ করার শক্তি সে ধনতন্ত্রের নেই। সমাজতন্ত্র পুরণো ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে নতুন পথে বিজ্ঞানের রথে চড়ে অবাধ বেগে জয়যাত্রা করতে চায়। পুরণো ব্যবস্থার সংরক্ষকদের তাই এই বিজ্ঞান-বিভীষিকা।

অবস্থা ভেদে এঁদের প্রচার-কৌশল বিভিন্ন। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে আজ মানুষ যে অমিত শক্তির অধিকারী, যে শক্তির যথাযথ ও অব্যাহত প্রয়োগে ক্ষুধা, রোগ ও অকাল মৃত্যুকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে ফেলা যায়, সেই শক্তির শুধু ধ্বংসাত্মক দিকটাই এঁরা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম থেকে বিযুক্ত হওয়ার ফলে শোষণ ও বিষম প্রতিযোগিতার দরুণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি ঘটেছে। এঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এর জন্য দায়ী করতে চান। পদার্থবিজ্ঞানের, বিশেষ করে পরমাণুর গঠনের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। পুরণো যান্ত্রিক জড়বাদ এসবের ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ, কিন্তু আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন এই সব আবিষ্কারের ফলে পুষ্ট হচ্ছে। ক্রমশ বৈজ্ঞানিকরা নতুন বস্তুবাদী দর্শন মেনে নিচ্ছেন ও প্রগতিমূলক সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন। তাই এই বিজ্ঞান বিভীষিকা।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র ও পরে সাম্যবাদী সমাজে উন্নয়নের বাস্তব কর্মসূচীকে ও পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবাধ প্রয়োগ চলছে। জনসাধারণের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ব্যক্তিস্বার্থকে সঙ্কুচিত করে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশে। স্বেচ্ছা-শ্রমিকের আত্মত্যাগে পরিকল্পনা অনেক স্থলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পরিপূর্ণ হচ্ছে। শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ তার ব্যক্তিসত্তা অনেকাংশে ফেরত পাচ্ছে নতুন সমাজব্যবস্থায়, উপরন্তু তারা শ্রমফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। তাই এই উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার। পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিকের দল তাঁদের ব্যক্তি-সম্পত্তিকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে এর হদিশ খুঁজে পাচ্ছেন না। কাজেই

প্রচার করা হচ্ছে পাভলভিয়ান কণ্ডিশনিং-এর বিকৃত ব্যাখ্যা ও 'মগজ ধোলাই' তত্ত্ব।

এই বিজ্ঞান-বিভীষিকার আলোচনা প্রসঙ্গে এই শতাব্দীর নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্যগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। বিজ্ঞানী আজ পরমাণু বিদীর্ণ করে সমপরিমাণ দাহ্য পদার্থের ৩০ লক্ষগুণ শক্তি সঞ্চার করেছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অগ্রাহ্য করেছে, সিবারনেটিক্সের প্রসাদে মস্তিষ্কের শক্তি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চন্দ্রলোকে মধুচন্দ্রিমা যাপন আজ আর স্বপ্নকথা নয়। মেরু ও সাহারার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজ মানুষের আয়ত্তাধীন। সাহারা ও গোবি-মরুতে নায়েগ্রার জলপ্রপাত নিয়ে আসা আজ সম্ভাব্যের পর্যায়ে পড়ে। তত্ত্বের দিক থেকে—আপেক্ষিক তত্ত্ব, কোয়াণ্টাম তত্ত্ব, পরমাণুর তরঙ্গতত্ত্ব ও জীব-বিজ্ঞানের নতুন কুলসংক্রমণ তত্ত্ব—এই শতাব্দীর বিস্ময়। পাভলভীয় শর্তাধীন পরাবর্ত তত্ত্বও এই শ্রেণীতে পড়ে। এই সব তত্ত্ব প্রযুক্তিবিদ্যাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পৃথিবীর অর্থনীতি ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে। রেডিও-এ্যাক্টিভিটির আবিষ্কারের পর যখন পরমাণুকে আর বস্তুর অবিভাজ্য অপরিবর্তনীয় শেষ অবস্থা বলে কল্পনা করা গেল না, ভাববাদী দার্শনিকরা ভাবলেন বস্তুবাদের এবার সমাধি ঘটল। 'ভর' এর অসংগতি থেকে এঁরা অনুমান করলেন বস্তু শূন্য থেকে আবির্ভূত হতে পারে আবার শূন্যে বিলীন হতে পারে। তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের আইনকানুন যখন বলবিদ্যার পরিচিত আইনকানুনের আওতায় পড়ল না, তখন কোনো কোনো পদার্থ-বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন—তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই ; ওগুলো কল্পিত কতকগুলো চিহ্নমাত্র। ভাববাদী বৈজ্ঞানিকরা বললেন—'শক্তি অক্ষয়'—এ মতবাদ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়', প্রমাণ—পরমাণুর স্বতস্ফূর্ত বিভাজনে শক্তি-সাম্যের আপাত-সামঞ্জস্যহীনতা।

পরমাণুজগৎ যখন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তখন ঐসব প্রোটন, মেসন, ইলেকট্রনকে বিশুদ্ধ চিন্তার ফল বলতে দোষ কি? বস্তুকণার বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, ভর ও গতিবেগ আর নির্দিষ্ট বস্তুধর্ম নয় : কাজেই বস্তুধর্মকে বিষয়গত না ভেবে বিষয়ীগত ভাবতে বাধা কোথায়? উনিশ শতকের এ্যাটমবাদ ও সঙ্গে

সঙ্গে যান্ত্রিক জড়বাদ অচল। বৈজ্ঞানিক সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক—কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞানলব্ধ হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক শুধু ঘটনার বিবরণ দিতে পারেন, ব্যাখ্যা করবার ও ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁর নেই। পদার্থবিজ্ঞানের এই মতামত ক্রমশ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হল। বিশেষ করে মনোবিদ্যায় এই ভাববাদী 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব' করল অচল অবস্থার সৃষ্টি। ফলে জেমস্, ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করার সুযোগ পেল। দেখা দিল চিন্তাজগতে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি ও অরাজকতা। বিচ্ছিন্নতার প্রসার ও ব্যাপ্তি বেড়ে গেল। চিন্তানায়কদের লেখনী প্রসূত বিচ্ছিন্নতার বীজাণু জনসাধারণকে সংক্রামিত করল।

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, প্রগতির বিরুদ্ধে ভাববাদী দর্শনের এই আক্রমণ প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালেন লেনিন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা থেকে তিনি বললেন, এ্যাটমতত্ত্ব অচল নয়ঃ বস্তুর এই বিশেষ অবস্থা বিচ্ছিন্নতার নির্দেশক, অবিচ্ছিন্ন অবস্থার সঙ্গে এর রয়েছে দ্বান্দ্বিক সমন্বয়। 'অপরিবর্তনীয় ভরতত্ত্ব' না টিকলে বস্তুবাদ ধ্বসে পড়ে না। বস্তুবাদের মূল ভিত্তি বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্ব (objective existence)। অস্তিত্বের রূপ পরিবর্তনে সে ভিত্তিতে কাঁপন ধরে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মতে বস্তু অক্ষয়, অনন্ত তার রূপ। প্রকৃতিবিজ্ঞান নিয়ত বস্তুর নতুন নতুন ধর্মের সন্ধান পাচ্ছে; নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হচ্ছে। 'শক্তি অক্ষয়' এই মতবাদ খণ্ডনপ্রয়াস নিরর্থক, বলেছিলেন লেনিন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা পরবর্তীকালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতই 'শক্তির অক্ষয়ত্ব' সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তু ও বস্তুর গতিময়তা শাশ্বত ও পরিবর্তনশীল, এদের সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই। বিজ্ঞানের সূত্র ভাব-প্রকাশের এক বিশেষ ভঙ্গী বা সঙ্কেত নয়; বস্তুজগতকে জানবার ও পরিবর্তিত করবার উপায়। বৈজ্ঞানিক সত্য আপেক্ষিক নিঃসন্দেহ, কিন্তু পরম সত্যের (absolute truth) ইঙ্গিতবহ। বিজ্ঞানের স্রোত পরমসত্য সন্ধানে সতত প্রবহমান।

আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞান দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমস্ত ধারণাকে ক্রমশ সমর্থিত করছে। এযাবত আবিষ্কৃত পরমাণুর মৌল উপাদানগুলির (প্রায় তিরিশটি) অন্তঃপরিবর্তনশীলতা—আজ পরীক্ষিত সত্য। বস্তু ও তার গতির পরিবর্তন

ঘটে বটে, কিন্তু বস্তুধর্ম অক্ষয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আজ বস্তু ও গতির ঐক্য সম্পর্কিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক প্রত্যয়কে আবার নতুন করে সত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

বস্তু ও গতির অনন্ত প্রকাশ সম্ভাবনা থেকে যেন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। দ্বন্দ্বমূলক এই অন্তহীন পরিবর্তনশীলতার ধারণা—ধর্মশাস্ত্রের অপরিবর্তনীয়-অক্ষয়-অব্যয়ের বিমূর্ত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একথা মনে রাখা দরকার।

বস্তু-অস্তিত্বের উপাদান, কাল ও দেশ নিয়ে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের ধারণাও আজ প্রতিষ্ঠিত। দেশ-কাল বৈজ্ঞানিকের কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। দেশ ও কাল পরস্পর বিরোধী; দেশ বিরতির নির্দেশক আর কাল গতি-নির্দেশক। আমরা যখন শুধুমাত্র দেশস্থিত কোন বস্তু বা ঘটনার কথা বলি, তখন ঐ বস্তু বা ঘটনাকে অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে নিয়ে কল্পনা করি। দেশ-কাল পরস্পর বিরোধী হয়েও পরস্পরসমন্বিত। বিপরীতের ঐক্য ধারণাটি দেশ-কালের মধ্যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। আপেক্ষিক-তত্ত্ব সপ্রমাণ করেছে দেশ-কাল বস্তু ও গতির অস্তিত্বের রূপ। দেশ-কালকে বস্তু থেকে বিচ্যুত করা যায় না আবার দেশ ও কালকে পৃথক করাও চলে না।

আপেক্ষিক-তত্ত্বের আপাত-স্ববিরোধী প্রত্যয়গুলি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার (?) ব্যাখ্যা করছে আবার প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারে করছে সাহায্য। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা শুধু এখানেই নয়। কার্যকারণ তত্ত্বের দ্বন্দ্বমূলক ধারণাও বিজ্ঞানসম্পর্কিত। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব যান্ত্রিক হেতুবাদকে অস্বীকার করে প্রোবাবিলিটি তত্ত্বের আমদানী করল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মশৃঙ্খলা, কার্যকারণ ও অবশ্যম্ভাবিতার সূত্রে বাঁধা এবং আকস্মিকতা অবশ্যম্ভাবিতারই অংশ। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সেই কথাই বলে। 'প্রোবাবিলিটি' বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশক এবং সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার পরিমাপক। কোয়াণ্টাম বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সাবজেক্টিভ নয়, বহির্বস্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। অবশ্য সূত্রগুলি পরিসংখ্যানমূলক। তা বলে সূত্রগুলি অনির্ভরযোগ্য নয়। সূত্রের উৎস পরমাণুর দ্বৈতপ্রকৃতি, পরমাণুর মধ্যে কণিকা ও তরঙ্গধর্মের—দুই বৈপরীত্যের সমন্বয়। বস্তুর এই অন্তর্দ্বান্দ্বিক সংগঠনের আবিষ্কার পরমকারণবাদকে (Teleology) বিজ্ঞানের চত্বর থেকে চির-নির্বাসন দিয়েছে। দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদদর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই শতাব্দীর সুরুতে বিজ্ঞানের রাজ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা আজ অনেকাংশে দূরীভূত। পরমাণু বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া গতযুগের যান্ত্রিক জড়বাদী ধারণাকে ধূলিসাৎ করল; বিজ্ঞানীরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচয় তখনও সীমিত। কাজেই অজ্ঞেয়বাদী বা ভাববাদী ধারণা বিজ্ঞানীমহলে প্রসার লাভ করল। পরে কোয়াণ্টাম ও আপেক্ষিক তত্ত্বের দৌলতে দ্বান্দ্বিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বস্তু ও ঘটনার যত গভীরে আমরা প্রবেশ করব ততই বস্তুজগতের নতুন সূত্র ও নতুন আইন শৃঙ্খলার সন্ধান পাব। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে অপরিচিত যাঁরা, তাঁদের কাছে এ-এক সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি: অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। বহির্বিশ্বে, অন্য সৌরজগতে হয়ত বস্তুধর্মের ও বস্তুসম্পর্কের আরো নতুন বিস্ময় আমাদের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করছে। ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ আবার তখন নতুন সুরে সন্দেহ হতাশা ও অনিশ্চয়তা প্রচারে তৎপর হয়ে উঠবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের যুক্তিবুদ্ধি ততদিনে আরও বেশি তীক্ষ্ণ ও বিজ্ঞানশুদ্ধ হবে এবং ভাববাদের কুয়াশা বিস্তার সহজসাধ্য হবে না।

ম্যাক তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব মানেননি, থ্রুষ্টআও অণুপরমাণুর অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলেন—এসব পুরণো কথা। আজ 'বস্তুর অবলুপ্তি' তত্ত্ব একান্তভাবে অচল। রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ ও র‍্যাডারের প্রয়োগ তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ। আইসোটোপের উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহার এবং পরমাণুশক্তির নিয়ন্ত্রণ অণুপরমাণুর অস্তিত্ব তথা বস্তুবাদকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দৃষ্টবাদ (Positivism) আজ আর খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবিত করছে না। বোর, ব্রগলি, হাইসেনবার্গ তিরিশ বছর ধরে ভাববাদ দর্শনের উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন; এখন তাঁদের সুর পালটেছে। তাঁরা মনে করছেন যে-বস্তুজগৎ তাঁদের গবেষণার বিষয়—তার অস্তিত্ব তাঁদের অনুভূতি নিরপেক্ষ। কবি বা বিজ্ঞানীর কল্পনা নয় এই ব্রহ্মাণ্ড। তবে ব্রগলির মত এঁরা সবাই যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হয়ে পড়েছেন, এমন নয়। সাবজেকটিভ ভাববাদের বদলে কেউ কেউ এখন অবজেকটিভ ভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বস্তুর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু বস্তু গৌণ, ভাব মুখ্য। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি অনাদি ভাবসম্ভূত—মধ্যযুগীয় এই ধর্মীয় ধারণার ধ্বজাধারী হয়ে উঠছেন এঁরা। দৃষ্টবাদের দুর্বলতা দূর করার এই প্রয়াস বুর্জোয়া দার্শনিকের হাতে বস্তুবাদবিরুদ্ধ প্রচারের হাতিয়ার। টমাস এ্যাকুইনাসকে পুনর্জীবন দেবার চেষ্টা চলেছে। 'নিও-থমিজম্'

দর্শন আজ শ্রমিক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক চেতনাকে রুদ্ধ করার কাজে অগ্রণী। ঈশ্বর বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব আছে এবং নিজস্ব নিয়মশৃঙ্খলার অধীন্। অস্তিত্ববাদের মত যুক্তিহীন বিশ্বাদ নয় এই নতুন বোতলে ঢালা পুরনো মদ, মাদকতাও যথেষ্ট। তাই কলিন উইলসনের "দি আউটসাইডার" এর বহু সংস্করণ নিঃশেষিত। আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে, তার সঙ্গে মানুষের আদিম দুর্বলতা—ধর্মবিশ্বাসের সংযোগসাধন করা যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। কিন্তু সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক এই মদিরাপানে সাময়িক আনন্দ পেলেও, পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছেন না। বিজ্ঞান ধর্মসাপেক্ষ, জ্ঞান ও যুক্তির উপর বিশ্বাসের স্থান: মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের এই মার্জিত রূপ কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিককে প্রভাবিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই সঙ্গতিহীন মিলনের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিকদের অদৃষ্টবাদী করা ও তাঁদের অজ্ঞাতসারে একচ্ছত্র পুঁজির সবরকম প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের সহায়ক অথবা নিষ্ক্রিয় দর্শক করে তোলা; বিশেষ করে পরমাণুযুদ্ধের ষড়যন্ত্রে বৈজ্ঞানিকদের জড়িত করা। কুরী, বার্নাল, ল্যামেডিন, ষ্ট্রুইকের প্রগতিবাদের পতাকাতলে কিন্তু শান্তিবাদী বৈজ্ঞানিকদের ভিড় বেড়েই উঠছে। আর নিওথমিজম্ দর্শনের অন্তর্নিহিত বিপরীত ভাবসংঘাতের ফলে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে নিউরোটিক মনোভাব আর বিচ্ছিন্নতা।

নানাভাবে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা রোধ করা যাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারও বেড়ে চলেছে। জনমানস থেকে অদৃষ্ট নির্ভরতা তিরোহিত হয়ে এই ধারণা জন্মাচ্ছে যে উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার অব্যাহত প্রয়োগ মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করতে পারে। মুনাফার জন্য উৎপাদন নয়, প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন,—এই হতে চলেছে আজকের সর্বজনীন দাবী। এ দাবী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষকদের পক্ষে মারাত্মক। অদৃষ্ট ও দৈবনির্ভরতা পরিত্যাগ করে মানুষ আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চায়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। কাজেই প্রমেথিউসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার ষড়যন্ত্র, বিজ্ঞানকে হেয় করবার চেষ্টা, মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যম। কিন্তু এ চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভাববাদ এ বিজ্ঞানের যুগে অচল, আর বিজ্ঞানের গতি অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব এতে দেওয়া হলো না। মামফোর্ড-এর মত পণ্ডিতেরা

যে টেক্‌নোক্রেসির ভয় পাচ্ছেন, সে সম্বন্ধেও আলোচনা প্রয়োজন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান—শুধু এই কি বিজ্ঞান-বিভীষিকার কারণ? প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাত্মক প্রয়োগে—মানুষ 'অটোমেটন' হবে না কেন? এ সম্পর্কেও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। আজ বিজ্ঞান-বিভীষিকার শুধু একটিমাত্র দিক নিয়েই আলোচনা হল। আগামীবারে অন্যদিক নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

১৯৬৪—জানুয়ারী

যন্ত্রদানব ও যন্ত্রমানব

শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই যন্ত্রদানব-ভীতিতে এক শ্রেণীর-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিকের মন সমাচ্ছন্ন। প্রযুক্তি-বিদ্যার চরম উন্নতির দিনে সেই ভীতি আজ প্রবলতম। ভয়ের কারণ, যন্ত্রযুগে আন্তর্মানবিক সম্পর্কের ক্রমাবনতি। ভয়ের কারণ, মানবিকতার অবলোপ, যান্ত্রিকতার আবির্ভাব। ভয়ের কারণ, মানুষের যন্ত্রপ্রাপ্তি, যন্ত্রমানব বা অটোমেশনের জন্য;—বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও গভীরতার বৃদ্ধি।

সোজাসুজি বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নে আসা যাক। ১৮৪৪ সালে মার্কস লিখেছিলেন, —"Just as in religion the spontaneous activity of the human imagination, of the human brain and of the human heart, operates independently of the individual—that it operates on him as an alien, divine or diabolical activity—in the same way the worker's activity is not his spontaneous activity. It belongs to another; it is the loss of his self"। শ্রমজীবীর অবস্থা শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই অতীব শোচনীয়। আহার বিহার মৈথুন ছাড়া আর কোথাও তাদের সক্রিয় উৎসাহ নেই। পশুত্ব আর মানবত্বের সীমারেখা বিলীয়মান। "What is animal becomes human and what is human becomes animal." শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর তার কোনো অধিকার থাকে না। উৎপন্নের উৎকর্ষ ও পরিমাণ যত বাড়ে, শ্রমজীবী মানুষ ততই অসহায় হতে থাকে। "With the increasing value of the

world of things proceeds in direct proportion the devaluation of the world of men."..."The more man puts into God the less he retains in himself. The worker puts his life into the object, but now his life no longer belongs to him but to the object" শ্রমোৎপন্ন পণ্য থেকে মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন, তারই উৎপাদিত পণ্যশক্তির সঙ্গে তার বিরোধিতা।..."The life he has conferred on the object confronts him as something hostile and alien" ......"Estranged labour estranges the species from man।" সত্তা থেকে অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতাই মানুষের চরম ট্রাজেডি। এর পর ঘটে "estrangement of man from man।"

কার জন্য শ্রম? কিসের জন্য কাজ? শুধু জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য? তার বাড়তি কাজ যা করা হয় তার ফল লাভ করবে কে? কস্মৈ দেবায়? ঈশ্বরের জন্য। মিশর, মেক্সিকো ভারতে মন্দির নির্মাণ কার্যে এই কথা বলেই অনেককাল আগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হত। তার আগে হয়তো প্রকৃতি পূজায় উদ্‌বুদ্ধ করা হত শ্রমজীবী মানুষকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবে যখন প্রকৃতিশক্তি অনেকাংশে বশীভূত, বিজ্ঞানের আলোকে ও শিল্পসম্প্রসারণের ফলে ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমা যখন অনেকাংশে ম্লান, তখনও ফললাভের আশা না রেখে মানুষকে প্রকৃতি ও ঐশী শক্তির তৃপ্ত্যর্থে শ্রম করতে বলা নিরর্থক। মানুষ কি আজ একথা বিশ্বাস করে? না। আজ সে জানে শ্রমের ফল তার দ্বারা ত্যক্ত হয়ে অন্যের দ্বারা ভুক্ত হচ্ছে। মার্কসের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রাথমিক পর্বে শ্রমবিচ্ছিন্নতার ফল, পরবর্তীকালে আবার বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাপক ও সম্পূর্ণ করার কারণ। যেমন ঈশ্বর-কল্পনা প্রাথমিক পর্বে মানুষের বুদ্ধি-বিভ্রান্তির ফল, এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষের চরম বিভ্রান্তির কারণ। শুধু শ্রমজীবী শ্রেণীতেই নিবদ্ধ নয় বিচ্ছিন্নতা, আমরা জানি। সমাজের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরে আজ বিচ্ছিন্নতা পরিদৃশ্যমান। শুধু মজুরীর হার বৃদ্ধি বা ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য বিচ্ছিন্নতার নিরসক নয়।

আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ণ বিকাশের পূর্বে উৎপাদনের প্রাচুর্য-সম্ভাবনা থাকে না। তখন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের পরিকল্পনা নিরর্থক। সাম্যবাদী সমাজ আদিম বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটায় না। "The first positive

annulment of private property—crude communism—is thus merely one form in which the vileness of private property, which wants to set itself as the positive community, comes to the surface"...."It has indeed, grasped its concept, but not its essence"। এর পরই মার্কস লিখেছেন,— "Communism as the positive transcendence of private property, as human self-estrangement, and therefore as the real appropriation of human essence by and for man : communism therefore as the complete return of man to himself as a social (human) being...."। এখানে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ বিকাশ ও বিলোপের মধ্য দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের আবির্ভাব হবে, সেই সাম্যবাদী অবস্থার কথা বলেছেন। এ সাম্যবাদী সমাজের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বুর্জোয়া শিল্পবিপ্লবের পর ও এই সমাজব্যবস্থা উৎপাদনের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা এ সমাজের আবাহক। এই সমাজে শ্রমজীবীর বিচ্ছিন্নতার বিলোপ হবে। পূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটবে। মার্কস এই সমাজব্যবস্থাকে উন্নততর সমাজব্যবস্থা বলেছেন শুধু এই কারণেই নয়; এই সমাজে শোষক ও শোষিত—দুই শ্রেণীরই বন্ধনমুক্তি ঘটবে বলেই এ সমাজ কাম্য। শুধু শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী নয়, পরশ্রমজীবিরও মুক্তির এই একমাত্র পথ—because the whole of human servitude is involved in the relation of the worker to production।

বর্বর যুগের আদিম সাম্যবাদী সমাজে যে বিচ্ছিন্নতার উন্মেষ, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী সমাজে সেই বিচ্ছিন্নতার নিরসন। শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিতে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা, উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়তা ও অপার শক্তি বৃদ্ধির ফলে আবার সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শ্রম উদ্ভূত আবার শ্রম এর ফলে বহুগুণ শক্তিশালী। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবাধ সম্প্রসারণ সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্যক ও সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ সাম্যবাদে উত্তরণের পথ।

বর্তমান সমাজব্যবস্থার সংরক্ষকদের ভয় স্বাভাবিক। বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ভয়ে এঁরা ভীত সন্ত্রস্ত। সাম্যবাদী ধ্যানধারণা ও সাম্যবাদে

উত্তরণের সহায়ক প্রযুক্তিবিদ্যা বর্তমান সভ্যতার সংকটের কারণ—এ প্রচার বহুমুখী ও ভাববাদী দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া এ যুগে টি*কে থাকা যায় না। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি (আক্রমণ বা আত্মরক্ষা, যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। একচ্ছত্র পুঁজিবাদীদের মধ্যেও আছে প্রতিযোগিতা; সে প্রতিযোগিতায় প্রযুক্তিবিদ্যার ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশ অপরিহার্য। এ-ছাড়া আছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে উৎপাদন হারের প্রতিযোগিতা। আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রযোগ ব্যতিরেকে সে প্রতিযোগিতা অসম্ভব। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিককে প্রকৃতিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হয় নিজেদের গবেষণাগারে। এই প্রতিফলনের অর্থ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর পথানুসরণ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে শক্তিশালী করা। তাঁদের অজ্ঞাতসারে ছিপি আঁটা বোতল থেকে বেরিয়ে আসছে ভীতিপ্রদ বস্তুবাদী দৈত্য; ভাবের ধোঁয়ায় তাকে নস্যাৎ করা যাচ্ছে না। নিজেদের ভাবরাজ্যের এই সংকটকে এঁরা 'বিজ্ঞানের সংকট' বলে চিৎকার করছেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সভ্যতার সংকটের মূল কারণ বলে প্রচারে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

সংকটের তীব্রতার কারণ বহির্জগতে ঘনায়মান দুর্যোগ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পুরণো উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থা সক্ষম হচ্ছে না। উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়তা-প্রয়োগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া বেকারত্ব। সেই বেকারত্ব রোধ করার উপায় পুরণো এই ব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সর্ববৃহৎ সংস্থার প্রেসিডেন্ট জর্জ মিনি বলছেন—"We know that with the pace mechanical science is going, the different methods, the different techniques being applied, that automation will take more and more jobs in the years to come." অটোমেশনকে মিনি বিধাতার অভিশাপ মনে করেছেন—"There is no element of blessing in technological progress।" তাঁর এবং অনেকের মতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি জাতীয় দুর্যোগের নিশ্চিত সূচনা। বেকারত্ব ও তদ্দরুণ নিরাপত্তা বোধের অভাব রোধ করবার উপায় মিনি ও আমেরিকার শিল্পসম্রাটদের অজ্ঞাত। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। উৎপাদনে অংশগ্রহণ করলেও উৎপন্ন দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্নতা, আবার অংশগ্রহণ করতে না পারলেও জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা। এর প্রতিফলন সাহিত্য ও দর্শনে। ঈশারউড বলেছেন—"If I were asked to say in one word what is it that young Americans are chiefly writing about now-a days, I should answer—loneliness." কারণ—সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি।

কলিন উইলসন আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"And what is the significant figure of our age—the age that lies beyoned Darwin and Freud, Einstein and the Atom Bomb ?...the outsider. Mr. Wilson defines the 'outsider' as one who has a perception of the unstable foundations that human life is built upon and feels that chaos and anarchy lie deeper than the order that most of his fellowmen belive in." মেক্সিকোতে সেদিন দার্শনিকদের যে আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্স হয়ে গেল, সেখানে ভাববাদী দার্শনিকের দল বার্গশ'র 'ফিলজফিক্যাল ইনটিউশনিজম্‌' ও হাইডেগারের 'বিং এণ্ড টাইম' তত্ত্ব পেশ করে বললেন—"There was technological progress in the past too, but it is distinctive feature of our age that technics have revealed their intrinsic demonaical force and threaten to enslave man।" এঁদের বক্তব্য মোটামুটি এই রকম—বিজ্ঞান মানুষের হাতে যে অমিত শক্তি তুলে দিয়েছে মানুষ সেই শক্তির উপর প্রভুত্ব করতে অক্ষম, যে হারে যন্ত্রদানবের প্রমত্ত শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে মানুষের নৈতিকশক্তি ও আত্মচৈতন্য বাড়ছে না; নিজের ধ্বংসের প্রস্তুতিই করে চলেছে মানুষ। মানুষকে এ আত্মহনন থেকে নিবৃত্ত করবার একমাত্র উপায়, অবশ্য এঁদের মতে,—মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি। অস্তিত্ব থেকে সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিতে হবে ব্যক্তিকে সমষ্টির ও আমলাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে।

এরিক ফ্রম এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"....The new form of managerial industrialisation in which man builds machines

which act like men and develops men who act like machines, is conducive to an era of dehumanisation and complete alienation, in which men are transformed into things and become appendices to the process of production and consumption." এর আগে অরওয়েল দেখিয়েছেন যন্ত্রদানবের চাহিদার কাছে সত্য-শিব-সুন্দরের বলি, মানবতার অপমৃত্যু, মানবিক মূল্যবোধের সমাধি। ব্যক্তিত্ব হারিয়ে মানুষ পরিণত হয়েছে নির্দেশসূচক একটি সংখ্যায়।

ব্যাপক সম্মোহনের সাহায্যে মানুষকে অটোমেটনে পরিণত করা হচ্ছে—দেখিয়েছেন হাক্সলী। পার্টি ও সর্বাধিনায়কের নামে প্রচার চালানো হচ্ছে, স্বর্গরাজ্যের লোভ দেখানো হচ্ছে। এই প্রচার অভিভাবনের কাজ করছে। মস্তিষ্কে লোবোটমির মত অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে জামিয়াতিনের 'উই' নামক পুস্তকে। আর অরওয়েল একনায়কতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাক্সলীর বর্ণনা সর্বপ্রকার ব্যুরোক্রেসির সমালোচনা হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও জামিয়াতিন ও অরওয়েলের লক্ষ্য যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টি—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাত্মক প্রয়োগ করে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই সেখানে সত্যকে বিকৃত করা হয় প্রয়োজনের তাগিদে। বস্তুসত্য সেখানে অবহেলিত। সবার উপরে 'পার্টি' সত্য, তাহার উপরে নাই। "Whatever the Party holds to be true is truth।" পার্টির মতে—"Reality is not external. Reality exists in the human mind and nowhere else।" পার্টির নেতারা ক্ষমতালোভী। এই ক্ষমতা তাঁদের কাছে পরমার্থ। "Power is not a means: it is an end. And power means the capacity to inflict unlimited pain and suffering to another human being।" এই উদ্ধৃতিটি ফ্রমের "Escape from Freedom" থেকে গৃহীত। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা কিন্তু বলেন; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়তে চাইছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বস্তুবাদীরা সাবজেকৃটিভ সত্যকে সত্যের মর্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ, ভাববাদীদের 'সত্য'-এর সংজ্ঞার্থ তাঁরা বস্তুবাদীদের

ওপর চাপাতে চেয়েছেন; তাঁদের আরো জানা উচিত, 'ক্ষমতাভিত্তিক' মনস্তত্ত্বের প্রচার সমাজতান্ত্রিক দেশে বিরল, ক্ষমতাপ্রিয়তা মানুষমাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি নয়। ফ্রম অন্তত সেরকম মনে করবেন না :—তাহলে তাঁর একনায়কত্বের মূল তত্ত্বই যে অচল হয়ে যাবে। পার্টিনায়করা মানুষকে অটোমেটনে পরিণত করতে পেরেছেন, কেননা, তাঁর মতে, "Men being frail and cowardly creatures, want to escape freedom and are unable to face the truth"। আপাতত বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রদানব বিভীষিকার সোচ্চার প্রচারের উদ্দেশ্য কি ?

পশ্চিমী ধ্বংসোন্মুখ সমাজব্যবস্থার বিকল্প কোন ব্যবস্থা যে সম্ভব নয়, এই প্রচারই এঁদের উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদের শেষ রূপ ফ্যাশিজম ও কমিউনিজম একই ধরনের নিষ্ঠুর, বর্বর ও অমানুষিক : এ তত্ত্ব প্রমাণ করতে যেন এঁরা বদ্ধপরিকর। সমাজতন্ত্র যে ধনতন্ত্রের থেকে উন্নততর ব্যবস্থা ও মানুষের বিচ্ছিন্নতা-নিরসনের প্রাথমিক সোপান—এই ধারণার বিরুদ্ধে এঁদের জেহাদ। ঠিক এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দার্শনিকদের সম্মেলনে। কমিউনিজমের আদর্শ প্রচারই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রধান কারণ :—বলতে চেয়েছেন দার্শনিক পণ্ডিতরা। "Give up the idea of communism triumphing the world over. That inspires fear।" ......ধর্মগুরুরা বলছেন—শুধু আণবিক যুদ্ধের ধ্বংস থেকে নয়, মানুষকে সবরকম আদর্শবাদের ছোঁয়াচ থেকেও বাঁচাতে হবে। একজন ত' স্পষ্টই বলেছেন—"Must man be free, or should he become an automaton ; part of an automatic mass ? ...The Red philosophers are inclined to the latter view"। মেক্সিকোর একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে— "Marxists negate individual freedom in favour of allegedly existing collective freedom"। এই একই বাণী ধ্বনিত বাংলাদেশের দৈনিক সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় গত এক বছর ধরে।

এঁদের অটোমেশন বিদ্বেষ, বস্তুত সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিদ্বেষের নামান্তর মাত্র : রাজনীতির খেলা। রাজনৈতিক কূটতর্কে জড়িয়ে পড়া আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবতার অধোগতি ও বিচ্ছিন্নতার সহায়ক—এই ধারণা মনস্তত্ত্বসম্মত কিনা ?—এই শুধু

আমাদের বিচার্য। অটোমেশনের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশে কোনো নালিশ নেই। সোভিয়েত দেশের রভিনস্‌কী বলেছেন—"Like any other phenomenon of technological progress, automation not only can be a blessing for the working class and the whole of society, it already is an enormous blessing"। শ্রমের উৎপাদনশক্তি অনেকগুণ বেড়ে গেছে অটোমেশনের দৌলতে। হাজার হাজার লোকের কর্মচ্যুতি হচ্ছে বটে কলকারখানা থেকে, কিন্তু তারা আবার নতুন কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বেকার নেই। "Socialism does not and will never know unemployment." যিনি যে ছবি এঁকেছেন, আমেরিকা ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষে তা সত্য, বলেছেন রভিনস্কী, কিন্তু সমাজবাদী দুনিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। যে সমাজব্যবস্থায় অটোমেশন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সমাজব্যবস্থার গলদের দিকে নজর না দিয়ে, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আয়ু নিঃশেষিত একথা না বলে, যিনি প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতিকে সকল দুর্গতির মূল বলে বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রমিকরা এ যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করবে কি? অটোমেশন চালু হবার পর ১২টি আমেরিকান কারখানার উৎপাদন তিনগুণ দাঁড়িয়েছে, ইংলণ্ডে একটি ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ৪ গুণ বেড়েছে। অটোমেশন শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধি করছে তা নয়। শ্রমের গুণগত পরিবর্তনও ঘটছে। শ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজ আজ আয়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে! কায়িক ও মানসিক শ্রমের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে আসছে। অটোমেশন প্রাচুর্যের জনক—কাজেই পূর্ব-পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থায় এর মূল্য অসীম। কিন্তু মুনাফার জন্য যেখানে প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদনকে সংকুচিত করতে হয়, সেখানে সময় বিশেষে অটোমেশন দেবতার অভিশাপ। কিন্তু অটোমেশনের ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। কাজেই মুনাফাসর্বস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাতেও অটোমেশনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মালিকদের আসল সংকট এইখানে। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদের মতে—"The main reason for automation being an evil is the private ownership of the means of production and the resultant anarchy of production, the uncontrolled and unplanned character of production under capitalism" (Gorbunov)। গর্বুনভ আরও

বলেছেন যে তাঁদের দেশে "Everything in the name of man; for the benefit of man"। কাজেই অটোমেশন তাঁদের কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ।

অটোমেশন-বিদ্বেষীদের, বিশেষ করে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের অভিযোগের তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক। মানুষ ক্রমশ যন্ত্রাঙ্গ হয়ে পড়বে, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি হারিয়ে শুধু বোতাম টেপার কাজে নিযুক্ত হবে, হয়ে উঠবে বিবেকহীন বোবা পশু! বিচ্ছিন্নতা হবে আরও ব্যাপক ও গভীর!—এই হচ্ছে অভিযোগের মর্ম। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে অটোমেশনের ফলে সাধারণ মানুষের শ্রম আয়াসসাধ্য হবে, মজুরী বাড়বে, বিশ্রাম সময় কাজে লাগবে জ্ঞান আহরণ ও মানসিকতার উন্নয়নে। অটোমেশনের যন্ত্রপাতি অতি জটিল। এসব যন্ত্রপাতির নক্সা অঙ্কন, উৎপাদন ও মেরামতিতে শ্রমিকদের প্রয়োজন অনেক বেশি জ্ঞান আহরণ ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের ক্ষমতা। দক্ষতা ও বিচারশক্তি নতুন পরিবেশে বাড়বে—বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়াও দরকার হবে সাধারণ জ্ঞান ও সমন্বয়-বুদ্ধির। প্রাক্ অটোমেশন যুগের শ্রমিকের চেয়ে অটোমেশন-যুগের শ্রমিক হবে উন্নততর জীব। খণ্ডিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অধিকারহীনতা বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অটোমেশনের যুগে একজনের শ্রমে উৎপাদনের সব কয়টি স্তর উত্তীর্ণ হবে, কাজেই খণ্ডিত উৎপাদন ব্যবস্থার কুফল থেকে মুক্ত হবে শ্রমিক-মানস। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর শ্রমিকের ভোগস্বত্ব স্বীকৃত (যদিও এখনও সীমিত), রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; শ্রমের উদ্দেশ্য অনেকটা পরিস্ফুট। অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা অনেকাংশে দূরীভূত। ব্যক্তিগত অভীপ্সা ও নিরাপত্তা সমাজগত আশাআকাঙ্খার সঙ্গে অনেকাংশে একাত্মীভূত। ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব দূরীভূত হওয়ার ফলে শ্রমফল থেকে মানুষ পুরোপুরি বঞ্চিত নয়। কাজেই বিচ্ছিন্নতা সংকুচিত। মার্কস-এর ভাষায় বিজ্ঞান এখন "direct productive force",—কেননা বিজ্ঞান এখন উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্পৃক্ত ও গবেষণা পূর্বপরিকল্পিত। নতুন আবিষ্কার কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত নয়; সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত। পেটেণ্ট-রাইট-মুক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রহস্য আবৃত রাখবার চেষ্টা নেই। বিজ্ঞান জনসাধারণের সেবক, প্রযুক্তিবিদ্যা

প্রাচুর্যের বাহন। পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বিচ্ছিন্নতার নেতিকারক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি ও উৎপাদনব্যবস্থায় যথাযথ প্রয়োগসম্ভাবনার মধ্যে ধ্বনিত আরও উন্নততর সমাজব্যবস্থার আগমনী সংগীত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যক্তিত্বধ্বংসী ত' নয়ই, বরং ব্যক্তিত্ব-উন্নয়ক। অটোমেশন মানুষকে অটোমেটন করেনা। উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্তৃত্বহীনতা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে। নিরাপত্তার অভাব, উপবাস, অপমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে অক্ষমতাবোধ মানুষকে অধ্যাত্মবাদী, ভাগ্যনির্ভর ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে। বিষম প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা, সকলের পক্ষে সমান সুবিধা সুযোগের অভাব—লোভ, ঈর্ষা ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্মদাতা। একচ্ছত্র পুঁজিবাদ মানুষের সত্তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উন্নয়নের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদী স্বার্থ বিজ্ঞান তথা পৃথিবীর উন্নতি ব্যাহত করছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মামফোর্ড বলেছেন "machines increasingly took the place of men and men themselves were tolerated only to the extent that they took on the attributes of machines, free form passions and emotions, indifferent to values" [L. Mumford : 'In The Name of Sanity']। একচ্ছত্র পুঁজিবাদের বৈপরীত্যের মধ্যে, তাঁর দেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে কারণ না খুঁজে তিনি এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন কেবলমাত্র অটোমেশন ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগে। তাঁর মতে যুক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধির সম্যক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের মাধ্যমে মার্কস-বর্ণিত 'পূর্ণপরিণত ব্যক্তিত্ব' লাভ করতে পারে মানুষ। তার জন্য প্রয়োজন দুই শিবিরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অন্যত্র তিনি বলেছেন—"ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের অনেক ভাল জিনিস গ্রহণ করছে, তেমনি সমাজতন্ত্রও ধনতন্ত্রের যা-কিছু গ্রহণযোগ্য, গ্রহণ করুক" [Mumford—'The transformation of Man']। এইভাবেই মার্কস-বর্ণিত "পূর্ণপরিণত ব্যক্তিত্ব" বিকশিত হবে। তাঁর একথায় মার্কসবাদীদের আপত্তি নেই। পুরণো সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে বা বর্জন করে সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলেই

সমাজতন্ত্রের জন্ম। তবে তিনি এবং তাঁর মতো অনেকে যখন বলেন, "Instead of maintaining their ideological purity, each regime, seeking a dynamic equilibrium, will tend to take on more of the diversified attributes of living systems", তখন তাঁদের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়েও—মার্কসবাদী সমালোচক বাধ্য হন এই উক্তি করতে—বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কাছে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার উৎকর্ষ পরিস্ফুট হয়ে উঠুক এই তাঁরা চান, বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধকে তাঁরা এড়াতে চান, তাঁদের সাম্যবাদের আদর্শ পতাকা নামাতে চান না। মতবাদের সমন্বয়ে বিশ্বাসী নন মার্কসবাদীরা। তাঁদের দৃঢ় অভিমত এই যে, সুস্থ সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজতন্ত্র ও পরে সাম্যতন্ত্র মানুষ গড়ে তুলবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি তারই সূচনা। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ভিন্ন ক্রমোন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ অসম্ভব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেমন দু'শ' বছর আগেকার বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব ছিল না, আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অটোমেশনের সার্বিক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এর ফলে আরও তীব্র হয়ে উঠছে। অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যক্তিসম্পত্তিকেন্দ্রিক মান-সিকতা অটোমেশনের যুগে, যৌথ উৎপাদনের যুগে অচল। নতুন সামাজিক বিন্যাস ব্যতিরেকে নতুন মূল্যবোধের, নতুন মানসিকতার সম্যক স্ফুরণ অসম্ভব। হাক্সলী, অরওয়েল, ফ্রম, মামফোর্ড যখন ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন, এই সহজ সত্যটি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মানসিকতার গুণগত পরিবর্তনে এঁরা অবিশ্বাসী। পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটবে, নতুন আন্তর্মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে, শ্রমমূল্য বাড়বে, বিশ্রামের সময় বেশি পাবে মানুষ, জটিল যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও উৎপাদনের জন্য শুধু বিশেষ জ্ঞান ছাড়াও সাধারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বাড়বে, বাড়বে নিরাপত্তাবোধ, জনশিক্ষার মান ক্রমোন্নত হবে—কাজেই বৃদ্ধি পাবে মানবিক চেতনা ও উন্নততর বুদ্ধি বিবেচনা; নবতর মূল্যবোধ গড়ে উঠবে। নতুন ধাঁচের মানুষ তৈরি হবে। বিজ্ঞান মানুষকে অটোমেটন করবে না। বিজ্ঞান মানুষের চাহিদা মিটিয়ে তার আত্মিক সমৃদ্ধির পথ খুলে দেবে। শুধু ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য সৃষ্টি নয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানসিকতার উন্নতি সাধনের উপায়। পাভলভের মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানাশ্রিত মনোবিদ্যার

সাহায্যে শ্রেণী সমাজ থেকে প্রাপ্ত ভয়, দুর্বলতা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদির অবলুপ্তি ঘটানোও সম্ভব হবে।

এবারের আলোচনাতেও আমার বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। ব্রেইন-ওয়াশিং, মেন্টিসাইড ইত্যাদির সম্যক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। 'সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ পার্টির হুকুম তামিল করতে করতে স্বাধীন সত্তা হারিয়ে যন্ত্রাঙ্গ হয়ে গেছে ও বিশেষভাবে কণ্ডিশন্‌ড হয়েছে'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও কিছু আলোচনা করা সম্ভব হ'ল না। আগামী দিনে এ নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

মার্কস-এর সমস্ত উদ্ধৃতি তাঁর "Economic and Philosophic Manuscripts of 1844" বই থেকে নেওয়া। —লেখক

৩

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে

বিজ্ঞান ও আগামী সমাজ

বিচ্ছিন্নতা (alienation) কথাটি বোধহয়, প্রথম ব্যবহার করেন রুশো। জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকেই বিচ্ছিন্নতার সূচনা। তিনি বলেন—"The people is not and cannot be represented by deputies. Sovereignty cannot be re-presented"........কিন্তু মনোনীত প্রতিনিধি ছাড়া বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্র পরিচালনাই অসম্ভব। তবে? হেগেল ও মার্কস বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক তত্ত্ব নির্দেশ করলেন। শ্রমের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করে। 'Man makes himself twofold not only intellectually, as in the conscience, but in reality, through his work, and hence contemplates himself within a world made by himself' (K. Marx)। শ্রম যত খণ্ডিত ও জটিল—মানুষ ততই বিচ্ছিন্ন। মানুষ যত বেশী উৎপাদন-কুশলী ও প্রকৃতির উপর আধিপত্যক্ষম, তত বেশি সে তার শ্রম নির্মিত নতুন জগতের বন্দী। শ্রমলব্ধ পণ্য তার অনায়ত্ত, শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য তার বোধগম্য নয়। তাই জগৎ অর্থহীন। শ্রম থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে নিজের

থেকেও বিচ্ছিন্ন। তাই—activity appears as suffering, strength as powerlessness, production as emasculation ...... । জীবন থেকেও সে বিচ্ছিন্ন। কেননা 'for what is life if not activity'? উৎপাদন বর্দ্ধিত, কিন্তু ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত, সঙ্কুচিত। এর প্রতিকার কোথায়? প্রতিষেধক কি? কীভাবে জীবনকে, ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডিত রাখা যায়? আত্মার অধোগতি কিভাবে রোধ করা যায়।

আমাদের সমাজ বাণিজ্য-ভিত্তিক। বাণিজ্যিক লেনদেন তার নিজস্ব গতি-প্রকৃতি, নিজস্ব আইনে নিবদ্ধ। মুনাফার জন্য দ্রব্য, মুনাফার জন্য শ্রম, মুনাফার জন্য মানুষ। "Those engaged in the commercial exchange are totally alienated from one another and the product is likewise totally alienated from them who put it on the market"। তাই চালের কালোবাজারী অনায়াসে বলতে পারে "I 've no idea what rice is, I only know its price."

মানুষের সামাজিক বিচারবুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের মধ্যে ক্রমশ দুস্তর ব্যবধান রচিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা বৃদ্ধির এ-ও এক কারণ। গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, কেপলারের আবিষ্ক্রিয়া সাধারণ বুদ্ধির অধিগম্য ছিল। আজকের পারমাণবিক বা আপেক্ষিকতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। সিবারনেটিক্স আরও জটিল। বিমূর্ত গাণিতিক চিহ্ন ও প্রতীকময় আজকের বিজ্ঞানজগৎ। শুধু বিজ্ঞানীর ধারণায়ত্ব এই জগৎ থেকে সাধারণ মানুষ নির্বাসিত। বিচ্ছিন্নতাবোধ তাই আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ। অনধিগম্যতার হিমপ্রবাহে মানুষ আজ বেশি তুষ্ণী, বেশী শীতল। বিচ্ছিন্নতা থেকে হতাশা, হতাশা থেকে নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু এ অবস্থা পরিবর্তন-অসাধ্য নয়। এ নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি। আরো আলোচনা দরকার।

ভৌতিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে ত্বরান্বিত। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশক্তি বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। আমাদের আশাবাদ কিন্তু উনিশ শতকের জড়বাদীদের যান্ত্রিক-বিশ্বাস সঞ্জাত নয়, বা সরল-মানবতাবাদীদের পরম-কারণবাদ সম্ভূত নয়। আমরা প্রতিকূলশক্তিকে হেয়জ্ঞান করি না।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম ছাড়া প্রগতি সম্ভব নয়, আমরা জানি। উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিই প্রগতির মাপকাঠি নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি যন্ত্রশক্তির ক্রমোন্নতির উপরই শুধু নির্ভরশীল—এ ভ্রমাত্মক ধারণা আমরা পোষণ করি না। ভোগ্যপণ্যের আধিক্য সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও গভীরতা, মানবিক সম্পর্কের আপাতক্রমাবনতি আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতির শৃঙ্খলমুক্ত হয়েও মানুষ যদি যন্ত্রদানবের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়ে—তবে যন্ত্র ও বিজ্ঞানের জয়গান অযৌক্তিক। মানুষ স্বাধীনতা চায়, বন্ধন ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি চায়। মানুষ মানুষকে ভাই ও বন্ধু হিসেবে দেখতে চায়—মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন কামনা করে।

রুশোর সুবিখ্যাত উক্তি—"Man is born free"—উদ্দীপনাময় হলেও সত্য নয়। শিশু অসহায় ও অজ্ঞ, মানবজাতির শৈশব ও অজ্ঞতা অসাহায়তার ইতিহাস। কল্পনার পাখা মেলে নভোচারী হতে চেয়েছে সে লক্ষ বছর ধরে, কিন্তু অভিকর্ষের শক্তি, মাটির বন্ধনকে কাটাতে পেরেছে মাত্র সেদিন। তার এই অবাধ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তার শ্রমলব্ধ বিশেষ ধরনের জ্ঞান—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা।

কিন্তু এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের শ্রম থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শ্রমাপহরণ আরও বেশি সহজ হয়ে উঠেছে। মানুষের সৃজনাত্মক উদ্যমের ঘটেছে ক্রমাবনতি।

এ অভিযোগ অনস্বীকার্য। কিন্তু এর জন্য দায়ী কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা? না। দায়ী বিশেষ ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দায়ী নতুন শক্তিকে পুরণো আবরণের মধ্যে নিহিত রাখবার প্রচেষ্টা। মানবকল্যাণের জন্য নতুন সমাজব্যবস্থা আজ অতিআবশ্যক। মানুষ পরিকল্পনাভিত্তিক উৎপাদন ও পরিবেশনের সাহায্যে নিজের আধিভৌতিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। তবেই আসবে আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার সময় ও সুযোগ—স্বাধীনতার পথে পদক্ষেপের সূচনা।

"The whole sphere of the conditions of life which environ man and have hitherto ruled man now comes under the dominion and control of man, who for the first time becomes the real conscious lord of nature

because he has now become master of his own social organisation." (Engels).

নতুন সমাজব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা নিরসনের নিশ্চয়তা আছে। নতুন মানবিক গুণ ও সম্পর্কের উন্মেষ ঘটবেই। মানবমনের বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

নতুন সমাজব্যবস্থায় শ্রমাপহরণ থাকবে না। নতুন সমাজব্যবস্থা আমরা চাই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ণপ্রয়োগ ও সম্যক বিকাশের জন্য। আগামী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিটি সক্ষম মানুষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায়। সে এখানে, তার শ্রমের পূর্ণ ফলভোগের অধিকারী এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থায় পেশীর শ্রম ও মস্তিষ্কশ্রমের সীমারেখা বিলুপ্ত। নতুন সামগ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির দৌলতে সুসমন্বিত মানসিকতা গঠিত। শ্রমাপহরণ বন্ধ হওয়ার ফলে মানুষের শ্রেণীচরিত্র লুপ্ত। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ অনেকাংশে সীমিত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধপরিধি সংকুচিত। শ্রম এখন আর জীবনধারণের জন্য গুরুভার কর্তব্য নয়, শ্রম এখন দেহ-মনের নিজস্ব প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত আনন্দ অনুষ্ঠান। নিয়মানুবর্তিতা স্বতঃপ্রণোদিত, কাজেই আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত। মানুষ সেখানে রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য, দুনিয়ার মানুষের জন্য স্বার্থত্যাগে পরাঙ্মুখ নয়। বর্তমান যুগের সমাজেও নতুন মানবগোষ্ঠীর অগ্রদূতের সাক্ষাত মাঝে মাঝে মেলে। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, নতুন সমাজে নতুন মানবিকতার বিকাশ ঘটবে। ক্রমশ মানুষ তার ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, জাতিস্বার্থের উর্ধ্বে উন্নীত হয়ে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামী হয়ে উঠবে—এও আমরা বিশ্বাস করি।

১৯৬৫, জানুয়ারী

গণতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতা

আমরা জানি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও শ্রমবিভাগের ফলে মানুষ নিজের শ্রম থেকে, অন্য মানুষ থেকে ও নিজের সত্তা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্বোৎপাদিত দ্রব্যের উপর স্বত্ব তার বিনষ্ট, আত্মশ্রমে পরিবর্তিত জগতের মাঝে আজ যেন সে অন্যগ্রহ-ভ্রষ্ট আগন্তুক। এ-ছবি এখন শুধু শিল্পোন্নত পশ্চিমী দুনিয়ার ভাবলে ভুল হবে। অনুন্নত দেশেও দ্রুত শিল্পায়ন-প্রচেষ্টা

চলেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত শিল্পনগরী গড়ে উঠছে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের উদ্যম দেখা দিয়েছে। মান্ধাতাযুগের কৃষিব্যবস্থায় আংশিকভাবে হলেও যন্ত্রযুগের ছোঁয়া লেগেছে, কৃত্রিম সার আর আধুনিক সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োগে কৃষি-পণ্য বৃদ্ধির আয়োজন করা হচ্ছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু মুষ্টিমেয় ধনী কম্‌প্রাডর গোষ্ঠীর হাতে পুঁজি ও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং সাধারণের আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি ; কিন্তু তাদের মানসিকতার কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে নিঃসন্দেহ। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যক্তিসম্পর্কের ক্রমবিলোপ ঘটছে। শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও নগরাঞ্চলে বুর্জোয়াযুগের বিচ্ছিন্নতার অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ; গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছাপ লেগেছে এবং জমির মালিকানাস্বত্বের খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার না বাড়লেও সংখ্যা বেড়েছে। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনকালীন প্রচার মানুষের সমাজ-চেতনা কিছুটা বাড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার ব্যক্তিকে অধিকতর আত্মসচেতন করেছে। কৃষিপণ্যে পুঁজি লগ্নীকৃত হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর দরিদ্র কৃষকের ভোগাধিকার ক্রম-সঙ্কুচিত হচ্ছে। প্রত্যাশা বাড়ছে কিন্তু ফললাভ হচ্ছে না। কাজেই গ্রামাঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। জনসাধারণ ক্রমশ জমির ও কারখানার মালিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের বিশেষ রূপ ও অন্যান্য রাজ্যের নানাবিধ বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার সংবাদ শুনে অনুমিত হচ্ছে যে শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

আধুনিককালের গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে একটু পিছনে তাকাতে হবে। অন্ন-বস্ত্র-আলোর জন্য আন্দোলন, অবশ্য ভিন্ন রীতি ও পদ্ধতিতে, মানুষ করে আসছে আদিম যুগ থেকে। প্রথমে দলবদ্ধভাবে প্রার্থনা জানাতো অন্ধ প্রকৃতির কাছে। তারপর এই প্রার্থনা বা প্রকৃতি-স্তুতির ভার পড়ে 'সামান' বা পুরোহিত শ্রেণীর উপর। যাদুবিদ্যা অথবা যাগযজ্ঞ পূজাপার্বনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে তুষ্ট করার দায়িত্ব গ্রহণের ফলে যেমন এই জনপ্রতিনিধিরা বিশেষ সুখসুবিধা ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন, তেমনি আবার জনগণকে তুষ্ট করার, জনতার বিক্ষোভবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করার তাগিদে বিশেষ মননশক্তির অধিকারীও এঁরা হয়ে উঠলেন।

তবে তখনও এই প্রতিনিধিরা জনসাধারণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নন। কালক্রমে, রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের যুগে ক্রমশ জনগণ-প্রতিনিধি ঈশ্বরের প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হলেন। জনগণ বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো শাসক শ্রেণী থেকে। এই বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হল ধনতন্ত্রের যুগে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশ ঘটলো, প্রতিষ্ঠিত হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। শাসক গোষ্ঠী আর ঈশ্বরের প্রতিনিধি নয়, সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আত্মসচেতন মানুষের উপর আত্মশাসনের দায়িত্ব। প্রকৃতি-বিজ্ঞান যাদুবিদ্যার স্থান গ্রহণ করেছে। যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতির পরিবর্তে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষ তার অন্নবস্ত্র আলোর সংস্থান করতে শিখেছে। আপনাকে আপন-ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক বলে মনে করছে। কিন্তু এসত্ত্বেও, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ফলে ভোগ্যপণ্য থেকে সে অধিকতর বিচ্ছিন্ন। উৎপাদন ও বণ্টনের পণ্যভিত্তিক অবজেকটিভ আইনের নাগপাশে সে বাঁধা। আন্তর্মানবিক সম্পর্ক যান্ত্রিক ও বিধ্বস্ত। এ হল একদিকের বিচ্ছিন্নতা। অন্যদিকে, নির্বাচনের অধিকার পুরোপুরি নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের হাতে অবাধ ক্ষমতা, প্রতিনিধি ও জনগণের সংযোগ নেই, অতিঢক্কা-নিনাদিত ব্যক্তিস্বাধীনতাও বিপন্ন। অনেকদিন আগেই এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ইংগিত দিয়েছিলেন রুশো। গণতন্ত্রের স্ববিরোধিতা তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। Sovereignty ... cannot be represented, it lies essentially in the general will, and does not admit of representation"। কিন্তু উপায় নেই। রাষ্ট্রের আয়তন বেড়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, কাজেই প্রতিনিধিত্ব ছাড়া শাসনযন্ত্র চলতে পারে না। রাষ্ট্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রযন্ত্র জটিল হয়েছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের আসল লক্ষ্য, গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা ও প্রতিনিধি-শাসনের দ্বারা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে হবেই।

আজকের বঞ্চিত মানুষ তারই শ্রম-সৃষ্ট স্কাইস্ক্রেপারের দিকে যেমন অবোধ ও অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে, তেমনি অসহায়ত্ব ও আশংকার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখে তারই সৃষ্ট, তারই নির্বাচিত প্রতিনিধি-গঠিত অপার শক্তিসম্পন্ন শাসন যন্ত্রের দিকে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মাষ্টার বুইকের আরোহী মন্ত্রী কি তারই নির্বাচিত প্রতিনিধি? লাঠিধারী পুলিশ, রাইফেলধারী মিলিটারী কি তারই

স্বজন? তার স্বার্থরক্ষার জন্য নিয়োজিত? তার দেওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করপুষ্ট রাজস্ব থেকে থেকে কি এরা পরিপোষিত? উত্তর খুঁজে পায় না। মন্ত্রী, পারিষদ, বিচারক, অধিকর্তা, পাইক, পেয়াদা,—এদের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সম্পর্কের মত এ সম্পর্কও পণ্যভিত্তিক। 'জন-গণ-মন-অধিনায়করা', নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, যে আরামকক্ষে বসে প্রজাকুলের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেখানে জনগণের মতামত প্রকাশ তো দূরের কথা, অবাধ প্রবেশেরও অধিকার নেই। অতি-সাধারণ দু'একটা বিল বা আইনের খসড়া হয়ত জনসাধারণের কাছে পূর্বাহ্ণে প্রচারিত করা হয়, কিন্তু বেশির ভাগ অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী লোকসভার বা বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি। আর সে সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন অনেক সময়েই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনগণের অজ্ঞাতসারে।

"The great decisions are removed from the elected representatives of the people and placed in the hands of a small group of rulers. The state is alienated from the average citizen, who generally thinks of it 'as the powers that be' or 'them up there', never as 'us'"। এ-মন্তব্য একজন ইয়োরোপীয়ান সমালোচক ইয়োরোপের গণতন্ত্র প্রসঙ্গে করলেও, আমাদের দেশের পক্ষেও প্রযোজ্য। বিধানসভা বা লোকসভার বাইরে শাসনযন্ত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণ আরো অজ্ঞ। জেলা, মহকুমা স্তরে যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা আরো গভীর। তাই সাধারণ মানুষের শাসনযন্ত্রের প্রতি মনোভাব হয় ভীতির না হয় নিস্পৃহতার। রাজনীতি ও নেতাদের সম্বন্ধে বেশির ভাগ মানুষই অনীহা অথবা বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু প্রতিকারের উপায় নেই। তাই, মনোভাব প্রকাশ না করে মুখ বুঁজে থাকাই শ্রেয়। সমালোচনায় কোন ফল হবে না, তাই, "Lie low and keep quiet",—জনসাধারণের মটো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পশ্চিমী দুনিয়ায় নয়, আমাদের দেশেও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমে চরমে উঠতে চলেছে। মনের দিক থেকে সরকার ও শাসককুল সাধারণ মানুষ থেকে ক্রমশ আলাদা হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থাকে, শাসনযন্ত্রের কোনো অংশকে, জনসাধারণ নিজস্ব বা জীবন্ত বলে মনে করতে পারছে না।

কাফকার "দি ক্যাস্‌ল্" উপন্যাসের বারনাবাসের মত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করছে আমলাতন্ত্রে আমলাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, রূপ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই। সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের সঙ্গে সংযোগের সূত্র নেই, আর থাকলেও সেই সংযোগ বা আলাপ-আলোচনা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা কোথায়? হৃদয়হীন, মূর্তিহীন আমলাতন্ত্র নিষ্ঠুর যান্ত্রিক নিস্পেষণ ব্যক্তি-সত্তাকে, হৃদয়াবেগকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। সিদ্ধান্ত নেবার কর্তা কে? সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার দায়িত্ব কার? ন্যায়বিচার পাব কোথায়? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। এই মানসিক-বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী সম্পত্তি যে জনসাধারণেরই সম্পত্তি এবং আসলে সরকার জনসাধারণের নির্বাচিত অছি—এই সত্য অনুধাবন করা জনসাধারণের পক্ষে কি সম্ভব? বহুদিন ঔপনিবেশিক দাসত্ব শৃঙ্খলে পিষ্ট, অত্যাচারিত জনসাধারণ পুরণো বিদেশী শাসকগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুণ সরকারকে বা সরকারী সম্পত্তিকে নিজস্ব মনে করতে অনভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সে নেতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে আজকের মনোভাবের তুলনা চলে না। সেদিন সে স্বপ্ন দেখেছে স্বাতন্ত্র্যের, স্বাধীনতার; ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানের বিলোপ আশা করেছে। আজ বোধ হয় তার কাছে ভবিষ্যৎ বর্তমানের থেকেও ভয়াবহ মনে হচ্ছে। স্বপ্ন দেখারও মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

নিজের সৃষ্ট যন্ত্রশক্তির দাপটে ব্যক্তি আজ স্তম্ভিত, অসহায়, হতচেতন। "The individual is faced by enormous, impersonal incomprehensible machines whose strength and size fill him with a sense of his own impotence"। জীবনস্রোত স্তিমিত, রুদ্ধ।

এই নতুন শক্তিকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রয়োজন নতুন সমাজ। উন্নততর সমাজব্যবস্থাই শুধু নবতর আন্তর্মানবিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে এই বিচ্ছিন্নতা রোধ করতে পারে। জীবনস্রোতের নতুন বিস্তারের পথ খুলে দিলে পঙ্কিল আবিলতার সৃষ্টি হবে না; দুকূলপ্লাবী জলোচ্ছ্বাসও দেখা দেবে না।

৪

আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা

আজকের মনস্তাত্ত্বিকের কাছে প্রধান সমস্যা মানবমনের ক্রমবর্ধমান অসহায়ত্ব বোধ, অপরাধমন্যতা ও নিঃসঙ্গতার কারণ অনুসন্ধান। দেশজয়ী কালজয়ী মানুষ দূরকে নিকট করছে, মহাসাগর-বিভক্ত দেশ দেশান্তরের মাঝে সংযোগস্থাপন করেছে; কিন্তু অন্য মানুষ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, মানুষকে মানুষের শত্রু মনে করছে। তার ফলেই দেখা দিয়েছে অপরাধমন্যতা, অসহায়ত্ব বোধ আর নিঃসঙ্গতা। "The world is more one than ever, and yet, man is more than ever divided"। এ যুগের এই হল বৈশিষ্ট্য। এই যুগকে কেউ বলছেন পারমাণবিক যুগ, কেউ বলছেন অটোমেশনের যুগ। মনস্তাত্ত্বিকের বিচারে এটা বিচ্ছিন্নতার যুগ। মানুষই আজ মানুষের প্রধান শত্রু। "His enemy number one is MAN...... he has been transferred by man into a convict for their use" (Sartre)। আজ মানুষের মনে তীব্র সন্দেহ আর হতাশা ও সমাজের প্রতি অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণা। শুধু তাই নয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষ আজ আত্মসত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন, আত্মহননে সচেষ্ট। "These men are not merely rejecting life, many of them are anti-life". কলিন উইলসন তাঁর আউট-

সাইডার গ্রন্থে পশ্চিম-ইয়োরোপের সাহিত্যে 'আউটসাইডারে'র প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে আউটসাইডারের চরিত্রে যুগমানস প্রতিফলিত। জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে যুগ-নায়ক আউটসাইডার জীবন-বিযুক্ত। এ-জীবনের কোনো সুস্থিত ভিত্তি নেই ; আছে শুধু অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। এখানে সংযুক্তির চেষ্টা নিরর্থক। সমাজ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে বন্ধ ঘরের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে নিস্পৃহ দর্শকের মত বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে আছে আজকের মানুষ। প্রত্যেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জীবনসমুদ্রে ভাসমান।

বিচ্ছিন্নতাবোধ উনিশ শতকে বা তার আগেও যে ছিল না,—এমন নয়। কিন্তু সেদিনের বিচ্ছিন্ন মানুষ বা আউটসাইডার ছিল ব্যতিক্রম। যুগদর্শনে তাদের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হোতো না। অসুস্থ মনে করে তাদের অনুকম্পা করা চলতো। কিন্তু ডারউইন-ফ্রেজার-ফ্রয়েড-আইনস্টাইনোত্তর যুগে বিচ্ছিন্নতাই মানসধর্ম বলে স্বীকৃত। সমাজ ও জীবনের বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতাকে আজ আর আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আরোগ্য-সাপেক্ষ কোনো অসুস্থতা মনে করা চলে না। বিচ্ছিন্নতা মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় স্বভাবধর্ম থেকে উদ্ভূত।

অন্তত, এই বিশশতকের ষষ্ঠ দশকের একদল মনস্তাত্ত্বিক এইরকমই মনে করেন। তাঁদের বিচারে বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক ও সার্বজনীন প্রক্রিয়া, বর্তমান যন্ত্রযুগে ঘটেছে এর বিস্তার ও ব্যাপ্তি। মানসিকতা ও মানবিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন এতদিন মানুষ দেখে এসেছে, সে স্বপ্ন কোনোদিন সফল হবে না। কেননা মানুষের ভাবনা-চিন্তা-ব্যবহার সবই কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য, সামঞ্জস্যবিহীন, নিয়ন্ত্রণাসাধ্য, যুক্তিহীন ; বাধ্যকারী নির্জ্ঞান প্রবণতা দ্বারা আমরা সকলেই পরিচালিত। এবং এই "irrational compulsive unconscious drives" মানবমনের উপর ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফল। নয়া-ফ্রয়েডবাদ বা সংশোধিত মনসমীক্ষার প্রধান প্রকল্পের (hypothesis) সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিচার অসম্ভব। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতা বিশ্লেষণের পূর্বে নয়া-ফ্রয়েডবাদের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের আধুনিক শিক্ষিত মানসে এই নতুন মন-সমীক্ষার প্রকল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রগতিশীল ভাবধারা হিসেবে পরিগণিত। শিল্প

সাহিত্যের, বিশেষ করে আধুনিক সিনেমা ও নাট্য-আন্দোলনের পুরোধায় রয়েছেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই প্রায় এই ভাবাদর্শে কমবেশি আবিষ্ট। ব্যক্তি মানসের বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত অসহায়ত্ববোধ, অপরাধমগ্নতা, আবিষ্টভাব ও সংবিষ্ট কার্যকলাপ—এ-যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপযোগিতা আজ পরিহাসের বিষয়: মানুষ জানে না সে কি, কেন এবং কোথায়! উদ্বিগ্ন ব্যক্তি বৈরি-ভাবাপন্ন সামাজিক পরিবেশে নিরাপত্তার আশায়, আত্মরক্ষার তাগিদে, জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে, ক্রমশ আত্মসর্বস্ব বিবেকহীন যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে কিন্তু তার নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়েছে। "By loosing his fixed place in a closed world man loses the answer to the meaning of his life ; the result is that doubt has befallen him concerning himself and the aim of life. He is threatened by powerful superpersonal forces, capital and the market. His relationship to his fellowmen, with everyone a potential competitor, has become hostile and estranged ; he is free—that is, he is alone, isolated, threatened from all sides ..... paradise is lost for good, the individual stands alone and faces the world"—কথাগুলো বলেছেন একজন বিশ্ববিখ্যাত নিওফ্রয়েডীয়ান। সামন্ততন্ত্রের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম সে স্বাধীনতার অনেকখানিই আজ negative freedom। এ-মুক্তির অস্তিবাচক দিক যে একেবারে ছিল না, তা নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে প্রকৃতির উপর আধিপত্য অনেকখানি বেড়েছিল, সমাজবাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি, ব্যক্তি-উদ্যম স্ফূর্ত হয়েছিল। কিন্তু আজ মনোপলির যুগে ব্যক্তিউদ্যমের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত, উৎসাহ স্তিমিত। "Monopoly capitalism is viewed as a colossal Frankenstein monster in the face of which all non-monopoly elements of the population are frightened, cowed and reduced to insignificance and more devastatingly to means to the end of accumulation of profits"

(H. K. Wells)। পুঁজিতান্ত্রিক স্বাধীনতার অস্তিবাচক চরিত্র আজকের সমাজে একচ্ছত্র পুঁজির দাপটে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। অক্ষমতা ও নৈরাশ্যবোধে জনচিত্ত পীড়িত। ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন।

পুঁজিবাদী সমাজের পণ্যপূজা, শ্রম থেকে, উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে শ্রমিকের ক্রমবিযুক্তি—বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে মার্কস-বর্ণিত "fetishism of commodities" ও "alienation of labour" তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে নয়া-ফ্রয়েডবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কসবাদীদের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ, বিপ্লবী ভাবধারা হিসেবে প্রতিভাত। শুধু অর্থ-নৈতিক নয়, আন্তর্মানবিক সব সম্পর্কই বিচ্ছিন্ন। "Instead of relations between human beings, they assume the relation between things ...... Man does not sell commodities, he sells himself and feels himself a commodity ...... As with other commodities, it is the market which decides the value of these human qualities, ...even their existences" (Fromm)। পরে কিন্তু নয়াফ্রয়েডবাদের প্রবক্তরা পুঁজিবাদী সমাজের নেতিবাচক দিকটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন; এবং বলেন, অসহ্য যন্ত্রনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতির আশায় ব্যক্তিমানস এই একচ্ছত্র পুঁজিবাদী যুগে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ ও মুক্তিকে সরাসরি অস্বীকার করেছে। ভয়, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তা ক্রমশ মানসিক সক্রিয়তাকে অসাড় করে দিয়েছে। তার সামনে দুটো পথ খোলা :—"They must try to escape from freedom altogether or they can progress from negative to positive freedom"। হয় পলায়ন, না হয় সদর্থক দিকটির সক্রিয় সংগঠন। শেষের পন্থা গ্রহণ এই সমাজে ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, তাই সে যুক্তিগ্রাহ্য সক্রিয় সংগঠনের পক্ষ ত্যাগ করে অযৌক্তিক বাধ্যকারী নির্জ্ঞান শক্তির শিকার হয়েছে। মানুষকে 'rational being' পরিকল্পনা করা ভুল। অনেকদিন আগে ফ্রয়েড যে কথা বলেছিলেন, নয়া ফ্রয়েডিয়ানরাও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। অবশ্য সহজাত প্রবৃত্তিকে, লিবিডোকে অযৌক্তিক নির্জ্ঞান বাধ্যকারী একমাত্র শক্তি হিসেবে কল্পনা না করে, পুঁজিবাদী সমাজের অনিয়ন্ত্রনীয় ব্যবস্থাকে কিছু গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজতন্ত্র বা সোশালিজম ছাড়া বিচ্ছিন্নতার বিলোপ ঘটবে না, একথা ঠিক; কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থাকে শ্রমিকায়ত্ত

করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এ দলের প্রধান প্রবক্তা এরিক ফ্রম লিখেছেন, "Marx had underestimated the complexity of human passions. He did not sufficiently see the passions and strivings which are rooted in his main nature and in the conditions of his existence and which are in themselves the most powerful driving force for human development ... He did not recognise the irrational forces in man which make him afraid of freedom and which produce his lust for power and his destructiveness"। এঁদের মতে শ্রমিকশ্রেণীর সততায় বা সক্রিয় বিপ্লবী মনোভাবে বিশ্বাস রাখা চলে না। কেননা তারাও এই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতই চিন্তা-ভাবনা কাজে-কর্মে বাধ্যকারী নির্জ্ঞান শক্তির দ্বারা পরিচালিত, তারাও বিচ্ছিন্ন। "The socialisation of the means of production would only substitute one compulsively motivated class for another, the working class for the capitalist class"। যাদের মানসিক পরিবর্তন, চারিত্রিক উন্নয়ন ঘটেনি, তাদের নেতৃত্বে সুস্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্ভব নয়। এই অসুস্থ সমাজের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি শ্রেণীই বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত, নিউরোটিক, এদের উপর আস্থা রাখা চলে না। মার্কস মানুষের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গঠনের ও বিচ্ছিন্নতার বিলোপের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এঁদের মতে "Marx maintained an oversimplified, overoptimistic, rationalistic picture of man"। পরিবেশ পরিবর্তিত হলে মানসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে;—নয়া ফ্রয়েডবাদ একথা অস্বীকার করে। মানুষ মাত্রেই নির্জ্ঞান আবেগের দাস; বুদ্ধি ও যুক্তিদ্বারা পরিচালিত নয়। বিচ্ছিন্নতা-বিশ্লেষণে এই "সংস্কৃত মনোসমীক্ষাবাদ" সহজাত-প্রবৃত্তিবাদের নবসংস্করণ, অবিমিশ্র ভাববাদের অভিব্যক্তি।

নয়া ফ্রয়েডীয় প্রকল্প অনুসারে মানুষ মাত্রেই প্রক্ষোভ-তাড়িত জীব। নির্জ্ঞান মনের গোপন গহ্বরে লালিত যুক্তিহীন প্রক্ষোভ (emotion) মানুষের সংজ্ঞান মনকে পরিচালিত করে। প্রক্ষোভ অহং-প্রতিরক্ষাকারী। অতি শৈশবেই বৈরী পরিবেশের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে প্রক্ষোভের বৃদ্ধি। নির্জ্ঞান-স্তরের

অদম্য এই শক্তি ধ্যানধারণা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আচার-ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক। প্রক্ষোভ বাস্তব-পরিবেশের প্রতিফলন নয়,—বাস্তব-পরিবেশের প্রতিক্রিয়াপুষ্ট অন্ধ প্রতিরক্ষা প্রবৃত্তি। প্রক্ষোভতাড়িত জীব—এই বিশ শতকের মানুষের কাছে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা অর্থহীন। যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা, সংজ্ঞান মনের কোনো প্রক্রিয়াই এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। সুস্থ চিন্তা-ভাবনা মনোপলী পুঁজির সমাজব্যবস্থায় কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ সমাজ রুগ্ন; এ সমাজের প্রতিটি মানুষই সমাজ-বিচ্ছিন্ন এবং অসুস্থ। এই সমাজসংশ্লিষ্ট মানুষের পক্ষে এ অবস্থা পরিবর্তনের আশা আকাশকুসুম মাত্র।

ধনতান্ত্রিক যন্ত্রযুগের বিশেষ উৎপাদন-প্রণালী ও শোষণব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দুস্তর অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তি মাত্রেই বিচ্ছিন্নতার ফলে অটোমেটনে পরিণত হয়েছে এবং প্রক্ষোভ-প্রবাহে ভেসে চলেছে। বিচ্ছিন্নতা নির্জ্ঞান মনের যুক্তিহীন বাধ্যকারী প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, আবার এই প্রবণতা মানুষকে আরও বিচ্ছিন্ন করছে। এখন বিচার্য, ধনতান্ত্রিক সমাজের এই সর্ববিধ্বংসী বিচ্ছিন্নকারী চিত্র এবং সব মানুষই নির্জ্ঞান-প্রভাবিত, বিচারবুদ্ধিহীন, বাধ্যকারী প্রক্ষোভ-পরিচালিত, কাজেই বিচ্ছিন্নতা বিরোধে অক্ষম;—এই প্রকল্প বিজ্ঞানসম্মত কিনা?

আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এই সর্বাত্মক নেতিবাচক প্রকল্প স্বতঃপ্রমাণিত সত্য, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক অতি সহজেই যে এই প্রকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। "Unorganised, alone, and defenseless, crushed between the two giant antagonists and thoroughly confused by an endless maze of conflicting factors, contemporary society of middleclass must indeed appear to defy reason and to destroy all things human",—একজন আমেরিকান দার্শনিকের এ উক্তিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু এই প্রকল্প সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে গঠিত। মানবিক ও অমানবিক সামাজিক সত্তার সংঘর্ষকে অস্বীকার করে এই প্রকল্প। পরিবেশের ধ্বংসকারী প্রবণতাকে অতি গুরুত্ব দেওয়া দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। সামাজিক

ও ব্যক্তিমনের ঘাত-প্রতিঘাতকে বিচার বিশ্লেষণ না করে ধ্বংসাত্মক শক্তিকে অপ্রতিরোধ্য বা একমাত্র শক্তি মনে করা পরাজিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক বিচারে বরং এই কথাই মনে হবে যে আজ সমাজে দ্বন্দ্ববিরোধ তুঙ্গে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে মানুষের সৃজনীশক্তি আজ উচ্চতম শীর্ষে, অসীম তার সম্ভাবনা, আবার অন্যদিকে ব্যক্তি-মালিকানার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে এই শক্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ, সম্ভাবনা গতিরুদ্ধ, বাস্তব রূপায়ণ বিঘ্নিত। নতুন শক্তিকে পুরণো ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠিত করার চেষ্টার ফলে তীব্র বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। 'কনটেণ্ট' এবং ফর্মে'র এই পরস্পর বিরোধিতার ক্রম-বর্ধমান তাপাঙ্ক আজ বিস্ফোরণ বিন্দুতে উঠেছে। এই পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব (contradiction) ব্যতিরেকে অগ্রগতি ঘটতে পারে না ; সব পরিবর্তন ও প্রগতির মূলে থাকে এই 'কনট্রাডিক্শন'। এই 'কনট্রাডিক্শন'-এর, এই পরস্পরবিরোধী শক্তির শুধু একদিকটিকে, পুরণো সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ী ভয়ংকর-তাকে উপলব্ধি করলে চলবে না ; অপর দিকটিরও মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্র পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। দ্বান্দ্বিক ন্যায়শাস্ত্রই পরিবর্তন ও প্রগতির সম্যক ব্যাখ্যা দিতে পারে। নয়া-ফ্রয়েডবাদ দ্বান্দ্বিক ন্যায়শাস্ত্রকে অস্বীকার করার ফলে মনোপলি-যুগের সর্বধ্বংসী দৈত্যকেই শুধু দেখছে, দৈত্যনিধনক্ষম শক্তির সন্ধান পায়নি। তার কাছে তাই পরিবর্তনের মূলসূত্র ধরা পড়ে না। ফলে "The world then appears irrational, unpredictable and uncontrollable, while the individual is doomed to live his life out in isolation, loneliness, ignorance, fear, anxiety and dread, with only immediate reactions of pleasure or pain to bear him up or weigh him down"—আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্যের এই উক্তি নয়া-ফ্রয়েডবাদের একদেশদর্শী ধারণার উদ্দেশ্যে। এই সমাজেই, তিনি বলেন, এই প্রকল্পের বিরোধী শক্তিরও সন্ধান মেলে। "Capitalism contains as a contradictory aspect of itself the potential human resources and ultimate power to transform society and build socialism and eventually communism"। বিচ্ছিন্নতার ক্রমনিরসনের উপায় এই সমাজের নতুন কনটেণ্টের উপযোগী করে ফর্মের

বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত। পূর্ব-নির্দেশিত পন্থা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের পন্থা, ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল; সামাজিক পরিবর্তনে অনেকটা নিরপেক্ষ। মানুষকে মানবিক করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সমাজের সদর্থক শক্তির বিকাশের উপর, সামাজিক বিপ্লবের উপর প্রধানত আস্থা রাখে। "The contrast is sharp between Fromm's latter-day utopian socialism based on wishes and individual regeneration and scientific socialism based on the ontological structure of social change reflected in the logical structure of the social sciences"। নয়াফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ভাববাদী দর্শনপুষ্ট অবাস্তব তত্ত্ব, উদ্দেশ্য—সমাজ বাস্তবের দ্বন্দ্ব বিরোধিতা কুয়াশাচ্ছন্ন করা। সবকিছুকে অযৌক্তিক বাধ্যকারী নির্জ্ঞানশক্তির অধীন কল্পনা করার অর্থ অদৃষ্টবাদকে পুনরুজ্জীবিত করা। 'সংস্কৃত মনসমীক্ষার' প্রকল্প অনুসারে জন্ম থেকে, ব্যক্তিমাত্রেই বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন বোধ করে এবং আত্মরক্ষার্থে আত্মপ্রতারণাকারী আত্মসংবেশক প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়ার এক প্যাটার্ণ গড়ে তোলে। এই ভাবে বৈরী সমাজের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলার ও বিপক্ষ শক্তিকে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা চলে। 'অহং-প্রতিরক্ষক' এই প্রক্ষোভ-প্যাটার্ণ শৈশবেই মানসিকতার বিশিষ্ট রূপ গড়ে তোলে। দাম্ভিক অত্যাচারী পিতার প্রতিটি আদেশ তালিম করে শিশুকে যদি চলতে হয়, তবে তার 'ইগো' বা সত্তা নিপীড়িত বোধ করবে। ইগোকে পীড়ন থেকে রক্ষা করবার জন্য 'আত্মপ্রতারণাকারী ও আত্মসংবেশক' এই ইমোশনাল প্যাটার্ণ গড়ে তোলে শিশু। হয় সে 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম' ইত্যাদি আউড়ে নিজেকে সম্মোহিত করে একান্ত বশংবদ "গোপাল এর মত ভালো ছেলেতে পরিণত হয়, অথবা অবাধ্য দুর্বিনীত 'ভুবন' হয়ে মাসীর তথা সমাজের গুরুস্থানীয় সকলকেই আঘাত করতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এরাই হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে সভ্য-শিষ্ট আইন শৃঙ্খলার অনুরক্ত কনফর্মিষ্ট নাগরিক, অথবা অসহিষ্ণু, প্রতিবাদমুখর, নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহী। একদল হয়ে দাঁড়ায় মর্ষকামী, আর একদল ধর্ষকামী ;—masochist আর sadist। যুক্তিবাদী সৃজনশীল মানবিকবৃত্তির অধিকারী মানুষের পরিবর্তে আমরা পাই যুক্তিহীন, বাধ্যকারী, নির্জ্ঞান প্রক্ষোভ বাহিত অটোমেটন।

কিয়ের্কেগার্ড, রিলকে, নিৎসে, কাফকা, কামু, টেনেসী উইলিয়ামস্ থেকে

অতি আধুনিক সাহিত্যিক দার্শনিকের কণ্ঠে এই নয়া-ফ্রয়েডীয় প্রকল্পের প্রতিধ্বনি শুনি। হাক্স্‌লী, অরওয়েল যে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার ছবি এঁকেছিলেন, পাকার্ডের আধুনিকতম গ্রন্থ "দি নেকেড সোসাইটিতে" যে ছবি ফুটে উঠেছে; তা দিয়ে এই প্রকল্প প্রমাণিত হচ্ছে না কি? অন্তত আমেরিকার সমাজ যে স্পষ্টত রবট প্রবণতা-পুষ্ট এ কথা কে অস্বীকার করবে? আরো বলা চলে, আমেরিকান 'ওয়ে অফ লাইফ' অর্ধোন্নত, অনুন্নত এমন কি কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংবাদপত্রের পাঠকদের কাছে মতামত চাইলে, নিশ্চয়ই বিপুল সংখ্যাধিক্যে ফ্রয়েডীয় এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হবে। সব দেশ সম্পর্কেই আজ মোটামুটি একথা বলা চলে যে, কয়েকজন ধর্ষকামী ব্যক্তি বিভিন্ন কৌশলে লক্ষ লক্ষ মর্ষকামী বিচ্ছিন্ন অটোমেটনকে খেয়ালখুশীমত পরিচালিত করছে। ধর্ষকামী ব্যক্তিদের এক গোষ্ঠী শাসন ও শোষণযন্ত্র অধিকার করে সেই অধিকারকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস করছে; অপরদল ঐ যন্ত্র অধিকারের চেষ্টায় বিপ্লবের শ্লোগান দিচ্ছে। সমাজের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হচ্ছে লক্ষ কোটি ইতরজন: মর্ষকামী অটোমেটন। এরা সকলেই কিন্তু অযৌক্তিক বাধ্যকারী নির্জ্ঞান-প্রসূত প্রক্ষোভের দাস। নেতা ও জনতা একই রোগে ভুগছে।

এই প্রতীতব্যাপার বা ফেনোমেনন নিঃসন্দেহে সঠিক। কিন্তু এদিয়ে ফ্রয়েডীয় প্রকল্প প্রমাণিত হয় না। ভোটগ্রাহ্য আপাত-সত্য আর বৈজ্ঞানিক সত্য এক নয়। "Science does not proceed in this phenomenal, pragmatic, positivist fashion. The truth of a theory depends on its ability to account for all the facts by the least complex set of principles." শুধু তাই নয়, ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেই শুধু চলবে না; ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য এমন কোন পদ্ধতির ইংগিত দিতে হবে তত্ত্বকারককে, যে তত্ত্বের প্রয়োগ করে ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। মানব সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ জন্মায়, বর্তমানকে হতাশাপীড়িত করে যদি কোন সামাজিক তত্ত্ব—তবে সে তত্ত্বকে সুস্থ মানুষ মাত্রেই অগ্রাহ্য করবে। এরিক ফ্রম বা কলিন উইলসন মানুষের মুক্তির জন্য, বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতা রোধের জন্য, মানবতার পুনরাবির্ভাবের জন্য, ফেলে আসা যুগে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

'ইষ্টান্ মিষ্টিক' বা 'জেন-বুদ্ধিষ্ট' এর শরণাপন্ন হতে উপদেশ দিয়েছেন। যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদকে পরিহার করতে বলেছেন এবং প্রকারান্তরে এঁদের সকলেই প্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মোহ থেকে মুক্ত হতে বলেছেন।

পুঁজিবাদী সমাজের অস্তিবাচক অবদানগুলির সঠিক ও যৌক্তিক প্রয়োগেই শুধুমাত্র প্রকৃতি ও সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যায়। উৎপাদনশক্তিকে তার পুরণো আধার ও প্রয়োগব্যবস্থা থেকে মুক্ত করেই শুধু সেই মুক্তধারার মধ্যে ঐকতান ও সমন্বয়ের সঙ্গীত শোনা যেতে পারে। পরিবেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সার্বিক মানসিকতার পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। প্রতিটি ব্যক্তিকে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসপদ্ধতিতে অথবা ধর্মীয় পরিশোধন পদ্ধতিতে নির্জ্ঞান অবহিত করানোর পর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা দিবাস্বপ্নের মতই অলীক। নয়াফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে থাকেন চৈতন্যের ক্রমবিকাশ সম্ভাবনায় ও প্রতিফলনতত্ত্বে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা।

প্রক্ষোভ সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় ধারণা অবৈজ্ঞানিক। মস্তিষ্কবিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। মস্তিষ্কের উপর পরিবেশের প্রতিফলন থেকে মানসিকতার জন্ম। নির্জ্ঞান মনের অপ্রতিরোধ্য প্রক্ষোভ থেকে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ইত্যাদি মনের বৃত্তিগুলোর উদ্ভব—এ ধারণা বিজ্ঞান-সমর্থিত নয়। 'ইনটেলেক্ট ও আইডিয়া' 'ইমোশনের' অধীন বা একান্ত-ভাবে 'ইমোশননির্ভর'—এই ফ্রয়েডীয় প্রকল্প মানবচৈতন্যের অপমানসূচক, মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান-অস্বীকৃত। যুক্তিবুদ্ধি (idea) ও প্রক্ষোভ (emotion) পরস্পর নিরপেক্ষ এবং মনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠিত—এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রতিফলনতত্ত্ব অনুসারে 'আইডিয়া' ও 'ইমোশন' ব্যক্তিচৈতন্যের দুই মৌলিক অবিচ্ছেদ্য ধারা; অবিচ্ছেদ্য অথচ বিপরীতমুখী। প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া যুক্তিবুদ্ধির জনক ত' নয়ই, বরং যুক্তিবুদ্ধির তারতম্য দ্বারা প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত। সাময়িক ভাবে পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী যুক্তিবুদ্ধিকে নিস্তেজ করে প্রক্ষোভের প্রাবল্য এনে মানুষকে বিকারগ্রস্ত আবেশজ করে তোলা যায়; কিন্তু সাময়িক উন্মাদনা কেটে যাবার পরমুহূর্তেই প্রক্ষোভ-প্রক্রিয়া যুক্তিবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীনে ফিরে আসে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষকে যুক্তিবুদ্ধিরহিত করে প্রক্ষোভ-তাড়িত রবটে পরিণত করার হাজার রকম পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, এমন কি আমেরিকার সমাজেও সকলেই যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, সম্মোহিত, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন,

সমাজবিযুক্ত অটোমেটন নয়। যুক্তিহীন, বাধ্যকারী, প্রক্ষোভের সর্বজনীনতা ওদেশেও প্রযোজ্য নয়। সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতার ফ্রয়েডীয় প্রকল্প শুধুমাত্র কল্পনা। বিজ্ঞানী লাইনাস পলিং, নাট্যকার আর্থার মিলার, বার্তাজীবী হ্যালিসব্যারী, স্বয়ং এরিক ফ্রম—এঁদের দৃষ্টান্ত দিয়েই বলা চলে সব মানুষ যুক্তিহীন নির্জ্ঞান মনের ক্রীতদাস নয়। আমেরিকার মানুষ মাত্রেই হয় কনফর্মিষ্ট, না হয় নন্‌-কনফর্মিষ্ট বিদ্রোহী—এ কথাও ঠিক নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে এখনও প্রকাশ, প্রসারণ, সৃজন, ও উৎপাদনসক্ষম। আমেরিকার মনোপলি ক্যাপিটালের মানবতাবিধ্বংসী ক্ষমতা অসীম নিঃসন্দেহ, তা সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত আমেরিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় নব্বই জন সুস্থ-মানসিকতার অধিকারী বলে স্বীকৃত। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মনোপলির সেবক ; কিন্তু কোন বাধ্যকারী নির্জ্ঞান শক্তির প্রভাবে নয়, সজ্ঞানে নিজের যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী। জীবিকার্জনের জন্য অথবা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে শয়তানের সেবা করা আর নির্জ্ঞান পরিচালিত অটোমেটন হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। মনোবিকারগ্রস্তের বাধ্যকারী আচরণ, (compulsive behaviour) বেশির ভাগই চিকিৎসা অসাধ্য। এদের মানসিক পরিবর্তনের জন্য তাই এরিক ফ্রম 'Zen-Buddhism' এর শরণাপন্ন হতে বলেছেন। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতার জন্য, জীবিকার্জন বা প্রাণরক্ষার জন্য, নিরুপায়ের মনোপলি সমর্থনের প্রতিকার আছে ; সে ব্যাধি দুরারোগ্য নয়।

বিচ্ছিন্নতার প্রতিকারকল্পে, তাদের চৈতন্যের কাছে, বুদ্ধি বিবেচনার কাছে আবেদন সম্ভব। তাদের হীনমন্যতা, উপায়হীনতা, মস্তিষ্কগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে দূর করা যায়। সমবেত প্রচেষ্টায় গণবিপ্লবের মাধ্যমে বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলা যায়,—ইতিহাসের নজির দিয়ে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করা চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঠিক প্রয়োগে সুপরিকল্পিত এমন সুষম মানবসমাজ গড়া যায়, যেখানে বিচ্ছিন্নতার বিষবৃক্ষ ও আনুষঙ্গিক বৃত্তিগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করা যাবে :—এ আশা আর মরীচিকা-ছলনা নয়। সমাজে শুধু আঘাতের অভিজ্ঞতা নেই, প্রতিঘাতের দৃষ্টান্তও আছে।—"Where reformed analysis views society as a source of traumatic experience—the primary effect of which is to induce unconscious ego-defences, the reflection theory regards society as a source of human experience—the primary effect of which is to induce the

mental qualities characteristic of men's conscious life" (Wells)। ভাববাদী নয়াফ্রয়েডতত্ত্ব মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে, আত্মভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে, পরিকল্পনানুযায়ী সমানাধিকার-ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করে। হতাশা ও নৈরাশ্যের কুয়াশা সৃষ্টি দ্বারা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে আরো তীব্র করে তোলে। ইতিহাসের গতিকে ও সমাজবিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে। মানুষের মনে যে মনোভাব নিয়ে আসে তাকে বলা চলে দুঃখবাদ বা 'Misery syndrome'।

ভাববাদী মনস্তত্ত্বের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিকোণের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত যান্ত্রিক জড়বাদের অতি আশাব্যঞ্জক কল্পনা। একে বলা হয় 'Pollyana Syndrome'। এ চিত্র সবটাই উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য। হতাশা বা বিষণ্ণতায় কোনো-দিন ভোগেন না এই সব 'Pollyana Syndrome' আক্রান্ত মানুষ। যা কিছু ঘটছে মঙ্গলের জন্যই ঘটছে; ইতিহাস নিজের গতিবেগে অভীষ্ট লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে; যতটা ভাঙছে, তার থেকে অনেক বেশি গড়ে উঠছে; মনে করেন শেষোক্তরা। 'মিজারী সিনড্রোম' আবিষ্ট মানুষ সমাজের নেতিবাচক রূপটিকে অতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করেন। আর 'পলিয়ানা সিনড্রোমের' মানুষ একপেশে অস্তিবাচক রূপটিকে শুধু চোখের সামনে তুলে ধরেন বলে বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধে নিজের সক্রিয় ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়ে, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তিকে সহায়তা করেন। একদল সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবকে এড়িয়ে মানসিক পরিবর্তন ও মানসিক বিপ্লব ঘটাতে চান। আর অন্যদল অবশ্যম্ভাবী সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবকেই শুধু আবাহন করে তৃপ্ত। এঁরা মনে করেন সামাজিক বিপ্লবের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটবে, আর সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে সংঘটিত হবে মানসিক পরিবর্তন। বিচ্ছিন্নতার বিলোপ ঘটবে স্বতঃপ্রণোদিত নিজস্ব নিয়মে। ভাববাদী বিপ্লবভীরু চিন্তাবিদেরা মনে করেন মানসিক পরিবর্তন আপনা থেকে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে এসে বিচ্ছিন্নতা দূর করবে। আর জড়বাদী অতিবিপ্লবীরা মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন আপনা থেকে মানসিক পরিবর্তন ঘটাবে, বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হবে, মানবিক গুণের উন্মেষ ঘটবে নিজস্ব নিয়মে। আজকের বিচ্ছিন্নতা ও সংশ্লিষ্ট মানসিক বিপর্যয় নিয়ে এঁরা চিন্তা করতেও চান না। ভাববাদী মনোবিজ্ঞানীরা পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের চিত্রকে ভয়াবহ করে

আঁকেন ; বলেন অবক্ষয়ের দূষিত ভাইরাস সমাজের প্রতিটি স্তরে পচন ধরিয়েছে, গোটা সমাজটাই বিষাক্ত—সমাজের বাইরে পালিয়ে গিয়ে কোনো মঠে বা আশ্রমে বসে শুচিশুদ্ধ হতে হবে। আর জড়বাদীরা মনে করেন, বিপ্লবের আগুনে পুড়ে সব কিছু খাঁটি হবে, সব কিছু শুদ্ধ হবে, বিপ্লবের অনির্বাণ হোমানলে অবিরত আহুতি জোগানোই তাঁদের একমাত্র কাজ। এ-সমাজের সব কিছুই পরিত্যজ্য, সব কিছুই আবিল জঞ্জাল,—এই এক জায়গায় এই দুদলই একমত। তফাৎ এই যে, 'মিজারী সিনড্রোমের' রোগীরা এই অক্টোপাসী সমাজব্যবস্থাকে, এর ভয়ংকরতাকে অজেয় মনে করেন ও বিচ্ছিন্নতাকে মনে করেন চিরস্থায়ী ; আর 'পলিয়ানা সিনড্রোমে' আচ্ছন্ন মানুষ মনে করেন, এই মনোপলি-শোষিত সমাজ অবক্ষয়ের চরমে পৌছেছে, এর সব শক্তিই নিঃশেষিত, ধাক্কা দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হবে নতুন সুস্থ সমাজের বিশাল বনিয়াদ : বিচ্ছিন্নতা বা বিকার যদি কিছু থাকেই, তা ক্ষণস্থায়ী। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছানো মানেই সব সমস্যার মীমাংসা।

তাই কি ? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তির অস্তিত্ব-বিচ্ছিন্নতা সমস্যা কি সমাধান হয়ে গেছে ? ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব বিরোধের কি অবসান ঘটেছে সমাজতন্ত্রে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ? অতি বড় সমাজতন্ত্রদরদীও একথা বলতে চাইবেন না। নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার উন্নয়ন সমস্যাও বেশ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতা বিলোপের পরিবেশ তৈরী হলেই বিচ্ছিন্নতার বিলোপ ঘটেনা। মানসিকতার পরিবর্তন একটা যান্ত্রিক সরল প্রক্রিয়া নয়। জটিল দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলে এই পরিবর্তন। শিক্ষাদানের জন্য যেমন চাই স্কুল-কলেজ ছাড়াও প্রশিক্ষণ বিদ্যার উন্নতি, তেমনি মনের উন্নতির জন্য, মানবিকবৃত্তির উন্মেষের জন্য নতুন সমাজের শোষণহীন পরিবেশই যথেষ্ট নয় ; প্রয়োজন নতুন মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও তার প্রয়োগনৈপুণ্য। কেননা, বিপ্লবোত্তর সমাজেও পরস্পরবিরোধী ভাবধারা বা মানসিক বৃত্তির অস্তিত্ব থাকে, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব থাকে, মানবমনে অনেক হেয় অমানবিক বৃত্তির গোপন অবস্থিতি থাকে। তবে সমস্যার সমাধান এই সমাজে সন্দেহাতীত সম্ভাব্যের পর্যায়ে পড়ে তাছাড়া মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকে যা বিচ্ছিন্নতা-নিরসনের অন্তরায়। আরো উন্নততর সমাজবিন্যাসে সে সব

ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে বিশ্বাস করি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য এই 'মিজারী' ও 'পলিয়ানা' দুই সিনড্রোমকে এড়িয়ে চলা :—এর দৃষ্টিভংগী আলাদা।

প্রতিফলন তত্ত্বে বিশ্বাসী মনস্তাত্ত্বিকরা জানেন যে মস্তিষ্কে বহির্বিশ্ব যান্ত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। মন সমাজবাস্তবের ফটোগ্রাফ নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পূর্বশর্তানুযায়ী বাইরের উদ্দীপক মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। এই সমাজের মানবতাবিধ্বংসী উদ্দীপকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বেশি পরিচয়। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে বিচ্ছিন্নতার অনুধাবন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তারা সমাজের বীভৎস রূপটিই প্রথমে দেখতে পায়; তা বলেই সমাজের অন্য দিকের অস্তিত্ব লোপ পায় না। চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তোলবার আগেও উল্টো পিঠের অস্তিত্ব ছিল। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবেশের অভিজ্ঞতার প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান সমাজের অস্তিবাচক, গঠনমূলক দিকটিরও সন্ধান রাখে, বিশ্লেষণের ব্যাপারে একদেশদুষ্ট নয়। মানবসমাজের ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনকে, ইতিহাসকে কে অস্বীকার করতে পারে? আবার একথাও সত্যি যে, আজকের সমাজের বেশ কিছু মানুষ জমি থেকে, উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপাদান থেকে, এমনকি পৃথিবী থেকেই বিচ্ছিন্ন। যেমন শ্রেণীবিচ্ছিন্নতা অনস্বীকার্য, তেমনি ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাও সত্যি। আজ নরনারী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। সর্বোপরি মানুষ নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। "Man is alienated from himself, his aspiration separated from reality, his ideals from actuality, his life from creativity, direction and meaning" কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতার সার্বজনীনতা;—এক শ্রেণীর সাহিত্যিক দার্শনিকের ভয়ার্ত চীৎকার সত্ত্বেও—স্বীকার করা যায় কি? আগেই বলেছি, সুস্থ মানবিক বৃত্তি বিলুপ্ত হয়নি; নতুন ভাবে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানের মতে বিচ্ছিন্নতাবোধ মানবমনে প্রতিকার-সম্ভব বৃত্তি ও উপায়ের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এ নির্দেশ আসে সমাজের অন্তর্নিহিত ভাবধারা থেকে, এ শক্তি সমাজের মধ্যেই থাকে। সেই শক্তিকে চেনা, জানা, বর্ধিত করা ও বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বকে সজ্ঞানে ও সক্রিয়ভাবে বিস্ফোরণ বিন্দুতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আজকের মানুষের আশু ও অবশ্যকর্তব্য। সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব নেই, সবই ধ্বংসাত্মক,—এই উদ্দেশ্যমূলক অবৈজ্ঞানিক প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিটি সৎ সমাজতাত্ত্বিকেরই প্রতিবাদ

জানানো উচিত। "The other side, the one that carries forward the positive progress of man, is a combination of the control over nature through production and the knowledge of nature including man, embodied in technology, the arts and sciences"। সংযুক্তি বিষয়ক উপাদান ও শক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও অনেক আছে, যা নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। তাছাড়া ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলেই বা আমরা কি দেখতে পাই? আমরা আদিম সমাজের অভাব অনটনের স্তর পার হয়ে এসেছি; ধনতান্ত্রিক সমাজের আপেক্ষিক অভাবের স্তরে বাস করছি। আগামী দিনের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা আমাদের কাছে আজ উপলব্ধ সত্য। "Man has thus made great progress in overcoming his alienation from the necessities of life, from food, clothing and shelter. He has likewise made giant strides in overcoming his alienation from health, from knowledge and from beauty. But positively, he has developed tremendously his ability to produce, to control nature, to change the environment to meet his needs; to create works of art and architecture, to shrink space by vehicular travel and to know the world and himself through science."†

অস্তিবাচক ও নেতিবাচক, আধুনিক সমাজের এই দুই ছবি যদি চোখের সামনে না থাকে, আমরা বিচ্ছিন্নতাবিলোপের পন্থানির্ধারণে ভুল করব। হয় ফ্রয়েডবাদীদের মত নেতিবাচক ছবিকে একমাত্র সত্য মনে করে বিচ্ছিন্নতানিরসন ও মানবিকতা উন্মেষের জন্য ধর্মমন্দিরে আশ্রয় নেব। অথবা জড়বাদীদের মত বিচ্ছিন্নতা ও অমানবিকতা শুধু শোষকশ্রেণীর অথবা বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা, শ্রমিকশ্রেণীর নয়, মনে করে, শুধু আর্থ-রাজনৈতিক বিপ্লবকেই প্রাধান্য দেব; মানবমনকে অগ্রাহ্য করব। প্রথম পথে গেলে ব্যক্তির উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করা হবে, আর দ্বিতীয় পথে গেলে ব্যক্তিকে সমষ্টির একটা জড় অঙ্গ মনে করা হবে। প্রথমদলের প্রতি আমাদের বক্তব্য: পশুত্বের স্তর পার হওয়ার ফলেই মানুষ

† উদ্ধৃতিগুলির জন্য হ্যারি. কে. ওয়েলসের কাছে ঋণী।

বিচ্ছিন্ন হয় না, মানুষের বিচ্ছিন্নতা এক বিশেষ ঐতিহাসিক যোজনা, বিশেষ স্থানকাল-নির্ভর এই বিচ্ছিন্নতা। আজকের গভীরতা ও ব্যাপকতা ইতিহাসের বিশেষ কালের বিশেষ কতকগুলি ঘটনা-প্রসূত। বিচ্ছিন্নতা যেমন সর্বজনীন নয়, তেমনি সর্বকালের নয়। আর দ্বিতীয় দলকে বলব: সমাজতন্ত্র গড়া মানে পুরণো সমাজের সব কিছুকে অগ্রাহ্য করা নয়। অসুস্থ উপাদানগুলোকে পরিহার করে পুরণো দিনের সুস্থ উপাদানগুলোকে গ্রহণ করতেই হবে। "হয় ভালো, নয় মন্দ; হয় শত্রু নয় মিত্র"—এই বিচার যান্ত্রিক জড়বাদের, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নয়। যান্ত্রিক জড়বাদ উনিশ শতকেই তার কার্যকারিতা হারিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থন নেই। আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি, আবার অবিচ্ছিন্ন থাকার জন্য নতুন সংযোগ সূত্রের সন্ধান করছি—এই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের সত্য। সাধারণ মানুষ যত বেশি বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, ততই বিচ্ছিন্নতাবিলোপের বিজ্ঞানসম্মত পন্থানির্ধারণের উপায় তারা দেখতে পাবে।

মনোবিজ্ঞানের মতে, মানুষ যেমন অন্যের সঙ্গে অন্বিত হতে চায়, তেমনি আবার বিযুক্ত হয়ে আত্মসত্তার মধ্যে ডুবে যেতেও চায়। ধনতন্ত্রের প্রথমদিকের ইতিহাস ব্যক্তিকে সামন্ত-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ইতিহাস, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্মোপলব্ধির উন্মেষের ইতিহাস। আবার, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা-গভীরতার ইতিহাসও এই সময় থেকে আরম্ভ বলা চলে। কয়েকশ' বছরের চেষ্টার ফলে মানুষ বৈষয়িক উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। বিজ্ঞান আজ মানবমস্তিষ্ককে কয়েক হাজার গুণ ও তার পেশীকে কয়েক লক্ষ গুণ শক্তিশালী করেছে। তার এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়েছে। ব্যক্তি বিরাট হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তীব্র হয়েছে। আবার অন্যদিকে সহযোগিতা-ভিত্তিক উৎপাদনের মধ্যে সে নতুন সংযুক্তির সম্ভাবনা দেখেছে, সাহিত্য-শিল্প-দর্শনের মাধ্যমে সে বিচ্ছিন্নতা নিরসনের প্রয়াস পেয়েছে। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা যতই তীব্র হোক, ব্যক্তিমানুষ কোনোদিনই ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ চাইবে না। আগেরদিনের গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পর্ক পুনরাবর্তিত হোক, এ তার বাঞ্ছনীয় নয়। আগামীদিনের সমাজতন্ত্র ও আরও ভবিষ্যতের সাম্যতন্ত্র (communism)-এর যুগে, শ্রেণীহীন সমাজে মানুষ পরস্পর-অন্বিত হবে, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক অনেকখানি বিকশিত উঁচুস্তরে উঠবে, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লোপ পাবে না। ব্যক্তিত্ব আরও বেশি বিকশিত হবে, কিন্তু

ব্যক্তিসত্তা সমন্বিত হবে। খণ্ডিত ব্যক্তিসত্তা 'Species being'-এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হবে। দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের এ-সম্ভাবনা হাক্সলী বা অরওয়েল অনুমান করতে পারেন নি। ফ্রম-উইলসনও পারছেন না। মানবসমাজের অগ্রগতি চিরদিনই যুক্তিবুদ্ধি পরিকল্পনানুযায়ী—মানুষই ঘটিয়েছে; সমাজতন্ত্রের উন্নয়নের পথও মানুষ নিজের সজ্ঞান মনের বৃত্তি—যথা ধ্যানধারণা, অনুভূতি আবেগ ও বুদ্ধিবিবেচনার যৌথচেষ্টায় নির্ণয় করবে।

বিচ্ছিন্নতা নিরসনের জন্য পৃথিবীর সব দেশেই আজ ব্যাপক চেষ্টা চলছে। এ-চেষ্টা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। এ চেষ্টা চলছে নানাভাবে। আনুষ্ঠানিক ও সাংগঠনিকভাবে এই চেষ্টা চলেছে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমস্বার্থ বা ভাবাদর্শবিশিষ্ট সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব দূর করার ব্যাপারে এ-প্রচেষ্টা অনেকখানি সফল। সংস্থাগুলি মাঝে মাঝে ভিন্নস্বার্থ বা বিপরীত আদর্শের সংঘাতের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লেও, মোটামুটি ব্যক্তি-মানুষের বিচ্ছিন্নতাবিরোধী দৃঢ় শিবির এদের বলা চলে। আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ বিযুক্তি জাতিসমূহের নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নানাবিধ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তির সাহায্যে অনেক পরিমাণে কম থাকছে। সারা পৃথিবী জুড়ে না হোক, অধিকাংশ দেশের দর্শন-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা সব সময়েই হতাশাব্যঞ্জক ও মানুষকে সংগ্রামবিমুখ করছে ভাবলে ভুল হবে। পুরণো সংস্কার, মৃত আচার অনুষ্ঠান, প্রচলিত মূল্যবোধ, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'angry generation' এর আক্রমণ; আনুগত্য বা conformism এর প্রতি বিটনিকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ যেমন বিচ্ছিন্নতার তীব্রতা ও ব্যাপ্তির প্রমাণ; তেমনি আবার কোনো কোনো স্থলে, হয়তো ভুল পথে, বিচ্ছিন্নতা বিলোপের ইংগিত ও সম্ভাবনাও এর মধ্যে নিহিত।

প্রগতি, প্রতিক্রিয়া দুই শিবিরই আজ বহুধা বিভক্ত। দলীয় উপদলীয় বিভাজন স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিবিদ্বেষ, ব্যক্তিবিযুক্তিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মনে হয়। ব্যক্তি বিদ্রোহ যেন আজ নিয়মে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রান্তিক্ষণে সবাই বিদ্রোহী, বিশেষ করে কিশোর তরুণের দল। কিন্তু এর একটা অস্তিবাচক দিকও আছে। ব্যক্তিত্ববিকাশ ও ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে এই ব্যক্তিবিদ্রোহের সূচনা। 'ম্যাস ম্যান' (Mass-man) হয়ে থাকতে কেউ রাজী নয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ চরমে পৌঁছেচে। পুরণো 'ফর্মের' মধ্যে নতুন 'কন্টেন্টকে'

এঁটে রাখা যাচ্ছে না। এরা উৎকেন্দ্রিক হয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু বারবুসের নায়কের মত হোটেলের ছোট ঘরের মধ্যে নিজেদের বন্দী করে রাখছে না। এরা অগণিত জনতার মধ্যে থেকেই বিদ্রোহ করছে, নতুন ফর্ম খুঁজছে আত্মপ্রকাশের ; নতুন বিন্যাস চাইছে সমাজের, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টি সমন্বিত হবে নতুনতম উপায়ে। কেন্দ্রতিগ ও কেন্দ্রাভিগ দুই বিপরীত শক্তির টানে এরা কখনও ক্রোধে ফেটে পড়ছে, কখনও বা মমতায় গলে পড়ছে। এদের এই 'হিস্টিরিক' ব্যবহার ঐকাত্ম্যস্থাপনেরই আকুল প্রচেষ্টা—বিযুক্তি-বিনাশের প্রলক্ষণ।

অনেকে বলছেন, বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র উন্নত দেশের সমস্যা, সমৃদ্ধ সমাজের (affluent society) সমস্যা। আমাদের দেশে এ নিয়ে এত তাত্ত্বিক আলোচনার বা সভাসমিতি ডাকবার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?

উত্তরে বলব,—প্রধানত উন্নত-সমৃদ্ধ সমাজের বিশেষ সমস্যা হলেও বর্তমানে এ-একটা সর্বদেশের সমস্যা, যদিও সর্বকালীন সমস্যা নয়। আলোচনার প্রয়োজন আছে ও থাকবে।

'আউটসাইডার' আমাদের সাহিত্যে বিরল হলেও, ব্যতিক্রম নয়। 'এ্যাবসট্রাক্ট' নাটক সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হচ্ছে, 'য়্যান্টিনভেল' রচনার প্রয়াস চলছে। বিমূর্ত শিল্প নিয়ে প্রবন্ধ ও একাধিক পত্রিকাও ছাপা হচ্ছে। কবিতায়, ছোট গল্পে, ব্যক্তিমনের রোগজনক (pathogenic) নিঃসঙ্গতায় অনেকদিন ধরেই সহৃদয় পাঠকমন সংক্রামিত। সমাজতাত্ত্বিকরা সাম্প্রতিক দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মূলে আর্থরাজনৈতিক কারণসঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার সন্ধান পেয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিকের ক্লিনিকে রোগীর ভিড় বাড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমাদের দেশের অবস্থা আলোচনা এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রতিফলনতত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীর কাছে অনন্বয় সমস্যা নিঃসন্দেহে যুগ-সমস্যা। তবে এ সমস্যা সমাধান-সাধ্য, যেমন এ সমাজ পরিবর্তন-সাধ্য। এ সমাধান, এ পরিবর্তনের সঠিক পন্থার নির্দেশ দিতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান।

৫

বিচ্ছিন্নতা-ভাবনার একদিক

বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞার্থ ও তাৎপর্য নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি সঠিক অর্থবহ হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন। ইংরিজি **'alienation'** বা **'estrangement'** বোঝাতে কোন কথাটি সঠিক অর্থবহ হবে, এনিয়ে বিস্তর বাদানুবাদ হয়েছে। 'বিযুক্তি', 'অনন্বয়' ইত্যাদি প্রতিকল্প শব্দের ব্যবহার অনেকে সুপারিশ করেছেন। আমাদের বিনীত বক্তব্য এই যে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি আমরা সঠিক অর্থবহ মনে করি। ১৯৬০ থেকে এটিকে আমরা এ্যালিয়েনেশনের বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করে আসছি এবং এর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় মনে করি না। অবশ্য লেখকেরা নিজের মনোমত প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে আমরা প্রতিবাদও করব না।

বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞার্থ কি হবে? সেটা নির্ভর করছে কোন দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতার বিচার বা আলোচনা হবে, তার উপর। আমাদের ধারণা বিচ্ছিন্নতা আর সমাজের কোনো বিশেষ স্তরে বা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়। তাই এ সমস্যা দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ—সকলশ্রেণীর সমাজকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব অনুধাবন করে

সমস্যার কারণ ও সমাধান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। কাজেই বিচ্ছিন্নতা স্থূল, সূক্ষ্ম, গভীর, অগভীর নানা স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে। অনেকের কাছে রাজনৈতিক বিরোধ, দেশ-ধর্ম-জাতি-বর্ণের প্রতিযোগিতা, শ্রেণীসংঘর্ষ ও সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষিত অশিক্ষিতের মানসিক গঠনের পার্থক্য,—মানুষে মানুষে বিভেদমাত্রেই বিচ্ছিন্নতারূপে প্রতিপাদিত। আমাদের আলোচনাসভাতে বিচ্ছিন্নতার নানা স্তর ও বিন্যাস প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের নানা সমস্যা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতার সঠিক সুসংজ্ঞার্থের মর্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলেও আমরা লাভবান হয়েছি। আমার বিশ্বাস সভার শ্রোতৃমণ্ডলীও আমাদের সঙ্গে একমত। দৈনিক পত্রিকাগুলির রিপোর্ট পড়েও তাই মনে হয়েছে।

এ সমস্যা সমাধানের কোনো ফর্মুলা আলোচনা-মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে কি? না। এ-জটিল ও গভীর সমস্যার সমাধানের উপায় যে খুব সহজে মিলবে, সে আশা আমরা পোষণ করি না। উৎপাদনের হাতিয়ার ও নিজস্ব শ্রম থেকে বঞ্চিত মানুষ সমাজতন্ত্রের জন্য আজ নানা ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগ ও exploitation of man by man বন্ধ; কিন্তু এর ফলে সেখানে বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে কি? বলা চলে, বিলোপের প্রাথমিক শর্ত স্থাপিত হয়েছে, বিচ্ছিন্নতা নিরসনের-ক্রিয়া চলছে, কিন্তু অভীষ্ট ফল এখনও অনায়ত্ত। সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ায় রাষ্ট্র আছে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা আছে, কাজেই বিচ্ছিন্নতা সেখানেও ভিন্নরূপে বিদ্যমান। একথা স্বীকার করার মধ্যে কোনো কুণ্ঠা বা লজ্জা থাকা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা রাতারাতি ইউটোপিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখতে চান না।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নতুন এক সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্ট হয়েছে; ক্ষমতা-গ্রাসী এই শ্রেণী জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসন ও ক্ষমতা পরিচালনা করছে। এই ধরনের প্রচারে অনেক সৎ মানুষ আজ বিভ্রান্ত। অনেকে বিশ্বাস করেন যে কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক ও জনসাধারণের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার ফাটল ক্রমশ অতলস্পর্শী বিরাট গহ্বরে পরিণত হয়েছে। সে গহ্বর আজ দুর্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রম্য। Djilas এর 'নিউ ক্লাশের' প্রাধান্য নাকি আজ শুধু যুগো-শ্লাভিয়াতে নয়, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত রাশিয়াতেও সুপ্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপোষিত ও অর্থপুষ্ট সোভিয়েতোলজিষ্টদের

পত্র-পত্রিকা আজ সর্বত্র সহজলভ্য। লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে আহৃত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে এঁদের বহুমূল্য গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান অকৃপণ ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলক প্রচার সম্বন্ধে সজাগ থাকা সত্ত্বেও, এই সব প্রচারের পরোক্ষ অভিভাবন অনেককেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে 'নিউ ক্লাশ' উদ্ভূত হয়েছে, ফলে ক্ষমতাগ্রাসী শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনসাধারণের সংযুক্তির অভাব ঘটছে এবং বিচ্ছিন্নতা বেড়ে চলেছে; এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে অভিভূত অনেক সমাজতন্ত্রদরদী মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ছেন। আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়ন, অটোমেশনের প্রসারের ফলে শ্রমিকের রবটত্ব প্রাপ্তি এবং বিচ্ছিন্নতার অন্যান্য কারণ; এঁরা বলছেন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেও ক্রমবর্ধমান। উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদনের উপকরণ কি সেখানে শ্রমজীবীর নিয়ন্ত্রণ-অধীন? শ্রমফল কি সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকের আয়ত্তাধীন? রাষ্ট্রস্বার্থে কি তার শ্রম থেকে সে বঞ্চিত নয়? পার্টি ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা কি জনসাধারণের থেকে বেশি সুবিধাভোগী নন? মালিক-শোষক শ্রেণীর তিরোভাব ঘটেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু বুদ্ধিজীবী ও কায়িকশ্রমজীবী, যৌথখামার ও কারখানার শ্রমিক, অফিসের কেরানী ও কবি—এদের কি এক শ্রেণী, এক পরিবারভুক্ত বলা চলে? যে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় অস্থির হয়েছিলেন তরুণ মার্কস, সে বেদনা নিরসনের সম্ভাবনা কোথায়?

এই অতিদরদীরা আসলে ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম্-এর মোহে আচ্ছন্ন। 'ইকুইটি আর ইকোয়ালিটি', 'মার্কসিজম ও বাকুনিনিজম্'-এর মধ্যে এঁরা তফাৎ খুঁজে পান না। আমরা একথা মনে করি না যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নতার সমস্যা তিরোহিত হয়েছে বা স্বতঃসঙ্কুচিত হচ্ছে। নতুন উৎপাদনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সেখানে নতুন আন্তর্মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, ব্যক্তি ও পার্টি এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রসম্পর্ক ক্রমশ নবপর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে, নিত্য নতুন সমস্যার উদয় হচ্ছে ও সমাধানকল্পে নতুন পদ্ধতি ও সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে। বিচ্ছিন্নতা-নিরসন ও উন্নত স্তরের ব্যক্তি-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলছে। ব্যক্তি-চৈতন্যের দৈন্য ও পুরণো-সভ্যতার প্রভাবে প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ব্যক্তি-স্বার্থ ও ক্ষমতা-লোলুপতা সেখানকার কিছু মানুষকে হয়তো আচ্ছন্ন করছে। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে কিছু কিছু শিল্পী সাহিত্যিক মাঝে

মাঝে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচারিতার জয়গান করছেন, আমরা জানি। নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি আবার স্বৈরাচারিতা দমনের অছিলায় কঠোর হস্তে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টাও করে চলেছেন। 'সার্ভে', 'এন্‌কাউণ্টার' ইত্যাদি পত্রিকায় এই খবরগুলিকে ভিত্তি করে গবেষণামূলক যে-সব উচ্চমানের (!) প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, আমাদের অতিদরদী বন্ধুরা সেই সব প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হয়ে নানারকম উদ্ভট কল্পনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে সব কিছুকে 'এ্যাবসার্ড' মনে করছেন।

সমাজতান্ত্রিক দেশে বিচ্ছিন্নতার বেশ কিছু সমস্যা নিশ্চয়ই আছে। আমলাতন্ত্রের দাপট সেখানে একেবারেই নেই, পার্টি পিরামিডের শীর্ষবিন্দু আর মূলদেশের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত;—এই ধরনের অলীক স্বপ্নে আমরা অভ্যস্ত নই। মনে করি না যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আপনা থেকে বিচ্ছিন্নতা-সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারে। তবে আগেই বলেছি যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিচ্ছিন্নতা-নিরসনের প্রাথমিক শর্তগুলি প্রতিষ্ঠিত। সমস্যা সেখানে সমাধানসাধ্য ও আয়ত্তাধীন। সোভিয়েত দেশের সমস্যাকে আজকাল একদল 'নিওলিট' কর্তৃক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যার সঙ্গে সমীকৃত করা হচ্ছে। দুদেশেরই সমস্যা নাকি উন্নততর প্রযুক্তিকৌশল ও 'প্রাচুর্যের' সমস্যা! আমরা এ-সরলীকরণের বিরোধী। দুই দেশের রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থার মৌল-পার্থক্যকে অস্বীকার করলে অবশ্য হাক্সলী, অরওয়েল ও ফ্রমের অভিমতকে মেনে নিতে কোন বাধা থাকে না। আরো একটি প্রকল্পকে অবশ্য তৎপূর্বে স্বীকার করে নিতে হয়। সেটি হচ্ছে ফ্রয়েডীয় 'নির্জ্ঞান-প্রকল্প'। ফ্রয়েডিয়ান মেটা-সাইকোলজিতে আমাদের উৎসাহ নেই, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'প্রগ্রেসিভ নেচারে' সন্দিহান নই, কাজেই সেখানকার বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করি। বিচ্ছিন্নতার গতি সেখানে নিম্নমুখী, বিচ্ছিন্নতার গ্রন্থি সেখানে ক্ষীয়মান ও গুণগতভাবে নতুন বৈশিষ্ট্যময়। অতিদরদী বন্ধুদের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। বিচ্ছিন্নতা-বিলোপের সংগ্রাম সেখানে তীব্র।

বস্তুসত্তা ও চৈতন্যের পারস্পরিক সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানসে এই সম্পর্ক বিকৃতভাবে প্রতিফলিত।

এই প্রতিফলনের প্রণালী ও পরিণাম,—দুইই বিচ্ছিন্নতাপ্রসঙ্গে আলোচ্য। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মানুষের শ্রম-সৃষ্ট বস্তু বা প্রতিষ্ঠান যখন স্বতন্ত্র শক্তির অধিকারী হয়ে মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, তখন প্রতীত ব্যাপারসমূহের আসল সম্পর্ক সঠিক ভাবে প্রতিভাত হয় না। বস্তুসত্তা ও চৈতন্যের মধ্যে, বহিপ্রকৃতি ও ব্যক্তিমানসে তার প্রতিফলনের মধ্যে,—ঘটে বিযুক্তি। শ্রমসৃষ্ট পণ্য, প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম বিদ্বেষ্টা রূপে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তি-সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সব কিছুই মনে হয় বৈরিতাসূচক। বিচ্ছিন্নতা থেকে বিকৃত ধারণার উদ্ভব ঘটে। এই বুর্জোয়া সমাজের শোষণ ও বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বিচ্ছিন্নতা-বর্ধক বলে মনে করলেও ভাববাদী দার্শনিকরা প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন অহমিক প্রবৃত্তির উপর। মার্কস-পূর্ব বস্তুবাদী দার্শনিকরা দ্বন্দ্ববিরোধের সমাজকে বিচ্ছিন্নতার মৌলিক কারণ বলে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিরসনের পন্থা নির্ধারণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সত্তাবিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ধর্মবোধ আর যুক্তিবিচ্ছিন্নতার ভাববাদী চিন্তাধারায়।

কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি ও জ্ঞান বিচ্ছিন্নতানাশক—এই ধারণা আমরা পোষণ করি না। এ ধারণা ভাববাদসম্পূরক। আবার যান্ত্রিক জড়বাদীদের মত এও মনে করি না যে, চেতনা ও জ্ঞান সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নেই। সমাজ-তান্ত্রিক পরিবেশে বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী বা পরিধি স্বতঃ-সঙ্কোচিত হবে—এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র আছে, পার্টি আছে, পণ্য আছে ; [অবশ্য বুর্জোয়া সমাজের মত পণ্যপূজা নেই] কাজেই বিচ্ছিন্নতাও বিদ্যমান। সুপরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সঙ্ঘক্রিয়াবাদের প্রসার-মারফত নবচৈতন্যের উন্মেষ ব্যতিরেকে সোশ্যালিজম থেকে কম্যুনিজ্‌মের দিকে অগ্রসরণ সম্ভব নয়।

আমরা মনে করি সমাজ-জীবনের বিরোধ ও অসঙ্গতির প্রতিফলন থেকেই বিকৃত চৈতন্যের উন্মেষ। এই চৈতন্যবিকার কেবলমাত্র তত্ত্বকথার প্রলেপে দূরীভূত হবার নয়। উৎপাদনসম্পর্ক সব দেশে সতত পরিবর্তনশীল। এই সম্পর্ক পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া চৈতন্য-বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না ; বস্তুসত্তা ও চৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের অতি-আবশ্যক অধিরোহণী ! 'সোশ্যালিষ্ট ম্যান', 'কমিউনিষ্ট ম্যানের' পূর্বপুরুষ।

'সোশ্যালিষ্ট ম্যানের' অসম্পূর্ণতা 'কম্যুনিষ্ট ম্যানের' মধ্যে তিরোহিত হবে, এই বিশ্বাস পোষণ করি আমরা। এ-বিশ্বাস ইউটোপিয় আশাবাদ নয়। এ-বিশ্বাস বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নমুখী গতিরেখার বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনের অসীম প্রাচুর্যের ফলে প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টনের বন্দোবস্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাবে, ঈর্ষা-বিদ্বেষ নিঃশেষিত হবে। স্বয়ংক্রিয় প্রণালীর ব্যাপক প্রয়োগের ফলে শ্রম-লাঘব অবিসংবাদিতভাবে ঘটবে। ভবিষ্যতের জটিল ও সূক্ষ্ম প্রযুক্তিকৌশল আয়ত্ত-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবিক-ক্ষমতার সর্বাত্মক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই উন্নতি ঘটবে মানসিকতা ও মানব-প্রকৃতির সর্বস্তরে। বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সীমারেখা অবলুপ্তি সমস্বার্থিক সু-সমন্বিত সমাজের বনিয়াদ গড়ে তুলবে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সৃজনধর্মী শ্রমের সুযোগ পাবে। নিজের পছন্দমত কাজ বেছে নেবার ফলে ও ইচ্ছামত কাজ করার সুবিধা থাকার দরুণ মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তন রাষ্ট্র-শাসক ও কর্তৃত্ব-পরিচালকের ভূমিকাকে প্রথমে গৌণ ও পরে প্রয়োজনহীন করে তুলবেই। মস্তিষ্কস্তরে ঘটবে গুণগত পরিবর্তন। "বিইং" ও "কনশাসনেস", বস্তুসত্তা ও চৈতন্যের অনন্বয় ক্রমশ তিরোহিত হবে। নতুন নীতিবোধ উন্মেষিত হবে বাস্তব সম্পর্কে সম্যক চেতনার প্রভাবে। এই নতুন নীতিবোধ,—'কম্যুনিষ্ট মরালিটি' নামে অভিহিত। পূর্বসূরীদের নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংযুক্ত হবে 'কম্যুনিষ্ট-মানুষে'র নতুন মূল্যবোধ, নতুন নীতিচেতনা। শ্রেণী-আনুগত্য শ্রেণীহীন সমাজে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে রূপান্তরিত হবে। সমষ্টি কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তি-কল্যাণের সমন্বয়ের ফলে সঙ্ঘক্রিয়াবাদ,—কালেকৃটিভিজমের পরিণত রূপ দেখা যাবে। জাতীয় স্বার্থ সমীকৃত হবে আন্তর্জাতিক স্বার্থের সঙ্গে। বাধ্যকরণের প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলে ব্যক্তিত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও আত্মোপলব্ধি এক অভাবিত নতুন মান সৃষ্টি করবে। শিশুকে যে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হয় বা বাধ্য করতে হয়, সুস্থমনা বয়স্ক সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্ব-ভাবে পালন করে। বুর্জোয়া সমাজের বাধ্যতামূলক শ্রম ও সামাজিক কর্তব্য কম্যুনিষ্ট সমাজে নীতিবোধে সঞ্চারিত হয়ে মানুষের স্বভাবে পরিণত হবে। এ বিশ্বাস বুর্জোয়া পণ্ডিতের কাছে অযৌক্তিক হলেও মানবচরিত্র-অভিজ্ঞ বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছে আদৌ যুক্তিহীন নয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজস্ব নিয়মে বিচ্ছিন্নতা বিলোপ ঘটবে, কমিউনিজম

প্রতিষ্ঠিত হবে ; এ আমরা কখনও মনে করি না। কমিনিউজমের জন্যে, বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ বিলোপের জন্য, সমাজতান্ত্রিক মানুষকে লড়াই চালাতে হবে, নতুন পর্যায়ে সমাজকে উন্নীত করতে বিপ্লবের নতুন স্তর অতিক্রম করতে হবে। শুধু আলোচনা বা অভিলাসে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হবে না।

বিচ্ছিন্নতাবোধ আগামী দিনের মানুষের মধ্যে ক্রমসংকুচিত হয়ে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে—এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীরা সকলেই বিচ্ছিন্নতাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়তো নয়। কিন্তু বস্তু-সত্তা ও চৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা সম্যক অবহিত নন—একথা সত্যি। দ্বয়বাদী ধারণায় আচ্ছন্ন থাকায় বস্তু ও ভাবের, পরিবেশ ও মস্তিষ্কের পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক জ্ঞানোপলব্ধি এঁদের পক্ষে কঠিন ; এঁরা ধারণা করতে পারেন না যে মানবচৈতন্য সামাজিক ও বহির্বাস্তবের, বিশেষ করে, উৎপাদন সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। 'অবজেকটিভ রিয়ালিটি' চৈতন্য-নিরপেক্ষ—এই সত্য এঁদের কাছে উদ্ভাসিত নয়। এঙ্গলসের ভাষায় বলা যায়—"হিজ্ মোটিভস্ মে এ্যাপিয়ার টু হিম্ ইন ফর্মস হুইচ্ ডু নট্ করেসপণ্ড টু দেয়ার এ্যাকচুয়াল নেচার।"

বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে সাময়িক পত্রিকায় দু'ধরনের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। একধরনের লেখক নিজেকে ফ্রয়েডীয় বা ইয়ুঙ্গীয় রহস্যবাদ প্রভাবিত বলে জাহির করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নন। এঁরা প্রকাশ্যভাবেই যুক্তিবাদকে, বিজ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করেন ও শিল্পসাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার যুক্তিহীন বহিপ্র্রকাশকে অতীন্দ্রিয় চেতনা বা নির্জ্ঞানের অভিব্যক্তি মনে করে তৃপ্তিবোধ করেন। আর এক ধরনের লেখক সরাসরি নিজেদের যুক্তিবাদ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেন না বা নিজেদের সত্যিই প্রগতিবাদী মনে করেন। এঁরা স্পেংলার, টয়েনবী, রষ্টোর প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ভাববাদকে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হলেও কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক অগ্রসরণের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন না। এঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর পুরোভাগে স্থাপন করেন, কিন্তু সব বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করাকে বুদ্ধির অভিব্যক্তি বলে মনে করেন।

আসলে কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এঁরা সচেতন নন, পরিবেশের জটিলতা বিশ্লেষণ এঁদের সাধ্যের অতীত। যে 'ইডিওলজি'তে এঁরা বিশ্বাসী বলে মনে করেন, এঁদের কার্যকলাপ সেই 'ইডিওলজি'র ভিত্তিমূলেই আঘাত করে।

নিজেদের অজ্ঞাতসারে, হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই এঁরা সমাজের ক্ষতি সাধন করে চলেন।

এই সব তত্ত্ববাগীশদের মস্তিষ্কে 'থিওরি ও প্র্যাকটিশ' এর ধারণা অসম্পর্কিত পৃথক পৃথক কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট। 'প্র্যাকৃটিশ' কেন্দ্রটি অপরিণত, তত্ত্বকেন্দ্রটির অতি পরিচালনায়—মস্তিষ্ককোষের স্বাভাবিক নমনীয়তা বিনষ্ট। এঁদের চিন্তাধারা একদেশদর্শিতায় দুষ্ট। আমাদের বক্তব্য প্রথম ধরনের লেখকদের জন্য নয়। তাঁরা সচেতনভাবেই সমাজের শত্রুতা সাধন করে চলেছেন। দ্বিতীয় ধরনের লোকদের মস্তিষ্ককোষের নিষ্ক্রিয় 'অনড় স্তর' ভেদ করতে আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিধর্মী আলোচনা অক্ষম ;—এও আমরা জানি। এঁদের জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা নয়।

এই সব লেখকদের অযৌক্তিক ভাবধারা ও নিরাশাবাদ সুস্থ মানসকে সংক্রামিত না করে, এই আমরা চাই। শক্তি সীমিত হলেও আমাদের আন্তরিক প্রয়াস, মানবমনকে সবরকমের হতাশাপীড়িত প্রতিক্রিয়াশীল অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করা।

৬

মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব

১৯৩২ সালে কার্ল মার্কস-এর 'ইকনমিক এণ্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপটস্' একযোগে জার্মান, রুশ ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়; তারপর থেকে এই বইটিকে কেন্দ্র করে তর্ক-স্রোতের আর বিরাম নেই। এই শ'দুয়েক পাতার পুস্তিকাটির অসংখ্য ব্যাখ্যা ও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের চেয়ে কমিউনিষ্ট-বিরোধীদের সংখ্যা বোধহয় বেশি। মার্কস-এর এই 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর প্রধান আলোচ্য বিষয় বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের বা বিচ্ছিন্নতা-অতিক্রমণের ধারণা ও কল্পনা। গত কয়েক বছরে ঐতিহাসিক কারণেই এই আলোচনার গুরুত্ব বেড়েছে। আমার মনে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের ধারণা সংক্রান্ত সব আলোচনাই অতিমাত্রায় 'টেক্‌নিক্যাল' ও জটিল হওয়ার দরুণ অনেকক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার পর্যায়ে রয়ে গেছে; এবং তারই সুযোগ নিয়ে কিছু সংখ্যক তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে সহজবোধ্য করার নামে 'ভালগারাইজ' করেছেন। আমাদের আলোচ্য পুস্তকটি[১] সহজপাঠ্য নয়, কিন্তু দুর্বোধ্যতার

১ 'Marx's Theory of Alienation:' I. Mészáros: The Merlin Press; London, 1970.

পর্যায়েও পড়ে না। বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কস-এর 'ম্যানাসক্রিপটস্' এর প্রধান বক্তব্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা নেই। গ্রন্থকার প্রথমেই বলেছেন যে মার্কস-এর বহুমাত্রিক সংক্ষিপ্ত সূত্র আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু বোধগম্যতার দিক থেকে দুরূহ[২]; কাজেই ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ ও বিপদ দুইই দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত অংশের উদ্ধৃতি থেকে কোন কোন তাত্ত্বিক 'র‍্যাডিক্যাল নিউ মার্কস'-এর সন্ধান পেয়েছেন। এই 'মার্কস'-এর সঙ্গে পরবর্তীকালের 'মার্কস'-এর মৌলিক তত্ত্বগত বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার কেউবা মার্কসকে বিকৃত করার উদ্দেশ্য নিয়েই অংশবিশেষকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর. সি. টাকার-এর নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৩]

গ্রন্থলেখক এদেশে খুব বেশি পরিচিত নন। হাঙ্গেরিতে জন্ম। লুকাকৃস-এর অধীনে গবেষণা করেছেন। 'স্যাটায়ার' নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে তাঁর লেখক জীবনের আরম্ভ। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে টুরিনে সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে তিনি হাঙ্গেরি ত্যাগ করেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের সাসেক্সে অধ্যাপনায় নিযুক্ত রয়েছেন। সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধও লিখেছেন। হাঙ্গেরি, ইতালি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার নামকরা পত্রপত্রিকায় এইসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর শিক্ষক জর্জ লুকাকৃস এর মতোই দর্শন, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কাজেই তাঁর গ্রন্থে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় বিচ্ছিন্নতার আলোচনা অনেকখানি অখণ্ডিত রূপ পেয়েছে।

মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, মানবপ্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন—এ সবই শ্রম-বিচ্ছিন্নতার ফল। মার্কসীয় মূলসূত্রের এই চারটি অবয়ব প্রথম পঠনে খুবই সহজবোধ্য মনে হয়। আসলে

---

২ The enormous complexity of the closely inter-related theoretical levels is often hidden by formulations which look deceivingly simple. Paradoxically enough, Marx's great power of expression....make an adequate understanding of his work more, rather than less, difficult....the dangers of misinterpretation are acute.

৩ Tucker R. C.—'Philosophy and Myth in Karl Marx' (1961) (Mészáros. I. 'Marx's Theory of Alienation': p 11).

ব্যাপারটি বেশ জটিল। ভূমিকাতে গ্রন্থকার এই অবয়বগুলির জটিলতার আভাস দিয়েছেন এবং পরে ব্যাখ্যার সাহায্যে জটিলতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমণের তত্ত্বটিও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থকার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ, বিচ্ছিন্নতার সীমা অতিক্রমই বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য[৪]। যাঁরা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে মার্কস-এর বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা মার্কস-এর প্রতি অবিচার করেছেন, মার্কসবাদকে বিকৃত করেছেন। আবার অন্যদিকে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা যদি বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে অবহেলা করে এখনও দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তবে মার্কস ও মার্কসবাদের প্রতি সমান অবিচার করা হবে। ইতিহাসে এই প্রথম ধনতন্ত্রের একেবারে বনিয়াদে পৃথিবীব্যাপী কাঁপন লেগেছে; শ্রম থেকে, সত্তা থেকে, প্রজাতি থেকে, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দিন শেষ হয়ে আসছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এমন কি তিরিশের দশক পর্যন্ত যে আলোচনাকে বুদ্ধিজীবীদের 'ব্যায়াম' নাম দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা চলত, আজ আর সেই আলোচনাকে শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়-সূচীর বাইরে রাখা চলছে না। যতদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আংশিকভাবে বা এক-আধটি দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বিমোচনের,—

---

৪ ....The key to understanding Marx's theory of alienation is his concept of "Aufhebung" (transcendence), and not the other way round....The concept of "Aufhebung" must be in the centre of our attention for three main reasons :

(1) it is as we have seen, crucial for the understanding of the "Economic and Philosophic Manuscripts of 1844" whose analysis constitutes the major part of this study ;
(2) the concept of the "transcendence (Aufhebung) of labour's self-alienation" provides the essential link with the totality of Marx's work, including the last works of the so-called "mature Marx ;"

(3) in the development of Marxism after the death of its founders, the issue was greatly neglected and, for understandable historical reasons, Marxism was given a more directly instrumental orientation. (Mészáros : Marx's Theory of Alienation, pp 20-21).

"পজিটিভ্ ট্রানসেনডেন্স অফ্ লেবার্স সেল্ফ্ এ্যালিয়েনেশন"—ধারণার অবস্থান ছিল পশ্চাদ্‌ভূমিতে।[৫] তখনও ধনতন্ত্রে দুনিয়াজোড়া সঙ্কট দেখা দেয়নি, সারা পৃথিবীর সামাজিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার আশু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি, তাই বিচ্ছিন্নতা ও তার নিরসনের সমস্যা সাধারণকে পীড়িত করে নি। জগৎজোড়া সর্বাত্মক সঙ্কটের সমাধানে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য প্রতিকারবিধির প্রয়োজন। তা বলে একথা যেন মনে করা না হয় যে এই প্রয়োগে রাতারাতি কোন ফল পাওয়া যাবে অথবা মার্কস-এর এই বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব ত্রাণকর্তার অমোঘ অব্যর্থ ত্রাণমন্ত্র। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, এ যুগের প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দৈনন্দিন সমস্যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত।

বছর-পাঁচেক আগে পোলাণ্ডের অ্যাডাম শাফ্ এই প্রসঙ্গে প্রায় একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যদিও মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের বিচারে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক এরিক ফ্রমের বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও বলেছিলেন যে, মার্কস-এর প্রথম দিককার লেখা দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার (ইকনমিক এণ্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপটস্, ১৮৪৪ এবং দি জার্মান ইডিওলজি) সঙ্গে কমিউনিষ্টদের পরিচয় ঘটেছে একান্ত হালে। প্লেখানভ ও লেনিন এবং কাউটস্কি ও রোজা লুক্সেমবুর্গ যদি এই দুটি পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত থাকতেন, তাহলে তাঁরা মার্কস-এর পরবর্তীকালের তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা হয়তো ভিন্নভাবে করতেন। স্তালিনযুগে তরুণ মার্কস্-এর রচনাবলীর দিকে নজর দেবার রেওয়াজ ছিল না। ব্যক্তিগত সমস্যা অথবা মানবতাবাদ চর্চার আবহাওয়া তিরিশের যুগে তৈরী হয় নি।[৬] তাই পশ্চিমী পণ্ডিতদের কাছে সমাদৃত হল তরুণ মার্কস-এর 'ম্যানাসক্রিপটস্' ও 'ইডিওলজি'। আর মার্কস-এর মানবতা সম্পর্কিত দার্শনিক বক্তব্যের ভক্ত হলেন পূর্বজার্মানির আর্নস্ট ব্লক ও পোলাণ্ডের লেসজেক কোলাকৌস্কির মতো শোধনবাদী কমিউনিস্ট।

৫ Ibid p 21.

৬ 'In the atmosphere of the nineteen thirties' Schaff wrote, 'there was no room in official Marxism for the problems of the individual, the philosophy of man and humanism' [Jordan Z. A : Survey : July 1966, p 123].

তরুণ মার্কস-এর বক্তব্য আর পরিণত মার্কস-এর বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত মতাবলম্বীরা নিজেদের বিপরীত মতের সমর্থন খুঁজে পেলেন। পশ্চিমী পণ্ডিত আর ঐসব শোধনবাদীরা তরুণ মার্কসকে নিয়ে পরিণত মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' ও এঙ্গেলস-এর 'অ্যান্টি ডুরিং'-এর মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরাই হলেন তরুণ মার্কসের গোঁড়া সমর্থক। টাকার[৭] বললেন, মার্কসকে অর্থনীতি রাজনীতি বা সমাজবিদ্যার পণ্ডিত মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়, তিনি আসলে ধর্মনীতির প্রচারক। কথাগুলো অদ্ভুত শোনালেও সত্যি, টাকার[৮] সত্যিই এইরকম লিখেছেন। পরিণত মার্কস, টাকারের মতে, মৌলিকত্ব হারিয়ে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আবার অন্যদিকে, সরকারী মার্কসবাদের সমর্থকরা (যাঁরা দুই মার্কসকে ভিন্ন বক্তব্যের প্রবক্তা বলে মনে করেন) তরুণ মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে কাঁচা হাতের লেখা বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে পরবর্তীকালের লেখার মধ্যেই খাঁটি মার্কসবাদের সারবস্তু খুঁজে পেয়েছেন। অ্যাডাম শাফ্ (১৯৬৬) এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে—মার্কস এক, মার্কসবাদও একটি। মার্কস-এর চিন্তাধারা ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে, মতবাদ ক্রমশ পুষ্ট, প্রসারিত হয়েছে। তাঁর ধারণার কোন গুণগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব ও পরবর্তীকালের পুঁজিকেন্দ্রিক তত্ত্বের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। প্রমাণ হিসেবে

---

৭ Tucker R. C., 'Philosophy and Myth in Karl Marx.' (Cambridge University Press—1961).

৮ Marx's main work is an inner drama projected as a social drama .. (Ibid p 22). Just like Feurbach—as Hegel before him—who did not realize that when he analysed religion he was in fact talking about "the neurotic phenomenon of human self-glorification or pride, and the estrangement of the self that results from it" (p 93). Marx had no idea that in his presumed analysis of capitalism he unconsciously painted something resembling R. L. Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde : a purely psychological problem, related to an entirely "individual matter" (p 240). "Being a suffering individual himself, who had projected upon the outer world an inner drama of oppression, he saw suffering everywhere" (p 237). [Me'sza ros : pp 331-332]

তিনি ও তাঁর সমর্থকরা মার্কসের পরবর্তীকালের রচনা থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। বলার ভঙ্গি, ভাষা, স্টাইল ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটলেও মানুষ সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটেনি। শাফ্ মনে করেন বরং তাঁর তরুণ বয়সের রচনা তাঁর পরিণত ভাবধারা ও মতবাদকে বুঝতে সহায়তা করে। অ্যাডাম শাফ্ ও তাঁর সমর্থকরা (সমর্থকদের মধ্যে বেশির ভাগ হলেন পশ্চিমী বুর্জোয়া পণ্ডিত ও তথাকথিত শোধনবাদী) 'ম্যানাসক্রিপটস্' ও 'জার্মান ইডিওলজি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে[৯] দেখালেন যে, মার্কসবাদীদের পক্ষে সব থেকে বড় ও বাধ্যতামূলক কাজ হলো মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, মনুষ্যোচিত গুণবর্জিত পৃথিবীর ক্লেদ থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

অ্যাডাম শাফ্-এর প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্নতা আলোচনা এসে পড়ল। মেসজারোসের আলোচ্য পুস্তকটির বছর চারেক আগে শাফ্-এর 'মার্কসিজম্ অ্যাণ্ড দি ইন্‌ডিভিজুয়াল' বইটি প্রকাশিত হয়। পোলিশ পার্টির কোনো শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিক শাফ্-এর আগে কখনও সরকারী পার্টির সমালোচনা করেন নি। তিনিই প্রথম সমালোচকের ভূমিকা নিলেন। কমিউনিষ্ট নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপের ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটছে না, আন্তর্মানবিক সম্পর্কের, রাষ্ট্র ও পার্টির সঙ্গে ব্যক্তিসাধারণ ও কেডার-সাধারণের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে না। এক অন্ধ গলিতে এসে প্রগতির স্রোত যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

---

৯ মার্কস-এর পরবর্তীকালের লেখার মধ্যে তরুণ মার্কস-এর সুসম্মত প্রথার ও পরিণতির প্রমাণ শাফ্ ও সমর্থকরা খুব বেশি দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। Me´sza´ros তাঁর পুস্তকের একটি অধ্যায়ে নানা উদ্ধৃতি ও বিচার বিতর্কের সাহায্যে তরুণ মার্কসকে পরিণত মার্কস-এর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের আলোচনা সেই দিকে যাবার আগে শাফ-সমর্থকদের একটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন :

In Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie (Outlines of a Critique of Political Economy) composed by Marx in 1857/58, we find a passage which combines the socialist humanism of the young Marx with the evolutionary sociological holism of later years and thus corroborates the hypothesis of continuity : See E. J Hobsbaw (ed); Karl Marx : Pre-Capitalist Economic Formations (London, 1964) p 84.

এর মূলে শাফ্ মনে করছেন, আছে মার্কস-এর সঠিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা, তরুণ মার্কসীয় 'সমাজবাদী মানবতা'র প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিমূর্ত মানুষের নয়, ব্যক্তিমানুষের জন্যই সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকে তবে সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য বিফল হতে বাধ্য। বিপ্লব সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধানকল্পে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (পোল্যাণ্ড) অন্যায় অবিচার রয়েই গেছে। মার্কস লিখেছিলেন, ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে।[১০] কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি।[১১] কেবলমাত্র ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপ বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটায় না, এমন কি অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাও এর ফলে বিলুপ্ত হয় না। [মার্কস-এর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা করেন নি শাফ্। তরুণ মার্কস-এর ধারণা ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সার্বিক উপায়-পদ্ধতি থেকে পৃথক করে দেখে শাফ্ সেই ভুলই করেছেন, যা তাঁর মতে বুর্জোয়া পণ্ডিত ও শোধনবাদীরা করেছিলেন : ধী. গ.]। মানুষেরই সৃষ্ট বস্তু-প্রতিষ্ঠান যখন মানুষের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব নিয়মে চলে ও নিজের শক্তিতে ব্যক্তিমানুষকে শৃঙ্খলিত করে, তখন বিচ্ছিন্নতার বিকাশ ঘটে। সমাজের স্রষ্টা মানুষ যদি সামাজিক আইন-কানুনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে সত্তা ও স্বাধীনতা থেকে বিযুক্ত হয়, যদি অন্ধ সামাজিক শক্তির নিষ্পেষণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তাহলে তার উচিত যে করেই হোক সমাজের উপর, সামাজিক শক্তির উপর নিজের প্রভাব ফিরিয়ে আনা। বিচ্ছিন্নতার নিরসনের চেষ্টা মানে মানবমুক্তির সংগ্রাম, সত্যিকারের ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংগ্রাম। শাফের পুস্তক প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে (১৯৫৭) সার্ত্র একটি পত্রিকায় লেখেন যে অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও

---

১০ "The positive transcendence of private property as the appropriation of human life is the positive transcendence of all estrangement,—that is to say, the return of man to his human, i.e, social mode of existence. (Marx: Economic and Philosophic Manuscripts—1844; p 103).

১১ Me´sza´ros এ সম্পর্কে অন্যমত পোষণ করেন। আলোচ্য পুস্তকের 244—252 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যমান।[১২] আসলে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা অস্তিত্বের সমস্যা, ধনতন্ত্রের সমস্যা নয়।[১৩] মার্কসীয় তত্ত্বের এই বিরোধিতা সে সময় শাফ্ সহ্য করেন নি। অন্যান্য

---

১২ সার্ত্র লিখেছিলেন যে, অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাগুলো সর্বদেশেই সর্বকালে বিদ্যমান। ভয় উদ্বেগ অশান্তি নিরাপত্তার অভাব থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি নেই। "The desire for happiness, the fear of death, the experience of solitude, the dread of life or the sense of its meaninglessness—remain unresolved as much under socialism as under capitalism" (Sartre) But the main cause of the persisting disillusionment with and unsatisfactoriness of life is alienation which socialism has not managed to overcome. সোভিয়েত লেখকেরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেই সময় শাফ এই বাদ-প্রতিবাদে সোভিয়েত পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। ('A Philosophy of Man' : N. Y. 1963 p. 74.)

১৩ অস্তিবাদীরা বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। মানবজাতি বা মানবতার সঙ্কটবোধ থেকে অস্তিবাদ দর্শনের উৎপত্তি। "Existentialism is in all its forms a philosophy of crisis. It expresses the crisis of man openly and directly, whereas other schools, like that of Logical Positivists, express it indirectly and unconsciously. For this reason, the fact of estrangement in its enormous complexity and manysidedness becomes central with them." (F. H. Heineman, Existentialism and the Modern Predicament, Adorn & Charles Black ; London, 1953, p 1967). সঙ্কটের মৌলিক কারণ বিচ্ছিন্নতা—হাইনেমানের বক্তব্য। সব অস্তিবাদীর পক্ষে কিন্তু এ কথা প্রযোজ্য নয়। বিচ্ছিন্নতা তাঁদের সবার কাছে প্রধান বা মৌল সমস্যা নয়। বিশ শতকের অস্তিবাদীরা বিচ্ছিন্নতা সমস্যাকে পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সার্ত্র, কিয়েকের্গার্ড, জ্যাসপার্স ও মার্সেলের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত অবস্থান এক নয়। কিয়েকের্গার্ড-এর লেখায় বিচ্ছিন্নতার সমস্যা প্রান্তস্থ, অপরপক্ষে সার্ত্র-এর কাছে এ সমস্যা কেন্দ্রস্থ। জ্যাসপার্স এবং গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের অবস্থিতি এই দুই জনের মাঝামাঝি। প্রসঙ্গত বলা উচিত, নিরীশ্বরবাদী ও খৃষ্টবিশ্বাসী অস্তিবাদীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। "One cannot discuss fundamental estrangement from a Christian standpoint........This concept of estrangement, which from the Christian

অনেকের সঙ্গে শাফ্‌ও সার্ত্রের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন। যদিও তখন তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে ওকালতি করছিলেন, কিন্তু সরাসরিভাবে পার্টি বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন কিছু লেখেন নি।[১৪] বুর্জোয়া পত্রিকার মতে তিনিও ছিলেন শোধনবাদী, কিন্তু গোঁড়া ধরনের। তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল পার্টির শক্তি বাড়ানো ও পার্টির আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় করা।[১৫] পরবর্তী সময়ে সরকারী সমালোচনায় যখন তিনি মুখর হয়ে উঠলেন, তখন অল্পসংখ্যক সমালোচক তাঁর সপক্ষে এলেন, বেশিরভাগই গেলেন বিপক্ষে। তাঁর পুস্তকের মধ্যে যে সব ঘটনার উল্লেখ ছিল (পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ত্রুটি বিষয়ক) সেইগুলো নিয়েই খুব হৈ চৈ উঠলো ; তত্ত্বগত বক্তব্য সম্পর্কে বেশি উচ্চবাচ্য করা হলো না।[১৬]

---

standpoint so categorically denies the Incarnation of the Transcendent being in human being, is, by contrast, a prominent feature of the Atheist branch of existentialism (Mounier. Existential philosophies. An Introduction. Rockliff, London, 1948, pp 35-36).

১৪ The trump-card of anti-marxist and anti-communist propaganda has been the question of the rights of the individual under socialism. Our opponents argue that they have a democracy and we a dictatorship, that the rights of the individual are respected in their countries and not in ours. This is an argument that does appeal to many people and can for a time effectively frighten them away from socialism. A Philosophy of Man (New York 1963) p 102.

১৫ Schaff's revisionism can be called orthodox because he subordinated it to the supreme objective of keeping the party in power and of making its hold on the country secure and effective……He was successful so long as he dealt with theoretical or philosophical problems regarded by his more practically minded comrades with condescending indifference. But when he crossed this line and took up matters directly affecting the reputation and politics of the party, as he did in 'Marxism and the Individual', the party turned against him with anger and fury. (Jordon Z.A. : Survey : July 1966, p 120)

১৬ "While some problems of substance, for instance,

অ্যাডাম শাফ্-এর বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত ধারণা অস্তিবাদ প্রভাবিত। শাফ্-এর সমালোচকরা সে সম্বন্ধে খুব বেশি সজাগ নন। তাঁদের প্রধান আপত্তি তথ্যমূলক ভুল-ত্রুটির উল্লেখে। এ-থেকে আমার মতো সীমিত জ্ঞানের লোক যদি মনে করে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে তাত্ত্বিক আলোচনায় ক্রমশ ভাঁটা পড়ে আসছে, তত্ত্ব ও তথ্যের ডায়ালেকটিক সম্পর্কে ছেদ পড়ছে, আপাতসুবিধাবাদ মার্কসবাদকে বিকৃত করতে চলেছে,—তাহলে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকরা অস্বীকার করতে পারেন না, তাই হয়তো অনেকে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকেই অস্বীকার করতে চান।

নিও-ফ্রয়েডিয়ান ও অস্তিবাদী দার্শনিকদের বস্তুবাদবিরোধী সুকৌশলী আক্রমণের উপযুক্ত ধারালো কোন উত্তর কমিউনিষ্ট তাত্ত্বিকরা দিতে চান না বোধহয়, তাই পার্টির শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজেদের অজ্ঞাতে মনে-মনে ভাববাদাশ্রিত ধারণা পোষণ করেন। অনেক সময় তাঁদের শিল্পকৃতির মধ্যে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-সম্পর্কের ব্যাপারে অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বকে অথবা ফ্রয়েডীয় লিবিডো-তত্ত্বকে মেনে নেবার ফলে এঁদের নিজেদের জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করার অতি উৎসাহে অথবা মার্কসীয় তত্ত্বের আলোচনার উপর গুরুত্বের অভাবে অনেক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে ও আরও হবার সম্ভাবনা রয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কাফকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী অধ্যায়ের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এইরূপ এক বিপর্যয়ের নিদর্শন। এই অবস্থায় মেসজারোস-এর বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনার এই গ্রন্থটি আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনটি অধ্যায়ে আছে মার্কসীয় তত্ত্বের উদ্ভব ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায়: বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার। তৃতীয় খণ্ডে আবার তিনটি অধ্যায়: বিচ্ছিন্নতার

Schaff's use of the term "alienation" or affinity of his views with existentialist philosophy were raised, .. the main objection was his "long list of exaggerated and often groundless complaints against socialism."
(Ibid p 133)

সমকালীন তাৎপর্য এই খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত। সার্ত্র, শাফ্ বা ফিশারের মতো আলোচ্য লেখক কোথাও মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অস্তিবাদী দর্শন বা ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হন নি; এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি বজায় রেখেই তিনি বিচার করেছেন।

প্রথম দুটি খণ্ডের চেয়ে তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সরল ও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম অধ্যায়ে তরুণ ও পরিণত মার্কস-প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গ ও তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাসঙ্কট-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সব পাঠকই শেষের অধ্যায় তিনটি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। অষ্টম অধ্যায়টিতে তরুণ বনাম পরিণত মার্কস-এর বিতর্কটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অ্যাডাম শাফে্র মতো অস্তিবাদের দ্বারস্থ না-হয়েই লেখক সপ্রমাণ করেছেন যে, বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব মার্কস কোনদিনই পরিত্যাগ করেন নি। পরিণত মার্কস-এর মধ্যেই তরুণ মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি।

তিনি প্রথমে জন ম্যাকমারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন[১৭] তরুণ ও পরিণত মার্কসকে পৃথক করে দেখা দ্বন্দ্বমূলক বিচারসম্মত নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজনীতির দিক থেকে দুই বিপরীত আদর্শের পণ্ডিতরা এই ভুল করেছেন। একদল তরুণ মার্কসকে মাথায় তুলে নিয়েছেন, অন্যদল পরিণত মার্কসকেই শুধু

---

১৭ "Communists are rather liable to misinterpret this early stage even if they do not entirely discount it. They are naturally apt to read these writings in order to find in them the reflection of their own theory as it stands today, and therefore, to dismiss as youthful aberrations those elements which do not square with the final outcome. This is, of course, highly undialectical. It would be equally a misunderstanding of Marx to separate the early stage of his thought from their conclusion, though not to the same extent. For those are earlier stages, and though they can only be fully understood in terms of the theory which is their final outcome, they are historically earlier and the conclusion was not explicitly in the mind of Marx when his earlier works were written. (McMurray John: "The Early Development of Karl Marx's Thought, in Christianity and Social Revolution:" Victor Gollancz, London: 1935, pp 209-10)

গ্রাহ্য করেছেন। ম্যাকমারে এই মন্তব্য করেছেন ১৯৩৫ সালে। তারপর এই প্রবণতা কমে গেছে মনে করলে ভুল হবে। বরং দুই মার্ক্স-এর মধ্যেকার এই বিচ্ছেদকে এখন যেন মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়াই হয়েছে। এ-কথা লিখেছেন মেসজারোস। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা বোধহয় খুব বেশি হয় নি। বছর পাঁচেক আগে পাভলভ ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এইরকম মতবাদেরই প্রাধান্য দেখেছিলাম। আলোচনা বেশির ভাগই অবশ্য বিশৃঙ্খলভাবে চলেছিল এবং মার্ক্স-এর 'ম্যানাস্ক্রিপটস'-এর কথা খুব কম বক্তাই মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন আগে 'মূল্যায়ন' পত্রিকার আয়োজিত সভায় আগের দিনের মতোই দুই মার্ক্সকে একেবারে পৃথক করে দেখা না-হলেও, তরুণ মার্ক্স-এর তারুণ্যকে যেন একটু অনুকম্পার সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। ঐ পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণী থেকে আমি এই রকমই বুঝেছি।[১৮]

তরুণ মার্কসকে 'অমার্কসবাদী মার্কস' বলা, আবার তাঁকে 'বিপ্লবী হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট না-হওয়ার' মধ্যে আমি অনুকম্পার ভাব লক্ষ্য করেছি। এক

---

১৮ "এই সব পূর্ববর্তী রচনায় যদিও মার্ক্সকে বিপ্লবী হিসেবে চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু তখনো অর্ধস্ফুট বিপ্লবী চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটায় তাঁর রচনায় সেই অপরিণত চিন্তার অনেক ছাপ রয়েছে—মার্ক্স নিজেও সেই সময় পুরোপুরি মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠেন নি···মার্ক্সবাদ যখন পরিণত হয়ে ওঠেনি সে সময়কার রচনায় পরিণত মার্ক্সবাদী মার্ক্স থেকে অনেকাংশে অমার্ক্সবাদী মার্ক্সকেই বেশি পাওয়া যায়। কেননা, তখনো বিশেষ করে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের লেখাগুলিতে মার্ক্স প্রধানত তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের তত্ত্বের আলোচনা ও সমালোচনার ভেতর দিয়ে নিজস্ব দর্শন সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। মার্ক্সের সেই অমার্কসবাদী রূপটাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের কাছে পরম লোভনীয় হয়ে উঠল।···কিন্তু হেগেল ও ফয়েরবাখ সম্পর্কিত আলোচনা ও সমালোচনায় তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন—'ক্যাপিটাল'-এর মার্ক্স-এর চিন্তার সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য ছিল।···তারা (বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা—ধী. গ.) দুই মার্ক্সের মূলগত পার্থক্যটাই ভুলে যান বা অস্বীকার করেন···আরো একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—মার্কসবাদের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ধনতন্ত্রের প্রতি মার্ক্স যে অসীম ঘৃণা ও বিরোধিতা পোষণ করতেন তার অনেকটাই ছিল নৈতিক ও বিমূর্ত।"
[মূল্যায়ন : ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১১১-১১৩]

জায়গায় লেখা হয়েছে 'দুই মার্কস'-এর তত্বটা যেন বুর্জোয়াদের আমদানি, আবার অন্য জায়গায় দেখছি লেখা হয়েছে "তারা (ঐ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা —ধী. গ.) 'দুই মার্কস'-এর মূলগত পার্থক্যটা ভুলে যান বা অস্বীকার করেন"। রিপোর্টার আবার শেষের দিকে লিখেছেন—"কিন্তু আমরা জানি, তরুণ মার্কসকে পরিণত মার্কসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা মার্কসকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার নামান্তর।" আমার কাছে রিপোর্টটি একটু গোলমেলে মনে হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য তাই রিপোর্টের অনেকখানি তুলে ধরছি।

কেন এই তরুণ-পরিণত বিরোধ? আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, কারণটা নিহিত রয়েছে 'দি জার্মান ইডিওলজি' ও 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'র দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে—যেখানে মনে হয়, মার্কস যেন নিজেকে তাঁর অতীত থেকে, দার্শনিকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সত্যিই কি তাই? গ্রন্থকার তা মনে করেন না।[১৯] 'জার্মান ইডিওলজি'র অনুবাদক ও ভাষ্যকারের সঙ্গে তিনি একমত নন। 'সেলফ্ এসট্রেঞ্জমেন্ট' কথাটা তিনি পরবর্তীকালে বর্জন বা অস্বীকার করতে চান নি। 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'র যে-লাইনগুলো উদ্ধৃত করে 'ম্যানাসক্রিপট'-এর বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়,[২০] সেগুলোর তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি—গ্রন্থকার এই মত পোষণ করেন। সমগ্র আলোচনা তুলে ধরা সম্ভব নয়। পাঠক ঔৎসুক্য বোধ করলে আলোচ্য পুস্তকের ২১৮-২২২ পৃষ্ঠা পড়ে দেখবেন। আমার মনে হয়েছে মেসজারোসের যুক্তি গ্রহণযোগ্য। পরবর্তীকালের রচনায় মার্ক্স তাঁর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের বিরোধিতা করেন নি; বিচ্ছিন্নতার ভাববাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। "ইকোয়ালি হোয়াট্ ইজ্ এ্যাটাক্‌ড্ হিয়ার ইজ্ নট দি নোশন অফ 'ম্যান' ডিফাইণ্ড বাই মার্ক্স ইন 1844 এ্যাজ দি সোশ্যাল ইনডিভিজুয়াল, বাট দি এ্যাবস্ট্রাকশন—'হিউম্যান নেচার' এ্যাণ্ড 'ম্যান ইন জেনারেল'।" গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করতে চান যে, ১৮৪৪ এর লেখায় মার্ক্স শুধু নৈতিক ও বিমূর্ত আদর্শের প্রচার করতে আগ্রহী, এই ধারণা ঠিক নয়। এ যুক্তিও গ্রন্থকার খণ্ডন করতে সমুৎসুক যে, ১৮৪৫ থেকে মার্ক্স মানুষ

১৯ Mészáros : Marx's Theory of Alienation : Pp 218-220
২০ Marx-Engels : Manifesto of the Communist Party, In selected works edition. Vol. 1, p 58

ও তার বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে নিরুৎসাহ, নিরাসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গ্রন্থকার কতদূর সফল হয়েছেন ও তাঁর বক্তব্য কতটা তর্কাতীত সেটা পাঠকেরা বিচার করবেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, তাঁর অভিগমন (এ্যাপ্রোচ) আমার কাছে বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়েছে। 'শ্রেণী' ও 'সর্বহারার' ধারণা মার্কসকে বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব থেকে দূরে নিয়ে যায়নি। বিরোধী পক্ষের 'সমাজসম্পর্ক রহিত' 'বিমূর্ত মানুষ' নিয়ে তিনি ১৮৪৪-এর আগেও কোনোদিন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নি।[২১] যদি তাই হয় তবে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি তাঁর পরবর্তী রচনায় এত বিরল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গ্রন্থকার মার্কস-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে। 'দি হোলি ফ্যামিলি', 'দি জার্মান ইডিওলজি', 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো', 'ওয়েজ লেবার এ্যাণ্ড ক্যাপিট্যাল', 'আউটলাইনস্ অফ এ ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি', 'থিওরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু' ও 'ক্যাপিটাল' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে, 'বিচ্ছিন্নতা' বা সমার্থবাচক শব্দ পরবর্তী রচনায় খুব বিরল নয়। এই 'ড্রপ-আউট থিওরি' অচল।[২২]

---

২১ He was, in fact, never interested in this "Man," not even before 1843, let alone at the time of writing the Economic and Philosophic manuscripts of 1844. On the other hand "real man"—the self-mediating being of nature' the 'social individual'—never disappeared from his horizon. Even towards the end of his life when he was working on the third volume of Capital, Marx advocated for hnman beings the "conditions most favourable to and worthy of their human nature." Thus his concern with classes and the proletariat in particular always remained to him identical with the concern for "the general human emancipation." (Meszaros: Marx's Theary of Alienation, p 221). কোটেশন চিহ্নিত অংশ দুটি যথাক্রমে Marx: Capital ed, cit; vol. III p 800—Marx-Engels: On Religion; ed. cit, p 53 থেকে গৃহীত।

২২ It should be clear by now that none of the meanings of alienation as used by Marx in the Manuscripts of 1844 dropped out from his later writings And no wonder. For the concept of alienation, as grasped by Marx in 1844, with all its complex ramifications, is

যাঁরা মনে করেন তরুণ মার্কস দার্শনিক আর পরিণত মার্কস বৈজ্ঞানিক 'পলিটিক্যাল ইকনমিষ্ট'—তাঁরাও দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। ব্যক্তি ও স্বাধীনতার দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না তাঁরা তরুণ মার্কস-এর রচনা দূরকল্পী জ্ঞানে এড়িয়ে চলেন। আর যাঁরা মার্কসবাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শক্তিকে ভয় পান তাঁরা পরিণত মার্কসকে তাচ্ছিল্য করেন। যুক্তিবিচারে এই দুই দলের বক্তব্যই অচল ও অসম্পূর্ণ। 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর প্রথম লাইনদুটিই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে, তরুণ বয়সেই মার্কস 'পলিটিক্যাল ইকনমি'তে পরিণত জ্ঞানলাভ করেছেন।[২৩] 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, মার্কস তদানীন্তন 'পলিটিক্যাল ইকনমি'কে যেমন চেয়েছিলেন বাতিল করতে, তেমনি চেয়েছিলেন ভাববাদী দর্শনের মূলোচ্ছেদ করতে। কাজেই দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকের বিরোধ-তত্ত্ব আমদানি করে—দুই মার্কস-এর পরিকল্পনা জীইয়ে রাখা যায় না। মার্কস দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের বিচরে করেন নি; বিচার করেছেন ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের পক্ষ থেকে। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের চিন্তাধারা মিশিয়ে তিনি তাঁর নতুন প্র্যাকৃটিকাল দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছেন। তেমনি 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তাই তাঁর রচনায় সহজ স্বচ্ছন্দভাবে শেক্‌স্‌পীয়র-গ্যেটে-বালজাক প্রবেশ করতে পেরেছেন। 'ম্যানাসক্রিপটস্' রচনায় ও 'ক্যাপিটাল' রচনায় তিনি পলিটিক্যাল ইকনমিতে সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে বলা চলে যে, এই দুই পর্বেই তিনি দর্শন সম্পর্কে সমান

---

not a concept which could be dropped or one-sidedly translated. As we have seen in various parts of this study, the concept of alienation is a vitally important pillar of the Marxian system as a whole, and not merely one brick of it. To drop it, or to translate it onesidedly, would therefore, amount to nothing short of the complete demolition of the building itself.. (Ibid p 227).

২৩ "Wages are determined through the antagonistic struggle between capitalist and worker. Victory goes necessarily to the capitalist." (Marx: Manuscripts 1844: Moscow, 1961 ; p 20)

অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন ; অবশ্য এ 'দর্শন' তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর। তরুণ মার্ক্স থেকে পরিণত মার্ক্স-এর উত্তরণের পথে কোথাও ছেদ পড়ে নি।[২৪]

শ্রমবিচ্ছিন্নতা সব রকমের বিচ্ছিন্নতার মূল,—এই তত্ত্ব উপলব্ধির মধ্যে পরিণত মার্ক্স-এর মহীরুহের অঙ্কুর নিহিত রয়েছে। 'ম্যানাসক্রিপটস্'-উত্তর সব রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব অনুভূত। পরবর্তী রচনায় 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি অনেক সময় হয়তো ব্যবহৃত হয় নি ; তার মানে এই নয় যে, বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে।[২৫]

মার্ক্সীয় বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব বিশ শতকের বুর্জোয়া দার্শনিক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করেছেন। হাইডেগার বলেছেন যে, মার্ক্স-এর ইতিহাসের ধারণা অন্য সব ধারণার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা জানেন।[২৬] হাইডেগার অস্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ

---

২৪ "The people who deny this tend to be either those who crudely identify 'human' with 'economic', or those who, in the name of mystifying psychological abstractions, treat with extreme scepticism the relevance of social-economic measures to the solution of human problems" (Mészáros : Marx's Theory of Alienation : p 232)

২৫ One must distinguish between conception and presentation. It is simply unthinkable to conceive the Marxian vision without this fundamental concept of alienation. But once it is conceived in its broadest outline—in the Manuscripts of 1844—it becomes possible to let the general term "recede" in the presentation. (Ibid p 238)

২৬ "Because Marx, through his experience of the alienation of modern man, is aware of a fundamental dimension of history, the Marxist view of history is superior to all other views." (p 243). হাইডেগারের এই উক্তি গ্রন্থকার ৩৩ নং Soviet Survey (July—Sept. 1960) p 88 থেকে নিয়েছেন। এই মতের খণ্ডনে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন : "Needless to say, Marx did not experience alienation as 'the alienation of modern man,' but as the alienation of man in capitalist society. Nor did he look upon alienation as a 'fundamental dimension of history' but as the central issue of a given phase of history.

থেকে মার্কসকে দেখতে চেয়েছেন। অনেক মার্কসবাদী, আগেই বলেছি, অস্তিবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত। বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষের মুক্তি নেই, হেগেলের এই মত মার্কস কর্তৃক অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত হয়েছে ; কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হেগেলের এই একটি মতকেই আঁকড়ে ধরেছেন অভ্রান্ত মনে করে। অস্তিবাদীরা সময় বিশেষে হেগেলকে নিজেদের রহস্যময় মতবাদের সমর্থনে দাঁড় করিয়েছেন। শাফ্ প্রমুখ তাত্ত্বিকরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ না দেখে মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা অবসানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মার্কসীয় 'ট্রানসেনডেন্স্' একটা 'মিথ' বলে আজ অনেকে মনে করছেন। কারণ কি ?

নিপীড়িত মানুষ 'ইউটোপিয়ার' স্বপ্ন দেখে থাকে। স্বর্গরাজ্য বা ইউটোপিয়া আনার একমাত্র শর্ত হলো ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপ-সাধন ; অনেকে এই রকম ধারণা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে থাকেন। শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠে না। বিপ্লব পুরণো রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলেনি সোভিয়েতে। পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র আবার অনেকক্ষেত্রে বিপ্লব ছাড়াই করায়ত্ত হয়েছে। কাজেই সে-সব দেশে বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে নি, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি ;—বলে বিলাপ করা চলে না। আমার মনে হয় না, কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাহায্যে ব্যক্তি-সমাজ, পার্টি-কেডার-এর বিচ্ছিন্নতা দূর করা যায়। পার্টি ও রাষ্ট্রের সংগঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ নিহিত থাকতে পারে। ব্যক্তিমানসিকতা ও আন্তর্মানবিক সম্পর্কের জটিলতা বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে অনেক সময় সাহায্য করে। রাজনীতি-অর্থনীতির চর্চা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-পরিমাণে চলে, মনস্তত্ত্বের চর্চা সে-পরিমাণে হয় না। নেতা জনতা, শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা অতিমাত্রায় আগ্রহী ; আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব। স্বর্গরাজ্য গড়ার স্বপ্নে বিভোর হলেই চলবে না, বিপ্লবী ভাবধারায় আবিষ্ট হলেই বিপ্লবোত্তর পরিবর্তনগুলো আপনা থেকে ঘটবে না ; তার জন্যেও প্রয়োজন হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কেবলমাত্র অর্থনীতির

Heidegger's interpretation of Marx's conception of alienation is thus revealing not about Marx, but about his own very different approach to the same issue" (p 243).

ক্ষেত্রে নয়,—মানসিক-আত্মিক ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাও পরিকল্পনাসাপেক্ষ।

মেসজারোস বিচ্ছিন্নতা বিলোপ বা 'ট্রান্সেনডেনস'-এর প্রশ্নে বাস্তবধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। অনেক সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় যে, মার্কসবাদের বর্তমান সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেননি।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে, আত্মসচেতনতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নিহিত আছে, ভাববাদীদের এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। শ্রমোৎপন্ন বস্তুমাত্রই বিচ্ছিন্নতার জনক—একথা তিনি স্বীকার করেন নি। বস্তু ও মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য তিনি সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় মেহগনি টেবিলের ওধারে বসে ম্যানেজার এধারে বসা কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবোধ টেবিলের জন্য নয়, ম্যানেজার-নির্ভর প্রতিষ্ঠানের জন্য। এই কথা বলেছেন গ্রন্থকার (পৃষ্ঠা ২৪৫)।

তিনি মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক পরিচালনাপদ্ধতির পরিবর্তন সম্ভব। তিনি সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে নন। নয়াবামদের মতো 'এশট্যাবলিশমেণ্ট এ্যালার্জি' তাঁর নেই। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনোরকম কাজ করা সম্ভব নয়। আর সংগঠন-প্রতিষ্ঠান থাকলেই তার একটা নর্ম থাকবে, একটা পরিচালনবিধি থাকবে, খানিকটা আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুন এসে যাবে [২৭] আদর্শ প্রতিষ্ঠানের ধারণা স্বর্গরাজ্যের মতোই উদ্ভট। আদর্শ প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ মানুষের প্রয়োজন। সেরকম মানুষ আবিষ্কার করতে হবে :—এমন এক জাতীয় মানুষ যাদের কর্তৃত্বাভিলাষ নেই, সুখদুঃখ ও সাফল্য-অসাফল্যে কোনো বিকার নেই, চাওয়া-পাওয়ার কোনো বালাই নেই।

তাহলে উপায় কি? এই জটিল সমস্যার কি সমাধান নেই? গ্রন্থকারের

---

২৭ But what the total abolition of human institutions would amount to is, paradoxically, not the abolition of alienation but its maximization in the form of total anarchy, and thus the abolition of humanness. "Humanness" implies the opposite of anarchy : order—which, in human society, is inseparable from some organization (Ibid p 245).

মতে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার বিরোধ যতই কমিয়ে আনা যাক না কেন, বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা—ন্যূনতম হলেও, থেকেই যাবে।

গ্রন্থকার কিন্তু এইসব আলোচনার কোথাও রহস্যময়তা, অস্তিত্বের সমস্যা, নির্জ্ঞান-প্রবণতা ইত্যাদি আমদানি করে বাস্তবের সমস্যাসঙ্কট এড়াতে চান না। তাঁর সঙ্গে সব ব্যাপারে একমতাবলম্বী না-হয়েও—তাঁর দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদী বিচার-পদ্ধতির জন্য—তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বাদানুবাদ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। তিনি এই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।[২৮]

বিচ্ছিন্নতার সম্ভাব্য কারণগুলো বিশ্লেষণ, যন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান যে মানুষের (ব্যক্তি-মানুষ) জন্য—এই উপলব্ধি, এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যুক্তিসঙ্গত বিচার:—এইভাবে বিচ্ছিন্নতাকে কমিয়ে আনা যায়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এটা আদৌ সম্ভব নয়। যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান ধনতন্ত্রের আওতায় যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার ফলেই বিচ্ছিন্নতার বিস্তার ঘটেছে। সমাজতন্ত্র এই রুগ্ন বৈশিষ্ট্য দূর করতে সক্ষম।[২৯]

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অপপ্রচারের শিকার আজ প্রগতিবাদী তরুণ। বিচ্ছিন্নতা যন্ত্রসভ্যতার ফল—ফ্রম-ফিশারের এই ধরনের প্রচারে অনেকেই বিভ্রান্ত।

---

২৮ All these problems, nevertheless, are capable of a solution, though of course only of a dialectical one. In our assessment of the transcendence of alienation it is vitally important to keep the "timeless" aspects of these problematics in their proper perspectives. Otherwise they can easily become ammunition for those who want to glorify capitalist alienation as a "tension inséparable de l'existence". (Ibid 247)

২৯ Human instruments are not uncontrollable under capitalism because they are instruments....but because they are instruments—specific, reified second order mediations—of capitalism. As such they cannot possibly function except in a "reified" form ; that is, they control man instead of being controlled by him. It is, therefore, not their universal characteristics of being instruments that is directly involved in alienation but their specificity of being instruments of a certain type ...Precisely because they are capitalistic second order mediations—the fetish character of commodity, exchange and money ; wage and labour ;

সমাজতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা ও ধনতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাকে এঁরা এক করে দেখছেন। কাজেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়করা বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। মনে রাখা দরকার যে—ধনতন্ত্রে 'এ্যালিয়েনেশন-রীইফিকেশন' চরমে উঠেছে, যার ফলে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতা-সমস্যার ব্যাপকতা ও তীব্রতা অনেক কম। বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বকে এড়িয়ে না-গিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের তাত্ত্বিকদের উচিত সমস্যাকে (যতই লঘু ও সামান্য হোক) স্বীকার করে নিয়ে এর নিরসনের চেষ্টা করা। না হলে অ্যাডাম শাফ-হ্যাভম্যান-এর মতো অনেকেই বিভ্রান্ত হবেন, আর সার্ত্র-ফ্রম-ফিশারের দলের পাঠক সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকবে।

---

antagonistic competition; internal contradictions mediated by the bourgeois state; the market; the reification of culture; etc.—it is necessarily inherent in their "essence" of being "mechanism of control" that they must elude human control. That is why they must be radically superseded: "the expropriators must be expropriated," "the bourgeois state must be overthrown"; antagonistic competition, commodity production, wage labour, the market, money-fetishism must be eliminated; the bourgeois hegemony of culture must be broken"....(Ibid pp 248-249).

৭

পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব-সমাজচেতনা ও বিচ্ছিন্নতা

বিশের দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের আশায় পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষ এড়াবার নতুন সূত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। উৎপাদনে প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকতর প্রয়োগের সম্ভাবনা এবং চাহিদা বাড়াবার কৃত্রিম প্রয়াসের ব্যর্থতা ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। অবশ্য প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকেই এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত দেখা যায়। কোঁত (August Comte)কে এই ব্যাপারের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। দৃষ্টবাদের (positivism) প্রবর্তক এই দার্শনিক মনে করেছিলেন, মানবসমাজ অধ্যয়নে কেবলমাত্র জীববিদ্যার তথ্যপ্রয়োগই যথেষ্ট। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই মানব সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং বৈপ্লবিক উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য :—এই অভিমতই পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। উনিক শতকের শেষের দিক থেকে ইউরোপে মার্কসবাদের প্রভাব খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সমাজতাত্ত্বিকরা সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। প্রায় একই সময়ে জার্মানীর ওয়েবার (Weber), ফ্রান্সের ডুর্কহাইম্ (Durkheim) ও ইতালীর প্যারেটো (Pareto) ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতার

মার্কসবিরোধী ব্যাখ্যানে অগ্রসর হন। এঁদের ঐতিহ্য বহন করতে এগিয়ে আসেন আমেরিকার পারসন্স (Talcott Persons)। আমরা জানি মার্কস-এর চিন্তাধারা পুষ্ট হয়েছিল জার্মান দর্শন, ফরাসী রাজনীতি ও ইংলণ্ডের অর্থনীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি-ভ্রান্তির প্রদর্শন ও দ্বান্দ্বিক সমালোচনার মাধ্যমে। হেগেল-প্রুঁধো (Proudhon)-রিকার্ডোর চিন্তাধারার অসম্পূর্ণতা অবাস্তবতা খণ্ডন করে তিনি এক নতুন বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর অখণ্ডতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা। শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার একেবারে এক নতুন ধারণা প্রবর্তিত হলো। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা দ্বন্দ্ব-বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন, একথা অবশ্য বলা চলে না। তবে তাঁরা এর গুরুত্বকে স্বীকার করলেন না। ওয়েবার গুরুত্ব দিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতা, আমলাতন্ত্র ও সামাজিক সম্মানের উপর; শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের উপর নয়। প্যারেটো মনে করেন সমাজে চক্রাকারে চলেছে সিংহ ও শৃগালের দ্বন্দ্ব; একবার একদল অন্যবার অন্যদল জয়লাভ করছে—ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে। আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে না। ডুর্কহাইমের মতে, ব্যক্তির পক্ষে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণের সঙ্গে একাত্ম-বোধের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নতুন ভাবধারার সংঘাতে আদর্শচ্যুতি ঘটলে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, ব্যক্তি অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করে। এর চরম পরিণতি ঘটে আত্মহত্যায় (Durkheim 1897, Suicide : Translation : Free Press 1951)। নির্দিষ্ট আচরণবিধি না-থাকার জন্য প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্যাথলিক ও য়িহুদীদের তুলনায় বেশী। বলা বাহুল্য, 'স্ট্যাটাস কো' বজায় রাখার ও বৈপ্লবিক ভাবধারাকে পরিহার করার পক্ষে এই তত্ত্বের বিশেষ পরোক্ষ আবেদন আছে। এইসব সমাজতাত্ত্বিকদের মতে সমাজে দ্বন্দ্ব বিরোধ আছে এবং চিরকাল চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। এই সমাজব্যবস্থা থেকে একেবারে নতুন আর এক ব্যবস্থায় অতিক্রমণ অসম্ভব না হলেও অযৌক্তিক ও ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। পারসন্স (Talcott Parsons : The Structure of Social Actions : New York 1963) শ্রেণী-সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব বিরোধের পরিবর্তে বিততি প্রশমন ও নক্সা সংরক্ষণের (tension control and pattern maintenance) উপায় উদ্ভাবন করতে চাইলেন।

এই সব তাত্ত্বিকরা স্থানীয় বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ, সাময়িক অত্যাচার-অনাচারের কথা উত্থাপন করেন, শিল্পকারখানায় অব্যবস্থা, শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কখনও সামাজিক বৈষম্যের কথা, উদ্‌বৃত্ত মূল্যের কথা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই সমাজে শান্তি ও ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী থাকবে; অবশ্য কিছু কিছু সংস্কার পরিবর্তনের মাঝে-মাঝে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে পারে এবং পরিবর্তন-সংস্কার সাধিতও হবে : এই ধরনের বক্তব্য আমরা প্রায়শ এঁদের লেখায় বক্তৃতায় দেখতে পাই। উৎপাদন-ব্যবস্থা যে উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত, সামাজিক রীতিনীতি আইনকানুন যে উৎপাদন বণ্টন বিধির উপর প্রধানত নির্ভরশীল, সমাজেরও যে নিজস্ব বিধিনিয়ম আছে, এই সব বিষয়ে এঁদের নীরবতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামাজিক নিয়মকানুনের তাৎপর্য বিশ্লেষণে এঁরা পরাঙ্মুখ, অথবা অতিমাত্রায় 'সাবজেক্‌টিভ'। সমাজচেতনা কিভাবে ব্যক্তিমানসে সঞ্চারিত হয়, সামাজিক নিয়ম কিভাবে কার্যকর হয়, তার ব্যাখ্যায় এঁরা ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈতন্য স্বয়ম্ভু, শর্তহীন এবং স্বতস্ফূর্ত। সামাজিক অবস্থা ও শর্তাবলীর প্রভাব—এঁদের মতে গৌণ। মার্কস-বাদীদের বিরুদ্ধে এঁদের অভিযোগ যে তারা ব্যক্তি-চেতনার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, সমাজচেতনাকে ও সামাজিক বিকাশকে তারা নাকি শুধু বিষয়গত কারণসম্ভূত মনে করে।

সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার উদ্ভব ও পারস্পরিক সম্পর্কের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। লেনিন অনেকদিন আগে লিখেছিলেন, সামাজিক মানুষ সাধারণত বুঝতেই পারে না যে, সামাজিক সম্পর্ক কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে; তারা প্রায়শই নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিশেষ অবস্থায় এইসব সম্পর্কের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা তারা জানে না, কাজেই দৈবের উপর, অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করে ও রহস্যবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার ও সমাজের বিভিন্ন উপজাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক-ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় ও ইয়ুঙ্গীয় মতবাদ তাই সহজেই শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বারা গৃহীত হয়। "Materialism removed the contradiction

by carrying the analysis deeper, to the origin of man's social ideas themselves; and its conclusion that the course of ideas depends on the course of things is the only one compatible with scientific psychology" (Lenin: Collected works: Vol. 1. p 139). মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সমাজে বিভিন্ন দল-উপদল, সম্প্রদায়, শ্রেণী নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও প্রয়োজন মেটানোর কাজে সতত সচেষ্ট। এদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য শুধু বিভিন্ন নয়, মাঝে-মাঝে একেবারে বিপরীত ও সংঘর্ষমূলক হতে পারে। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা মন্দ-লাগার উপর এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের সম্পর্ক নির্ভরশীল নয়। সমাজচেতনা অর্থে তাঁরা বোঝেন যেসব অবজেকটিভ নিয়মকানুন দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক নির্ণীত ও পরিচালিত হয়, সেই সম্পর্কে জ্ঞান। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ-অনুভূতি, মানসপ্রকৃতি বহুলাংশে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁরা আরো মনে করেন যে, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন মূলত প্রভাবশালী শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত। সামাজিক কারণেই জনসাধারণ নিজেদের সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের দরুণই তারা রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। "The growing perception that existing social institutions are unreasonable and unjust ....is only proof that in the modes of production and exchange changes have silently taken place with which the social order, adapted to the earlier economic conditions is no longer in keeping ....These means (the means of getting rid of these incongruities) are not to be invented, spun out of the head, but discovered with the aid of the head in the existing material facts of production" (Engels: Anti-Duhring: 1962 p 367)। সামাজিক অন্যায়-অবিচার, রাষ্ট্রপরিচালকদের অত্যাচার অতি সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করে, তারা স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রকে, সমাজকে নিজের মনে করতে পারে না, বিচ্ছিন্নতার মনোবৃত্তি তাদের আচ্ছন্ন করে। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় 'আউটসাইডার' অথবা ধ্বংসকামী

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সম্যক সমাজচেতনার অভাবে যারা ভাবতে পারে না যে, বিচ্ছিন্নতা নিরসনের উপায় "are not to be invented....but discovered with the aid of the head in the existing material facts of production"; তারা সংগঠিত বিপ্লবী না-হয়ে অসংগঠিত সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকদের একশ্রেণী (যাঁরা সমাজতত্ত্বকে 'সোশ্যাল এনজিনিয়ারিং' বিদ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন) নিজেদের সমাজে অগণিত 'বিচ্ছিন্ন গ্রুপ' সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী।

এই 'সোশ্যাল এনজিনিয়ার'-এর দল প্রধানত সামাজিক মানুষের কর্তব্যে অবহেলা, শ্রমের প্রতি ঔদাসীন্য, ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করতে চান। তাঁদের মতে এইসব অস্বাভাবিক আচরণের কারণ অন্তরের গভীরে নিহিত। কারখানার পরিবেশ বা সামাজিক অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই (Galkin A : Social Sciences : Moscow Vol. 2. 1970 p 142)। তত্ত্বের দিক থেকে এই রকম মতবাদ প্রচার করলেও, এঁরা জানেন যে, (শ্রমের উৎপাদনশক্তি আধুনিক প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায়) মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি যে-হারে হচ্ছে, কর্মীদের মজুরী সে-হারে বাড়ছে না। কাজেই "তথাকথিত" ভিতরের বাধা (inner resistance to work) দূর করতে তাঁরা এদের নানারকমের দাবীদাওয়া অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেবার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মাঝে-মাঝে সুপারিশও করছেন। তা-সত্ত্বেও উৎসাহ জাগানো যাচ্ছে না, ঔদাসীন্য কাটছে না, প্রেরণা ও উদ্দীপনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ শ্রম-বিচ্ছিন্নতা থেকেই যাচ্ছে। ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করে ছোট-ছোট কিছু গ্রুপের মনোভাব বদলানো সম্ভব হলেও সাধারণভাবে মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। (Lewis K. : Group Decision and Social Change in Readings from Social Psychology : New York 1958).

নিজের কাজের উদ্দেশ্য যাদের কাছে স্পষ্ট নয়, শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই, উপরওয়ালার নির্দেশে যাদের কাজ করতে হয়, পরিকল্পনায় যাদের কোন মতামত দিতে হয় না, পরিচালনায় যাদের অংশগ্রহণ করতে হয় না, তাদের পক্ষে উৎসাহী ও আগ্রহী হওয়াটাই অস্বাভাবিক। পুরণো দিনের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে নতুন সমস্যা। সিবারনেটিকস্ ও অটোমেশনের প্রভাবে বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমের চাহিদাবৃদ্ধি ঘটেছে ও নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতা নিরসনের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে গণকযন্ত্রের প্রয়োগের ফলে, আবার তেমনি এই নতুন যন্ত্রকে পুরণো উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টায় বিচ্ছিন্নতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ শ্রমিকের ও সাধারণ মানুষের চেতনাকে আর আগের মত সহজে প্রভাবিত করা যাচ্ছে না। শ্রমিকরা তাই কারখানা পরিচালনায় অংশীদার হতে চাইছে, ছাত্ররা তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা হাতে নিতে চাইছে। বিচ্ছিন্নতা শুধু তীব্রতর নয়, ব্যাপকতর হয়ে উঠছে এবং বিচ্ছিন্নতা বিলোপের অস্বেচ্ছিক অসংগঠিত প্রবণতা সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে। 'সোশ্যাল এনজিনিয়ারে'র দল তাঁদের সমাজের সমস্যার আশ-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছেন, সমস্যার মূলে পৌছুতে পারছেন না। কাজেই, ব্যক্তিমানসে সম্যক সমাজচেতনার সঞ্চার হচ্ছে না, বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগঠিত সুসংবদ্ধ প্রয়াসের কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

আমেরিকাতে ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে সব সমাজতাত্ত্বিক সোশ্যাল এনজিনিয়ারের মত আধিপত্য ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উৎসুক, এ কথা আমরা মনে করি না। মিল্‌স (Mills, C. W.), ফ্রম (Fromm. E.) এ্যাডর্নো (Adorno, T. W.), কেনিসটন (Keniston, K.) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজচেতনা বাড়িয়ে সমাজের অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে, বিচ্ছিন্নতার কারণ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এঁদের বলা হয় 'সোশ্যাল ক্রিটিক'। এঁদের উদ্দেশ্য এক হলেও দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। মিল্‌সের ধ্যানধারণা অনেকটা মার্কসবাদসম্মত, এ্যাডর্নো ফ্রয়েডপন্থী, ফ্রম ফ্রয়েড ও মার্কসের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট, কেনিসটন মোটামুটি বাস্তবধর্মী—বলা চলে, 'প্র্যাগম্যাটিক'। তবে তাঁরা সকলেই 'সোশ্যাল এনজিনিয়ারদের' কার্যক্রমের বিরোধী। মানবমনকে অভিভাবিত করে অসুস্থ সমাজের সঙ্গে যুক্ত রাখার বিরোধী। এঁরা সকলেই চেতনার সম্প্রসারণে উৎসুক, একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

মিল্‌স মানুষকে সুশিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে চান। ব্যক্তির সত্তা ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করে ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত গঠনে তাকে সাহায্য করতে চান। মুক্ত মানুষ, যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমাজকে নিজেদের মত গড়ে তুলবে—এই মততিনি পোষণ করেন। (Mills, C.W. :

The Sociological Imagination : New York 1959 p 192, quoted in Social Sciences Vol. 2 Moscow 1970)

ফ্রমের পাণ্ডিত্য নানামুখী। তিনি বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষ নিরাপত্তার অভাবে সর্বদা উৎকণ্ঠিত। তার মনে রয়েছে : "deep feeling of insecurity, powerlessness, doubt, aloofness and anxiety.......he is threatened with powerful supra-personal forces; his relationship to his fellowmen has become hostile and estranged........The individual stands alone and faces the world." (Fromm, E. : Escape from Freedom : New York, 1941)। ফ্রম লিখেছেন, হেগেল ও মার্কস বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সঠিক মূল্যায়ণ করেছেন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। মানুষ পণ্য উৎপাদন করে, নিজেকে পণ্য মনে করে এবং নিজেকে বিক্রয় করে। কিন্তু এত সব কথা বলার পর, শেষ পর্যন্ত জোর দিয়েছেন নির্জ্ঞান মনের বাধ্যকারী প্রেষণার (Unconscious compulsive motivation) উপর। এই প্রেষণার জন্ম মনের গভীরে, বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধের পরিবর্তে নির্জ্ঞান মনের যুক্তিহীন বাধ্যকারী প্রেষণাকে তিনি চালিকাশক্তি রূপে কল্পনা করেছেন। ফ্রয়েডের মর্ষকাম-ধর্ষকাম প্রবৃত্তিই, ফ্রমের মতে, একদল মানুষকে অনুগামী করাচ্ছে, বশংবদ করাচ্ছে ও অন্য দলকে নিষ্ঠুর প্রভুত্বপ্রয়াসী করাচ্ছে। প্রভু-ভৃত্য, নেতা-জনতার, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে তিনি ধর্ষকাম-মর্ষকাম প্রবৃত্তির প্রতিফলনকেই বড় করে দেখেছেন। তাই বলেছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে মানুষের বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটবে না। বিপ্লবের পূর্বে মানুষকে পরিবর্তন না-করলে নতুন ব্যবস্থাতেও প্রভু-ভৃত্য শাসক-শাসিত শ্রেণী সৃষ্ট হবে। এই পরিবর্তনের উপায় হিসেবে তিনি ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিসিসের নয়া সংস্করণের ব্যবস্থা দিয়েছেন। মার্কসবাদকে ফ্রয়েডীয় মতে শোধন করার হাস্যকর প্রয়াসের কথা বাদ দিলে ফ্রমকে অন্য বহুদিক থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের সার্থক 'ক্রিটিক' বলা যেতে পারে।

অ্যাডর্নো, মিলস্ ও ফ্রমের মত সমাজচেতনার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে চান। তাঁর সঙ্গে ফ্রমের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকাংশে

মিল আছে। তাঁর মতে এই সমাজের কর্তৃত্ব জনকয়েক পুঁজির মালিকদের হাতে থাকতে বাধ্য; গণতন্ত্রের কথা যতই বলা হোক না কেন, সমাজের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না-ঘটলে গণতন্ত্র স্বপ্নবিলাসই থেকে যাবে; পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। "The very structure of Capitalism makes the existence of a ruling elite inevitable."। ফ্রয়েডীয় সমীক্ষার সাহায্যে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, এই শাসক গোষ্ঠীর মানসে অবাধ কর্তৃত্বস্পৃহা সুপ্ত আছে। উপযুক্ত সময়ে এই কর্তৃত্বস্পৃহা থেকে ফ্যাসিবাদের জন্মের সম্ভাবনা রয়েছে (Adorno, T. W. & others: The Authoritarian Personality: New York: 1950)। যদিও তিনি ফ্যাসীবাদের শ্রেণী-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি, বিচ্ছিন্নতার বিশ্লেষণে উৎপাদনশক্তির প্রভাব সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি এবং যদিও তাঁর ধারণা মূলত সাবজেককৃটিভ, তথাপি তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, ধনতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন তাঁর ও অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকের নৈতিক কর্তব্য। সোশ্যাল ইনজিনিয়ারদের সঙ্গে তাঁর এইখানেই পার্থক্য।

কেনিসটন যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতাকে বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ মনে করেন। এই সভ্যতার যতই প্রসার ঘটছে, যতই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বাড়ছে, ততই মনোরাজ্যে ফাটল ধরছে, সমাজ ভেঙে পড়ছে। বিচ্ছিন্ন তরুণ এই সমাজের সৃষ্টি, আবার এই সমাজের বিরুদ্ধেই তাদের বিদ্রোহ। এ-যুগের সবাই মনের দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত ও বাইরের জগতে আশ্রয়হীন। আজকের আমেরিকার ছাত্র-যুবক সমাজের প্রতি নিজেদের কোনো দায়িত্ব স্বীকার করে না। কেনিসটন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে: "They (these alienated youths: D. G) are probably right in thinking that—for them at least—the only adequate life would be a life where external unity supports and encourages inner wholeness—and that such a life is hard to live in the mainstreams of American Society" (Keniston, K: The Uncommitted: New York: 1965 P 272)। তাঁর মতে, নিউরোটিক-উন্মাদ-অপরাধী (criminal)-বিপ্লবী; সবাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এরা সমাজের পক্ষে বেমানান (misfits) এবং পরিত্যাজ্য, একথা বলা চলে না। সমাজ ঠিক

পথে যাচ্ছে, এরা পথ খুঁজে পাচ্ছে না,—সংরক্ষণশীলদের এই অভিমত কেনিসটন পোষণ করেন না। এই সব বিচ্ছিন্ন যুবকদের চিকিৎসার চেয়ে এই অসুস্থ সমাজের চিকিৎসার বেশী প্রয়োজন। মার্ক্স প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: মার্কসের মতে বিচ্ছিন্নতার জ্ঞান অর্থাৎ সমাজচেতনা উন্মেষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বিলোপ পর্বের শুরু। সমাজচেতনা থেকে আসে শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীচেতনা থেকে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার সংগ্রাম; সে-সমাজেই কেবলমাত্র ঘটতে পারে বিচ্ছিন্নতার অবসান। কিন্তু তিনি মার্ক্সের এই মত সমর্থন করেন কিনা—সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

সোশ্যাল-ক্রিটিকরা পুরোপুরি বৈপ্লবিক ধারণা পোষণ করেন না বটে, কিন্তু তাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজের দুঃস্থ অবহেলিত বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর জন্য সমবেদনা অনুভব করেন, তাঁদের জন্য চিন্তা করেন। সমাজ ও জাতির স্বার্থে মানুষের সামাজিক জ্ঞান ও সমাজচেতনার সম্প্রসারণ—নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন। এঁরা মনে করেন, শাসকশ্রেণীর আমলাদের হাতে অথবা মালিকশ্রেণীর ম্যানেজারদের হাতে এমন কোনো তথ্য সংবাদ সরবরাহ করা উচিত নয়, যার দ্বারা ধনতন্ত্রের আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে। এঁরা যে মানবদরদী, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এইবার অন্য এক দল সমাজতাত্ত্বিকের প্রসঙ্গে আসছি। এঁরা নিজেদের খাঁটি বিজ্ঞানী বলে প্রচার করেন। এঁদের একজন বলেছেন, "I have always preferred to characterize my own view point as that of natural science rather than attempt to identify it with any of the conventional schools of natural philosophy" (Lundberg, G. "The Natural Science Trend in Sociology : American J of Sociology : 1955, Vol. 61, No. 3, p 191)। এঁদের গ্রুপকে "Naturalistic instrumentalistic" নামে অভিহিত করা চলে। এঁরা মনে করেন বিজ্ঞানীর ভূমিকা নাগরিকের ভূমিকা থেকে স্বতন্ত্র এবং বিজ্ঞানের স্বার্থে—এই দুই ভূমিকাকে স্বতন্ত্র রাখাই বাঞ্ছনীয়। এঁরা এখনও কোঁত বর্ণিত দৃষ্টবাদ (positivism) আশ্রয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান।

মিরড্যাল (Myrdal, G) কিন্তু মনে করেন যে : "The social sciences have all received their impetus much more from the urge

to improve society than from the simple curiosity about its working. Social policy has been primary and social theory secondary (Myrdal, G : Value in Social Theory : A Selection of Essays on Methodology : NY)। আর একটি আরো আধুনিক পুস্তকে তিনি এইমত প্রকাশ করেছেন যে, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় পক্ষপাতের মনোবৃত্তি মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন। (Myrdal, G : Asian Drama, Vol. 1, Pelican : 1968, p 11)।

ইয়ং ও ম্যাক্ (Young, Kimball and Mack R. W.). বলেছেন, "Man's resistance to social change, preference for old ways which seem always safer and sounder—and ethnocentrism —the tendency to consider his own group and own values superior to others are taken to be serious handicaps for Sociology's efforts to be strictly objective" (Young & Mack : Systematic Sociology : New Delhi : 1972, p 17).

মিরড্যাল এবং ইয়ং ম্যাকের উক্তি থেকে আমাদের বুঝতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না যে, লুণ্ডবার্গের মত খাঁটি বিজ্ঞানীরা আসলে নিজেদের পক্ষপাতিত্ব (bias) চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই গজদন্তমিনারের অধিবাসী সাজতে চান। মিরড্যালের মত উদ্ধৃত করে অনেকে বলতে পারেন যে, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীরাও তো তাহলে পক্ষপাতশূন্য নন। হয়তো তাই। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানীরা পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান আর ধনতান্ত্রিক দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞানী স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। দু-দলের পক্ষপাতিত্বের রূপ ও প্রকৃতি তাই বিপরীত। এ ছাড়া সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা জানেন, "Human thinking based on man's practical activity helps us to correct the discrepancies between our sensations and the essence of things. The subjective element in cognition is bound to give way more and more to its objective content." (Kursanov (Ed): Fundamentals of Dialectical Materialism : U. S. S. R. : 1967, p 280).

প্রয়োগের পথে 'সাবজেক্টিভ বায়াস' সংশোধন করার সুযোগ আছে মার্কস-বাদী সমাজতাত্ত্বিকের, অপরদিকে ধনতন্ত্রের অচলত্বে আস্থাবাদী সমাজতাত্ত্বিকের আরো বেশী ভুল করার ও আরো বেশী পক্ষপাতী হবার সম্ভাবনা। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর 'বায়াস' (bias) ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর 'বায়াসে'র তুলনায় সমাজের অগ্রগতিকে অনেক কম ব্যাহত করে।

ষাটের দশকে এক আমেরিকাতেই বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত ডজন কয়েক বই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের নাম এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্যান্য নামী লেখকদের মধ্যে আছেন: ড্যানিয়েল বেল, এরিক এরিকসন, রবার্ট জে. লিফলটন, কার্ল ম্যানহাইম এবং মামফোর্ড এবং আরো অনেকে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের সাধক অথবা নয়াদৃষ্টবাদী দর্শনের ভক্ত। শেষোক্তদের মধ্যে একজন ১৯৬২ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বিশ্ব সমাজতত্ত্ব কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "The world of Science (Sociology), whatever its attitude to present-day affairs, must have its own continuity and pride to such an extent that it may withdraw and defend itself against the practical world and, if need be, openly disobey it." 'প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ড' মানে বাস্তবকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার স্বপ্ন তাঁরাই দেখতে পারেন, যাঁরা মনে করেন পরিবর্তনের স্রোত বুঝি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বালুচরে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সমাজ-সত্তা ও সমাজচেতনার মধ্যেকার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলনে সমাজজীবন নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে—বস্তুবাদীদের এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করার ফলে এঁরা কোনো সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজকে দেখতে পারে না। চেতনা বহির্বাস্তব নিয়ন্ত্রিত—মার্কসবাদীরা যখন এই কথা বলেন, তাঁরা তখন চেতনার স্বাধীন ক্রিয়াকলাপকে অস্বীকার করেন না। তাঁরা জানেন, "In certain periods the role of social consciousness can and does become decisive although ultimately it is determined and conditioned by social being" (Dictionary of Philosophy: Moscow: 1967 p 412).

তাঁরা আরো জানেন যে, একজন ব্যক্তির নিজের সম্পর্কিত ধারণা দিয়ে যেমন তাকে বিচার করা যায় না, তেমনি সমাজের কোনো এক সময়ের চেতনার

স্তর দিয়ে সমাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করা চলে না। "On the contrary, this consciousness must be explained rather from the contradictions of material life, from the existing conflict between the social productive forces and the relations of production" (Marx & Engels: Selected Works in 2 Vol. Moscow : p 363)।

কয়েকজন বাদে এঁরা (পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকরা) সকলেই সমাজচেতনা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বস্তুবাদ-বিরোধী অবৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণ করেন। মানুষের মনের গভীরে নিহিত রয়েছে এমন একটি স্তর, যার কাছে যুক্তি-বুদ্ধি অগ্রাহ্য, কাজেই মানুষকে কোনোদিনই পুরোপুরি 'সামাজিক' করা যাবে না—এই ফ্রয়েডীয় ধারণা মানুষের পক্ষে অপমানজনক এবং মার্কসবাদীদের কাছে অচল। বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত, সামাজিক বৈষম্য দূর হলেও হতে পারে কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মানুষের নিস্তার নেই,—এই অপপ্রচারে কিছু লোক সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু সব লোককে চিরকাল বিভ্রান্ত করা যাবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের ফলে বিচ্ছিন্নতা বিলোপের প্রাথমিক অবজেক্টিভ শর্তগুলি গঠিত হয়েছে ও বিচ্ছিন্নতা নিরসন অতি-আবশ্যিকতার পর্যায়ে এসে গেছে। আমরা এই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করি।

৮

অটোমেশন প্রসঙ্গে

প্রযুক্তিবিপ্লব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই যুগকে বলা চলে স্বয়ংচল যন্ত্রের যুগ, "অটোমেশনের" যুগ। বিজ্ঞান প্রথম যখন কায়িকশ্রম লাঘবের উপায় আবিষ্কার করেছিল, সেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের যুগে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ বিদ্রোহ করেছিল। যন্ত্রকে মনে করেছিল পেশীর প্রতিযোগী। এই বিদ্রোহ বেশীদিন চলেনি; কিছু পরেই মানুষ বুঝলো যে, যন্ত্র পেশীর প্রতিযোগী নয়, সহযোগী ও সাহায্যকারী। আজ স্বয়ংচল যন্ত্র, বৌদ্ধিকশ্রম লাঘবের উপায় হিসেবে পরিগণিত হলেও, কিছু মানুষের মনে বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করেছে। এই বিরোধিতার রূপ ও কারণ আমাদের আলোচ্য।

বিরোধিতার দুটি রূপ প্রধানত আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম রূপটি হাজার হাজার ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ, দ্বিতীয় রূপটি কিছু সংখ্যক সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের লেখা মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র।

আধুনিক মানুষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাঁচার লড়াই করার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে যন্ত্রের দৌলতে। নিজের সৃষ্ট এক কৃত্রিম যন্ত্রজগতে তার অধিষ্ঠান। তার শ্রমশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ একজন

মানুষের এক ঘণ্টার শ্রম পাঁচশো বছর আগেকার পাঁচশো মানুষের বহু ঘণ্টার শ্রমের সমান। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে এই যন্ত্রচালিত শ্রমের সাহায্যে অল্প সময়ে সে প্রজাতির সবরকম চাহিদা মেটানোর দ্রব্যসম্ভার উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু উৎপাদনের চালিকাশক্তির মালিকের মরজিমাফিক উৎপাদন হচ্ছে। কাজেই প্রাচুর্য-সম্ভাবনার মধ্যে থেকেও বেশীরভাগ মানুষ আজও দারিদ্র্য ও অভাবক্লিষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাচুর্যের দেশ বলে খ্যাত আমেরিকায় স্বয়ংচল যন্ত্রের প্রসারের ফলে দারিদ্র্যের বোঝা, অভাবের তাড়না বেড়েই চলেছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী (হিসেবের বহু কারচুপি যার মধ্যে থাকতে বাধ্য) ১৯৫৮-৬৪ সালের মধ্যে শ্রমক্ষম মানুষের শতকরা ৫'২ থেকে ৬'৭ ভাগ বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে এই সংখ্যা, মনে হয়, আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বয়ংচলযন্ত্র ঐ দেশের শ্রমিকের কাছে বিধাতার অভিশাপ বলে পরিগণিত হতে বাধ্য। তিনজন লোক স্বয়ংচলযন্ত্রের সাহায্যে তিনশো লোকের কাজ চালাতে পারে। মুনাফাই শিল্প-মালিকের একমাত্র উদ্দেশ্য ; কাজেই দুশো সাতানব্বই জন কর্মচ্যুত হবেই। অটোমেশন যদি মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল করে, তবে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শ্রমিকদের অটোমেশন বিরোধিতার নিন্দা করা চলে না।

সাধারণ মানুষ আরো অনেক প্রশ্ন তুলতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা খাদ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের মানুষ আজো অনাহারে দিন কাটায় কেন ? ভিক্ষা-অন্নের উপর নির্ভর করে আছে কেন এশিয়া আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ ? এখনও, এই জ্ঞান সম্প্রসারণের যুগে, ইউনেস্কোর হিসেবে, সভ্য দেশের শতকরা ষাটজন নিরক্ষর কেন ? পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে প্রধানত মানুষ মারার বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কেন ? কম্পিউটার-সিবারনেটিক্সের কৃপায় মানুষ চন্দ্রলোকে পদার্পণ করছে ; কিন্তু অনুন্নত দেশে এখনও হাজার-হাজার মানুষ মহামারীতে প্রাণ হারায় কেন ? কেন বিজ্ঞানের যুগকে, প্রযুক্তিবিপ্লবের যুগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে সাধারণ মানুষ ? এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত উন্নত দেশের অদক্ষ, আধাদক্ষ শ্রমিক ও উন্নয়নশীল দেশের বেশীর ভাগ মানুষ অটোমেশনের বিরোধিতা করবেই।

সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের বক্তব্যে বিরোধিতার সুর ভিন্নতর।

যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করার ফলে মানুষ ক্রমশ শ্রমবিমুখ হয়ে উঠছে। এমন দিন আসবে যখন উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশীর ভাগ মানুষেরই কোনো অবদান থাকবে না, কোনো কিছু করণীয় থাকবে না। মানুষ অলস অপদার্থ হয়ে পড়বে, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। স্বয়ংচলযন্ত্র মানুষকে রবটে পরিণত করতে চলেছে। তার পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা মূল্যহীন হয়ে উঠছে। আজকের উৎপাদন যন্ত্রের অঙ্গবিশেষ মানুষ স্বাধীনতা হারিয়েছে, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আগামী দিনের মানুষ হবে পুতুলনাচের জীবন্ত পুতুল, যাদের পরিচালিত করবে নেপথ্য থেকে অল্প কয়েকজন যন্ত্রকুশলী নেতা। এই পুতুলদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, মতামত নিয়ন্ত্রিত করবে—এই সব নেতাদের পরিকল্পিত ও পরিচালিত রেডিও টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদ পরিবেশক যন্ত্র। অটোমেশনের যুগে মানুষের দৈহিক সুখ-সুবিধা, আধিভৌতিক সম্পদ যে-হারে বাড়বে, আত্মিক উন্নতি সেই হারে ঘটবে না। ফলে মানবতার মৃত্যু ঘটবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে অটোমেশন প্রবর্তনের বিরোধিতার কারণগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা চলে না। এই 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যের' সমাজে উৎপাদনের যন্ত্রাঙ্গ হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো পথ নেই। এখানে পেশী-শ্রম মস্তিষ্ক-শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন। পেশী-সংকুচন এবং পূর্ব নির্দিষ্ট ছকবাঁধা দেহের গতিভঙ্গী ও আন্দোলন যন্ত্রকে চালু রাখে, উৎপাদন অব্যাহত থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিককে নিজের বুদ্ধিযুক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। শ্রমিক জানেই না তার যন্ত্রে ঠিক কোন জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে; কেননা, হয়তো উৎপন্ন বস্তু গোটা জিনিষটার সামান্যতম ভগ্নাংশ। উৎপাদনের পরিকল্পনাতে শ্রমিকের কোনো অবদান নেই, উৎপন্ন বস্তুর ব্যবহারে তার কোনো অধিকার নেই, কাজেই কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ থাকে না। শ্রমের আনন্দ থেকে বঞ্চিত মানুষের জীবনও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। স্থূল জৈব প্রয়োজন মেটানো ছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এ ব্যাপারেও উদ্যমের, আন্তরিকতার ও আবেগের অভাব ঘটে। এখানেও যান্ত্রিক প্রাণহীনতা পরিলক্ষিত হয়। ভোগ্য-পণ্যের সমাজে হাজার হাজার যন্ত্রমানুষ পণ্যপূজায় মেতে ওঠে। কর্মস্থলের বাইরে তার জীবন প্রধানত এই ভোগ্যপণ্য ক্রয় ও স্থূল আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন। চিত্তবিনোদন এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাপকরাও মুনাফার শিকারী। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, থিয়েটার

সবই প্রায় 'মনোপলি'র কুক্ষিগত। আদিম রিপুর উত্তেজনা আনয়ন চিত্ত-বিনোদনের সহজতম ও লাভজনক উপায়। অভিনবত্বহীন সেই উপায়ে মানুষের চিত্তবিনোদন করা হয়। এইভাবে জীবন-স্রোতের সঙ্গে ক্ষীণতম সংযোগ রক্ষা করে মানুষ বেঁচে থাকে। সামান্যতম উদ্দীপনায় কামান্ধ, ক্রোধান্ধ হয়ে পশুর মত আচরণ করে। এইভাবে অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষার আংশিক তৃপ্তি ঘটে।

বিরোধী পক্ষের সব যুক্তিই বোধ হয় দেখানো হয়েছে। এইবার দেখা যাক্ অন্য পক্ষের অর্থাৎ অটোমেশনের সপক্ষে যাঁরা, তাঁদের বক্তব্য কি? মানবসভ্যতার প্রধান উপাদান আগুনের ধ্বংসক্ষমতা অপরিমেয় বলে কি মানুষ আগুনের ব্যবহার বর্জন করবে? অটোমেশনের সপক্ষে যাঁরা, তাঁরা প্রথমেই এইরকম প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রমেথিয়ুসের বিপক্ষ শিবিরে আজ কি কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে? চেয়ারের ধাক্কায় ব্যথা পেয়ে অনেক শিশু চেয়ার ভাঙতে চায়। বয়স্করা সেটা অনুমোদন করেন না। বিজ্ঞান-বিরোধী অটোমেশন-বিরোধীদের অজ্ঞান শিশু মনে করা যেতে পারে। প্রযুক্তিবিপ্লব এই শতকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এখনও অটোমেশন যুগের শৈশবাবস্থা; বিজ্ঞান অনেক নতুন নতুন যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। অদূরভবিষ্যতে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করবে এবং অটোমেশন, সিবারনেটিক্স সুষম সমাজ গড়তে মানুষকে উৎসাহিত করবে। মানবমুক্তির দ্বার আজ অবারিত, পথ উন্মুক্ত।

অটোমেশন ক্লান্তিকর একঘেয়ে শ্রম থেকে ক্রমশ মানুষকে অব্যাহতি দিচ্ছে। ছোট ছোট শিল্প-উৎপাদন কেন্দ্রের বিলোপ ঘটিয়ে শ্রম অপচয় রোধ করছে আধুনিক যন্ত্র। সব থেকে বেশী উপকৃত বোধ হয় আমেরিকার ও রাশিয়ার কৃষি-শ্রমিক। ঐ সব দেশে কৃষিকার্যে সত্যিই বিপ্লব ঘটেছে। বহু একঘেয়ে গৃহকর্ম যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করা যাচ্ছে, ফলে লক্ষ লক্ষ নারী সৃজনধর্মী শিল্পে নিয়োজিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। যে দেশের সমাজব্যবস্থায় শিল্প সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ক্রমবর্ধমান, যে দেশের সমাজব্যবস্থায় মানুষের জন্য পরিকল্পিত (মুনাফার জন্য নয়), সেই দেশ অটোমেশনকে স্বাগত জানাবে। অন্য দেশেও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে আগ্রহী সমাজতাত্ত্বিকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাকে বিধাতার আশীর্বাদ বিবেচনা করবেন। তাঁরা জানেন যে, অটোমেশনের

ফলে যারা কর্মচ্যুত হবে, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। উৎপাদনের বাইরেও অজস্র কর্মীর প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীর চাহিদা বাড়বে। অটোমেশনের যুগে, ব্যাপকভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে গবেষণার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্রমশ প্রকৃতি-বহির্ভূত বহু ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবার দরুন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ মিলবে। বৌদ্ধিক শ্রমের চাহিদা অটোমেশনের যুগে কায়িক শ্রমের চাহিদাকে ছাড়িয়ে যাবে, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র বাধার সৃষ্টি না-করলে অটোমেশনের ফলে বেকারী বৃদ্ধি পাবে না।

অটোমেশন যুগে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পেলেও যন্ত্র উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক-সংখ্যা বাড়বে। শ্রমিক মাত্রেই হবে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ। শ্রমকর্মে মস্তিষ্ক পরিচালনার প্রয়োজন বাড়বে। শ্রমের ফলাফল সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রম আর অবাঞ্ছিত মনে হবে না। অটোমেশন যুগের শ্রমিক আর যন্ত্রাঙ্গ থাকবে না, বরং যন্ত্রের উপর তাদের আধিপত্য-কর্তৃত্ব বাড়বে। দায়িত্বশীল বুদ্ধিবৃত্তিচালিত নতুন যুগের শ্রমিক তার শ্রমের মধ্যে নতুন সৃষ্টির আনন্দের স্বাদ পাবে। এযাবৎ মুলধন ও কায়িকশ্রম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতো, অটোমেশনের যুগে উৎপাদন প্রধানত বুদ্ধিভিত্তিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা-প্রভাবিত হবে। যন্ত্রের চেয়ে যন্ত্রবিদের অবদান হবে বেশি। উৎপাদন পরিকল্পনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, ফলে শ্রম-বিচ্ছিন্নতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অর্থনীতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের আধিপত্য ক্রমশ বাড়তে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষায়তন ও শিল্পোৎপাদনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। মস্তিষ্কশ্রম ও পেশীশ্রমের সীমারেখা বিলুপ্ত হবে, নারীর শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতা-অদক্ষতার পার্থক্য কমে আসবে। অটোমেশন উৎপাদনে প্রাচুর্য আনবে, সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের বৈষম্য দূর করার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অটোমেশনের যুগে পুঁজির প্রভাব না-কমলেও পুঁজিবাদী শ্রেণীর পরগাছাবৃত্তি আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে মানুষের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ দুইই হতে পারে। পারমাণবিক শক্তি ধ্বংস অথবা সৃষ্টি দুইই করতে সক্ষম। সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে কি ভাবে এই শক্তি

ব্যবহৃত হবে। যাঁরা বিজ্ঞান-বিরোধিতা করেন, তাঁরা এই সত্যটি সুকৌশলে গোপন করতে চান যে, সমাজব্যবস্থা মুনাফাভিত্তিক না-হয়ে কল্যাণভিত্তিক হলে বিজ্ঞানের প্রয়োগে কোনো অকল্যাণ ঘটার সম্ভাবনা নেই। উৎপাদনের উপায়-পদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রভাবে ক্রমশ সামাজিক চরিত্র লাভ করেছে, কিন্তু উৎপাদনের মালিকানার চরিত্র রয়েছে অপরিবর্তিত। উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেখানে কয়েকটি মালিক-গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে অটোমেশনের তথা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে জনকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের সম্ভাবনাই বেশি। আমেরিকার মত দেশে রাষ্ট্রপরিচালকরা মালিক-গোষ্ঠীর প্রভাবাধীনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট এবং আক্রমণমুখী। জনকল্যাণ গোষ্ঠীকল্যাণের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত। এই সব দেশে প্রযুক্তিবিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে, কাজেই এই সব দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে বিজ্ঞান-বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

সব সমাজবিজ্ঞানীই অটোমেশনের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করছেন, একথা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। প্রযুক্তিবিপ্লব ও অটোমেশনকে স্বাগত জানিয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী সুকৌশলে স্থিতাবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। প্রযুক্তিবিপ্লব, তাঁরা বলছেন, সবরকম সামাজিক সমস্যার সমাধান ঘটাবে। দারিদ্র্য দূর হবে, বেকারী থাকবে না। অটোমেশন ও পারমাণবিক শক্তির প্রভাবে সমাজব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর ঘটবে। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন আর থাকবে না; ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার-পরিবর্তনের দাবী আর উঠবে না। "Battles will be waged in the corridors of power, and memorandums will be flowing instead of blood."। পুঁজিবাদের আওতায় সব সমস্যার সমাধান ঘটবে, সমাজতন্ত্রের দাবী ও আন্দোলন হয়ে যাবে নিরর্থক। এঁদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা খুব কঠিন। প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকার চিত্র ও পরিসংখ্যান এই দাবীর অসারতাই প্রমাণ করবে। আড়াই কোটি লোক সেখানে দারিদ্র্য-পীড়িত; আর্থিক, পরমার্থিক, রাজনৈতিক, সকল ব্যাপারেই এখনও সেখানে একচ্ছত্র পুঁজির আধিপত্য; সমাজবিমুখ সমাজবিরোধী বিচ্ছিন্ন-বাদীর সংখ্যা সেখানে ক্রমবর্ধমান। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রধানত অস্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত, সামরিকখাতের ব্যয়বরাদ্দ জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর সম্প্রসারণের

প্রধান অন্তরায়। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিপ্লব ঐ দেশে সুষম সমাজ গড়ে তুলবে, বৈষম্য-দারিদ্র্যপীড়িত নিগ্রো ও অন্যান্য জাতির কল্যাণ ত্বরান্বিত করবে,— এই আশা করা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অদক্ষ 'ব্লু কলার' শ্রমিকের বদলে দক্ষ 'হোয়াইট কলার' শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেই সমাজ পালটায় না। উৎপাদনে শ্রমিকের চেয়ে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়লেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্য দূর হয় না। অটোমেশন ও অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে, তার কিছুটা অংশ হয়তো রাষ্ট্রের মারফত কল্যাণকার্যে ব্যয়িত হচ্ছে; কিন্তু এর ফলে মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বহুক্ষেত্রে বেকার শ্রমিকের বিক্ষোভের ভয়ে অটোমেশনের ব্যবহার সঙ্কুচিত করতে হচ্ছে, বিজ্ঞানের গবেষণার উৎসাহ কেবলমাত্র সামরিক ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখা হয়েছে, মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যাপারেই শুধু উন্নততর প্রযুক্তিকৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞান-কর্মীর গবেষণা প্রধানত মনোপলির ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে, তাঁদের স্বাধীনতা সীমিত রাখা হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল অনেকক্ষেত্রে তাঁরা জানতেও পারছেন না। কারখানার শ্রমিকদের মত বিজ্ঞানীরাও ক্রমশ নিজেদের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে চেতনা বাড়ার দরুন স্থিতাবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিজ্ঞানীদের একাংশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। অটোমেশনের প্রয়োগ-বৃদ্ধির ফলে আপনা থেকে সামাজিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। বিজ্ঞান-বিরোধীদের প্রভাব প্রাচুর্যের দেশে বেড়েই চলেছে এবং আমূল সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার অসম্ভব মনে হচ্ছে। অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায়, ঐ দেশে অটোমেশনের ফলে দ্বন্দ্ববিরোধ নিরসনের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমেরিকার মত দেশ অটোমেশন ও প্রযুক্তিবিপ্লবের অন্যান্য যন্ত্র কেবলমাত্র সমরাস্ত্র উৎপাদনে অব্যাহত ভাবে ব্যবহার করতে পারে। তার ফলে রাষ্ট্রনেতারা যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে এবং কিছু সমাজতান্ত্রিক জঙ্গী মনোভাব প্রচার করতে তৎপর। ঐ দেশের একজন সিবারনেটিক্স-বিজ্ঞানী তাই হতাশার সঙ্গে বলেন: The downfall of our time lies in the fact that the magic forces of modern automation serve to produce even bigger profits or are used to unleash a nuclear war with its apocalyptical horrors.। আর একদিক দিয়ে অটোমেশন প্রয়োগের

সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন ঐ দেশের উৎপাদন-মালিকরা। নতুন-নতুন ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি এবং ঐ অপ্রয়োজনীয় পণ্যের কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি করে মালিকগোষ্ঠী অটোমেশন ব্যবস্থা চালু রাখতে প্রয়াস পাচ্ছেন। অটোমেশন ও প্রযুক্তিবিপ্লবের ফল কাজে লাগিয়ে উৎপাদনবৃদ্ধি করছেন এমন সব জিনিষের যা আমেরিকাবাসী শুধু সম্মান বাড়াবার জন্য কিনে চলেছে। অটোমেশনের ফলে ভোগ্যপণ্যের প্রভুত্ব বেড়েছে, পণ্যপূজা শুরু হয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে কমোডিটির ক্রীতদাস। আমেরিকার একজন প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ্ অধ্যাপক গ্যালব্রেথ ("The Affluent Society"-র লেখক) একথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সহযোগী-সহকর্মীদের অনেকের মানসিকতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সমকালীন উৎপাদন ব্যবস্থা (অর্থাৎ তার মালিকদের) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পণ্যউৎপাদকদের প্রচারবিভাগ সুকৌশলে আমেরিকার মানুষের মনে তার অর্থহীন ক্রমবর্ধমান ক্রয়-ইচ্ছা জীইয়ে রাখছে। উদ্দেশ্য, বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা। "The cult of comfort and personal service is counterposed to the supreme human values, to what elevates man above the animals."

অটোমেশনবিরোধী আর এই সব অটোমেশনভক্ত একই ধরনের মানসিকতায় আচ্ছন্ন। হয় এঁরা উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে চান। এঁরা বুঝতে চান না যে, প্রযুক্তিবিপ্লবের ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দায়-দায়িত্ব, পরিকল্পনা ইত্যাদি সব ব্যাপারই সরকারী আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হতে চলেছে। আজকের বিজ্ঞানীদের অবস্থা অনেকটা সেই রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান গ্রীক ক্রীতদাসের মত। ইংলণ্ডের একজন প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক বার্ণাল এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। নরবার্ট ওয়াইনার (Norbert Wiener) লিখেছেন যে, "that life under these conditions converts many of them into eunuchs in the harem of ideas to which their Sultan is wedded."

যদি উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে স্থগিত রাখা হয় তবে প্রযুক্তিবিপ্লব মাঝ পথেই থেমে যেতে বাধ্য হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হবে এবং আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পণ্যপূজার উৎসব

শুরু হবে (আমাদের দেশে এখনই তার স্থচনা দেখা দিয়েছে), ছোট-ছোট রাষ্ট্রগুলিতে সমরাস্ত্র উৎপাদন ও জঙ্গী মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। প্রযুক্তিবিপ্লব নতুন যুগের স্থচনা করেছে, নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। এই যুগকে আবাহন করার ও নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক গড়ে তোলার উপযোগী সমাজব্যবস্থা স্থষ্টি করা দরকার। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাবে না, এইরকম উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সোভিয়েতে ১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি শতকরা ১৮৭ ভাগ বেড়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে কারখানা ও অফিস কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে ১০৪% এবং শিল্প উৎপাদন ৪৪৮%। এবং এর পরেও নাকি "Jobs were looking for workers।" একজন ফরাসী সাংবাদিক সোভিয়েতে অটোমেশন প্রয়োগ প্রসঙ্গে ফরাসী 'La Vic Ouvriere' পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন: "This is a revolution that is only beginning. It inspires even greater respect for man and his intellect—man who is not content with the mastery of production but who orders the course of economic and social development and his own future." শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সোভিয়েত দেশের শ্রমিকরা অটোমেশনকে সত্যিই স্বাগত জানিয়েছে। কেননা তারা অটোমেশনের ফলে ছাঁটাই হবে না জানে। কম পরিশ্রমে বেশি আয়ের পথ খুলে দেবে অটোমেশন,—এ বিষয়েও তারা স্থনিশ্চিত। তাছাড়া, অবসর সময়ে আত্মিক উন্নতির অনেক স্থযোগ তারা পাবে।

প্রযুক্তিবিপ্লব কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যের স্থষ্টি করে মানুষের ভোগস্পৃহা বাড়াবে, এ ধারণা ঠিক নয়। একজন সোভিয়েত এ্যাকাডেমিশিয়ান বলেছেন, "The technological revolution places new demands on man, on his personality. On the basis of these demands it may be said that the society, which achieves a higher standard of education will in the future assume the same position as was once held by the countries with the richest natural sources, and later by countries with the

greatest industrial potential."। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শিল্পোন্নত দেশগুলির কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকার দিন শেষ হয়ে আসছে, এই নতুন বিপ্লবের ফলে।

সমাজতন্ত্র শ্রমদাস প্রথার অবসান ঘটাবে। আর অটোমেশন মানুষকে মুক্ত করবে। "Automation carries the process further—it breaks the fetters tying the worker to the machine, does away with the repetitive, fragmented labour, helps to erase the distinction between mental and manual labour."

৯

শিল্পী-মানসে সমকালীন বিরোধের প্রতিফলন

ব্যক্তিসত্তার অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা দূর করবার প্রয়াস থেকে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি; আংশিকভাবে হলেও কথাটা সত্যি। পূর্বপুরুষদের চেষ্টা ছিলো যাদুর সাহায্যে নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে বশ করা। যাদু সেদিন ছিলো হাতিয়ারেরই সামিল, অথচ তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী আয়ুধ। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প— এ-সবেরই মূলে যাদুবিদ্যা। গোষ্ঠীর হিতের জন্যই যাদুবিদ্যার প্রয়োগ হতো, শিল্পের প্রয়োগ ছিলো গোষ্ঠীস্বার্থে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ যত বিকশিত হতে থাকে শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্যও তত জটিল হতে থাকে। গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ব্যক্তিমানসে আসে অসহায়ত্ববোধ;—নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটে। সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন এসে পড়ে। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। আবার গোষ্ঠী-নিরাপত্তার ও গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মীভবনের ইচ্ছাও সাহিত্যে প্রকাশ পায়।

শ্রেণীসমাজে শিল্প-সাহিত্যের রূপ জটিলতর হয়ে উঠলো। মানবগোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ যতই প্রকাশ্য ও তীব্র হয়ে উঠলো, সাহিত্যেও এই বিরোধ ততই প্রকাশ পেতে থাকলো। সাহিত্যিকের সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করলো। একদিকে বহির্বাস্তব (প্রকৃতি ও সমাজ) থেকে

বিচ্ছিন্নতার বেদনা, অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার আত্মবিকাশের তাগিদ—এই দুই বিপরীতমুখী ভাবধারার সংঘাতে শিল্প-সাহিত্যে দেখা দিলো দল-মত-পথের সংঘর্ষ ও প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দ্রুত শিল্পায়ন, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, ইত্যাদির মারফত ব্যক্তিত্ব উন্মেষের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করেছে আবার বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাপক ও গভীরতর করে ব্যক্তিমানসে এনেছে উদ্বেগ ও অশান্তি। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ—এই দুই প্রবণতা আজকের সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শিল্পী নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে মাঝে-মাঝে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলছে, আবার কোনো-কোনো সময়ে প্রখর ব্যক্তিচেতনা নিয়ে শিল্পসৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সমাজব্যবস্থাকে ও ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পাচ্ছে।

সব অবস্থাতেই শিল্পী কিন্তু আত্মসচেতন। অবশ্য চেতনা পূর্বশর্ত-নির্ধারিত ও পূর্বশিক্ষা-সাপেক্ষ। এই প্রক্ষোভ-উত্তেজনার (emotional excitation) বশে নিজেকে হারিয়ে ফেলা মানে নির্জ্ঞান-প্রভাবিত হওয়া নয়: "For make no mistake about it, work for an artist is a highly conscious, rational processs at the end oi which the work of art emerges as a mastered reality—not at all a state of intoxicated inspiration"—বলেছেন একজন আধুনিক বিশ্বখ্যাত সমালোচক। মনোবিজ্ঞানের এ-কূট আলোচনার স্থান অন্যত্র।

বিচ্ছিন্নতার প্রথম পর্বে শিল্প-সাহিত্যে যে ব্যক্তি বা অহংবোধের প্রকাশ, তার মধ্যে কিন্তু সমাজচেতনা, গোষ্ঠীচেতনার প্রভাব পরিস্ফুট। 'সাবজেকটিভিজম' সব সময়েই নিছক আত্মরতি বা আত্মস্তুতি নয়। আফ্রোদিতের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতায়, দেবতাদের তুষ্ট করার প্রার্থনা-সঙ্গীতে বাস্তবকে প্রভাবিত করার আদিম যাদুমন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সে-কবিতায় মাত্রা, ছন্দ, মিল—যাদু-প্রকরণের সব উপাদানই থাকে। ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্যর্থতাবিদ্ধ মানুষ যতি-মাত্রা-ছন্দ মিলিয়ে তার যন্ত্রণা প্রকাশ করে যখন, তখন বুঝতে পারি সমষ্টির প্রতি আনুগত্যই তার লক্ষ্য, সমবেত ঐকতান সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতার বিলোপই তার উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক প্রয়োজনের তাগিদেই গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ব্যক্তি,

যাতুকরের মায়াদণ্ড ধীরে-ধীরে শিল্পীর তুলি আর সাহিত্যিকের লেখনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতা-বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে তার সঙ্গীতে; তার শিল্প-সাহিত্যে 'আমিত্বে'র বিকাশ ঘটেছে। সমবেত কণ্ঠের ঐকতান টুকরো-টুকরো হয়ে স্বানুভূতির বৈচিত্র্য-সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমকুশল হাতের যাদু-স্পর্শে হাতিয়ারের শক্তি ও বৈচিত্র্য যত বেড়েছে, সমষ্টি থেকে ব্যক্তি তত বেশি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে গোষ্ঠীকে, সমাজকে সে প্রতিফলিত করেছে। গোষ্ঠী-চেতনা, সমাজ-চেতনা একেবারে লোপ পায় নি; সহজাত প্রজাতি-সংরক্ষণ-প্রবৃত্তি অমর প্রেম-সঙ্গীতে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

আজ বিচ্ছিন্নতার এই বিস্তার-পর্বে প্রেম-স্ফুলিঙ্গ কি ব্যক্তি-মানসে সংরক্ষিত? উপযুক্ত দাহ্য পরিবেশের সংস্পর্শে আগুন ও উত্তাপ বেরিয়ে আসবে কী? কঠিন ও হিমশীতল ব্যক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কতখানি?

অতি-আধুনিক সাহিত্য-শিল্পে একটি বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট। বিচ্ছিন্নতার বিশ্লেষণ ও কারণ নির্ণয়ে আজ ব্যক্তি অন্তরলোকে প্রবিষ্ট। বহির্বিশ্ব আজ তার কাছে সঙ্গতিহীন, অর্থহীন; তাই অর্থ-সঙ্গতি সে খুঁজতে চায় গভীর চিত্তলোকে।—সেখানেও সে দেখেছে দুর্বোধ্য জটিলতা। কাজেই তার কবিতা আজ দুর্বোধ্য, তার গল্প-উপন্যাসে মানবিক-সম্পর্ক-রহিত অবাধ-ভাবানুষঙ্গ; তার শিল্প বস্তুহীন, বিমূর্ত; তার নাটক আজ এ্যাবসার্ড, উদ্ভট। সমষ্টির সঙ্গে একাত্মীভবনের আকুতি নেই, কেননা একাত্মীভবন অসম্ভব অথবা অর্থহীন,—ব্যক্তিকে নিরাপত্তা ও আশ্বাসদানে অক্ষম। ব্যক্তি-সঙ্গীত কোনোদিন ঐকতানে মিলিত হবে, এ-সম্ভাবনা বিরল। আঙ্গিকে নানাবিধ চাকচিক্যময় চাতুর্য; আর বিষয়বস্তুতে হতাশা, ভয়, পাপবোধ, উদ্বেগ ও মানবিক বিশৃঙ্খলার পরিচয়। আজকের সাহিত্য-শিল্পে শুধু বীতস্পৃহা নয়, জীবনবিরোধের সুরই প্রধান। সমাজ-বিরোধ জীবন-বিরোধে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং সমাজের দুষ্টক্ষতগুলোর পরিবর্তে মনের ক্ষতের দিকে সাহিত্যিকের নজর পড়েছে। কিছুদিন আগেও খণ্ডিত সত্তার অসহায় আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে সমষ্টিতে বিলীন হবার আকুলতা ছিলো। আজ তার পরিবর্তে স্পর্ধিত গগনচুম্বী আত্মস্ফীতি ও অহংকার। ব্যক্তি-সম্পূর্ণতার সুস্থ লক্ষণের পরিবর্তে অসুস্থ মেগালোম্যানিয়ার[১] প্রকাশ।

---

১ মেগালোম্যানিয়ার রোগীর মধ্যে থাকে অহংবোধের প্রচণ্ডতা। বিচ্ছিন্ন অহং

মানবসমাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিশ্বাসকে, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর হতাশাকে, মানসিক হীনমন্যতাকে ঢাকবার জন্যেই এই আত্মম্ভরিতা। অথবা অন্যদিকে, নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়ে স্কিজোফ্রেনিক[২] অসঙ্গতির প্রকাশ।

অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিচ্ছিন্নতার অভিব্যক্তিকে মানসিক অসুস্থতার বা অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক বলে আজকের বুদ্ধিজীবি স্বীকার করতে চান না। মানসিক অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকত্ব এতই ব্যাপক যে, এটাই স্বাভাবিকত্বের পর্যায়ে পড়েছে, সুস্থ বা তৃপ্ত মানুষকেই বরং আজ অস্বাভাবিক বা অসুস্থ বলা চলে। সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বিধ্বস্ত। শ্রদ্ধা নেই অতীতের প্রতি, বিশ্বাস নেই ভবিষ্যতে। দুর্বোধ্য বর্তমানের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াই আমাদের অদৃষ্ট। মধ্যযুগের অদৃষ্টবাদ আজ নতুন রূপ নিয়েছে। মানুষের ভাগ্য আজ যন্ত্র-দেবতা নিয়ন্ত্রিত। শ্রম, বুদ্ধি বা বিচারশক্তির উপর আস্থা হারিয়েছে আজকের মানুষ। আজকের সাহিত্যে আছে আত্মগ্লানি, সমবেদনাহীন বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ অথবা মনসমীক্ষামূলক আত্মসমালোচনা। মহৎ ট্রাজেডির বেদনাময় বিশোধনের পরিবর্তে দেখি ষ্টোইক[৩] ঔদাসীন্য। সেকালে যাদের অসুস্থ বা নিউরোটিক বলা চলতো, আজকের সমালোচক তাদের নতুন সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। 'আউটসাইডার' কথাটা আজ শিল্পে-সাহিত্যে এক বহু উচ্চারিত ও সম্মানিত অভিধা। 'চৈতন্যস্রোত' প্রবক্তার দল থেকে অতি

যতই অসহায় বোধ করে ততই নিজেকে বলীরাজার মতো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত বলে মনে করে। হিটলারকে এ-যুগের প্রথমশ্রেণীর 'মেগালোম্যানিয়াক' বলা চলে!

২ বহির্বাস্তবের বিরোধকে স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী অন্তর্লোকে প্রতিফলিত দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও স্বৈরতান্ত্রিক মুনাফা আত্মসাতের মধ্যে যে স্ব-বিরোধিতা, খণ্ডিত-সত্তা স্কিজোফ্রেনিক রোগীর মধ্যে তারই প্রকাশ। আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষ করে কাব্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যেকার অসঙ্গতিকে স্কিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ বলা চলে। এই বিরোধ যত তীব্র হবে, কবি ততই নিজেকে গুটিয়ে আনবে। স্কিজোফ্রেনিক রোগীর মতো দুটো কি একটা এক স্বরবিশিষ্ট শব্দ দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা হয়ত করবে অদূর ভবিষ্যতে।

৩ স্টোইক: গ্রীক দার্শনিক জেনোর মতাবলম্বী দার্শনিক—সুখ-দুঃখে যিনি নির্বিকার।

আধুনিক উদ্ভটত্বের ধ্বজাধারীরা আজকের প্রগতি-সাহিত্যের শিবিরে অনুপ্রবিষ্ট বা সমাদৃত। সমাজতান্ত্রিক দেশের ভিসাও আজ আর এদের কাছে দুষ্প্রাপ্য নয়। আজ 'conscience' বা 'commitment' প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সমস্যা নয়। বিবেকের নির্দেশে কোনো বিশেষ আদর্শ-অনুপ্রাণিত, বিশেষভাবে প্রতিশ্রুত মানুষ সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয় : "The problem of our age is not a problem of conscience or commitment....The problem is rather why people who have no personal conviction of any kind allow themselves to suffer for indefinite or undefined causes, drifting like shoals of fish into invisible nets. The problem is mass-suffering, mute and absurd...." স্যার হারবার্ট রীডের এই উক্তির মধ্যে জর্জ অরওয়েল ও আলডু হাক্সলীর কয়েক দশকপূর্ব জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এরা, এই আনকমিটেড জনসাধারণ স্বাধীনতা চায়, অথচ স্বাধীনতা কি-জিনিস, তারা জানে না।[৪]

এই যুগলক্ষণগুলি আজকের দিনে প্রত্যক্ষ ও নিঃসন্দেহে স্পষ্ট। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে সাহিত্যে যে-অঙ্কুর দেখা গিয়েছিলো, আজকে সে-অঙ্কুর বিরাট মহীরুহের রূপ নিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বাঁধ ভেঙে মার্কসবাদীদের মনেও শিকড় ঢুকিয়েছে এই মহীরুহ। এদের সমস্যাই আজ যুগ-সমস্যা বলে বিবেচিত। 'পজিটিভ হিরো' আজ উপহসিত। নেতিবাচনই আজ সর্বজনগ্রাহ্য

---

৪ আধুনিক ব্রিটিশ নাট্যকারদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে : But it is perhaps sign of the times, and no mere coincidence, that they should all share the same basic theme : the undermining of order by chaos—to put it one way—or the revolt articulate or inarticulate, intelligent or instinctive, of the individual against any social framework। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যামুয়েল বেকেটের এই লাইনগুলো তুলে ধরা যায় : But what matter whether I was born or not, have lived or not, am dead or merely dying. I shall go on doing as I have always done, not knowing what it is I do, nor who I am, nor where I am, nor if I am.

রসভাষন। জনারণ্যে নিঃসঙ্গ মানুষের স্বগতোক্তিই আজ আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বিমূর্ত শিল্পই আজ শিল্পোৎকর্ষের চরম পরিচয়।

স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে : এসব কিসের সূচনা ? এই প্রবণতা শুভ না অশুভ ? এই নেতিকরণের নেতিকরণসূচক কোনো ইঙ্গিত সমাজে বা শিল্প-সাহিত্যে পরিদৃশ্যমান কিনা ? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে অতি আধুনিক যুগের সমস্যা ও বিরোধ কিভাবে শিল্পীমনকে প্রভাবিত করছে, তার অনুসন্ধান দরকার। কারণ জানলে নিরসনের উপায় মিলবে।

প্রথমত : একদিকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযুগে প্রযুক্তিবিদ্যার সমুন্নয়ন ব্যক্তিকে শুধু সমাজ থেকে নয় আত্মসত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে, আবার অন্যদিকে সরকারী ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রচারযন্ত্র মানুষের মনকে একইভাবে অভিভাবিত করে তাকে 'ম্যাস-ম্যানে' পরিণত করেছে। শিল্পীর স্পর্শকাতর মন এই দুই বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দ্বিতীয়ত : জাতীয় সমস্যা, সংক্রমণ-সংকট (crisis of transition) একদিকে ব্যক্তিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং জাতির পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলছে, আবার অন্যদিকে ক্রমসংকোচনশীল পৃথিবীতে পরস্পর নির্ভরশীল দেশ ও জাতির দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাগর্ব ও গণ্ডী ভেঙে পড়ছে। এক নতুন আন্তর্জাতিকতা ও বৈজ্ঞানিকমানবতাবোধে আবিষ্ট মানুষ নতুন আন্তর্মানবিক সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতে চাইছে।

তৃতীয়ত : আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দুই বিপরীত মেরুতে ছুটে চলেছে মানুষের কল্পনা। একদিকে লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ-দূরবর্তী লক্ষ সূর্যের তেজ ও আকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্রসমূহে অবাধ পরিক্রমা ; অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে বিভাজনক্ষম নতুন-নতুন মৌল কণিকার সঙ্গে অবাক-পরিচয়।

চতুর্থত : পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার সর্বজনবিধ্বংসী সম্ভাবনার বিপরীতে রয়েছে অসীম শক্তির সাধক ও পরিচালক মানবজাতির জরা-মৃত্যুজয়ী অভিযান-সম্ভাবনা।

পঞ্চমত : একদিকে অতি প্রাচুর্যের অধিকারী ঐশ্বর্যস্ফীত স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবানের আস্ফালন, অন্যদিকে অনশনক্লিষ্ট অসংখ্য শীর্ণ আতুরের মৌন আবেদন।

বহির্বাস্তবের এসব বৈপরীত্য ও বিরোধ নিশ্চয়ই মানুষকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত

করছে।—কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিককে অনেক বেশি প্রভাবিত ও অস্থির করছে তার তথাকথিত অতি-বিজ্ঞাপিত 'অস্তিত্ব-সংকট'। পশ্চিমী দুনিয়ার পুরনো ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ আজ নিশ্চিহ্ন। তাই জন্ম-মৃত্যুর অন্তর্বর্তী অস্তিত্ব তার বিপন্ন। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির দৃষ্টিতে মানুষ তার জৈবধর্মের থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। দেহধর্মের দিক থেকে পশুর থেকে সে অভিন্ন, আবার অন্যদিকে তার মানসিকতা, তার বিচার-বুদ্ধির দরুন সে পশুত্বকে অতিক্রম করতে চায়। এখানে বেধেছে তীব্র বিরোধ। তার বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি সৌন্দর্যবোধ যত বাড়ছে, মানুষ নাকি ততই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসুখী হচ্ছে। আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অসহায়ত্ববোধ তীব্র হচ্ছে। মৃত্যুর মধ্যে আত্মবিলোপের ভীতি তাকে অস্থির করে তুলছে। "Reason, man's blessing is also his curse, it forces him to cope everlastingly with the task of solving an unsolveble dichotomy."। অস্তিত্বের সমস্যা আজকের মানুষের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা। বাঁচতে হলে এ-সমস্যার সমাধান তাকে করতেই হবে। আবার এ-সমস্যার সমাধানের উপায়ও তার নেই। দেহ-মনের বিচ্ছিন্নতার সমাধান কোথায়? জৈব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ ও জৈব-প্রকৃতিকে অতিক্রম—একই সঙ্গে সম্ভব নয়।

এই নিও-ফ্রয়েডিয়ান জীবনবাদ আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে জীবন-বৈরিতা ও উদ্ভটত্বের জনক। অস্তিবাদী দর্শন আর ফ্রয়েডীয় বিকারতত্ত্ব দ্বারা আধুনিক সাহিত্যিক বিশেষভাবে প্রভাবিত।

ফ্রয়েডীয় এই জীবনবাদ কেন আজ আচ্ছন্ন করেছে শিল্পী-সাহিত্যিককে? কেন আজ মানুষকে দেখি না তার দেশ-কালের অবস্থিতির বিন্দুতে? কেন শিল্পীর তুলিতে বাস্তব মূর্ত হয়ে ওঠে না আজ? কেন আজ 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর দেশে কামু-কাফকাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা? কেন বেকেট, ইয়োনেস্কো ও বীটনিকদের এই প্রতিপত্তি? কেন আজ আমাদের দেশের প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী পত্রিকার পাতায় শিল্পীমনের ক্রিয়া প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় অবচেতনের বিস্তার, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বাহক পল ক্লী-র উদ্ধৃতি? মননশীল (?) পত্রিকার পাতায় ভাববাদের ধ্বজাধারী মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিকের প্রশস্তির কারণ কী?

একগুলি 'কেন'র উত্তরে একটি যুক্তি বোধ হয় অনায়াসেই উপস্থাপিত করা যায়। যুক্তিটি পুরণো হলেও ঘাতসহ: বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পায়নের

দ্রুততার সঙ্গে সমাজ-চেতনা সমানভাবে চলতে পারছে না। কাজেই বিচ্ছিন্নতার পরিধি ও গভীরতা বেড়েই চলেছে। বাস্তবকে আজ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিধির মধ্যে সীমিত করা চলছে না। গ্যালিলিও কোপারনিকাস, নিউটনের জগৎ থেকে আজকের রিলেটিভিটি, কোয়াণ্টাম ও এ্যাটমের জগৎ গুণগত ভাবে পৃথক। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানীর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে-জগৎ শুধু বিমূর্ত গাণিতিক পরিভাষার জগৎ। সামাজিক চেতনা ও আয়ত্ত প্রযুক্তিকৌশলের মধ্যে সামান্যতম অনৈক্য সর্বনাশের কারণ হতে পারে। রাডারের পাশে বসে আছে যে-ব্যক্তি, পারমাণবিক বোমার ফিউজ যার হাতে—তার সামাজিক চেতনা ও শুভবুদ্ধির অভাব, কিম্বা মুহূর্তের ভ্রান্তি পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত ডেকে আনতে পারে। মানুষের ভবিষ্যৎ আমাদের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত কোনো দৈবশক্তির উপর যেন নির্ভর করছে।

এ-ছাড়া পরমাণুর জগতে বিপরীতধর্মী বস্তুকণার ক্রম-আবিষ্কার শিল্পী-মনকেও প্রভাবিত করছে। বর্তমানের সব কিছুর 'য়ান্টি' বা বিপরীতধর্ম সে আরোপ করতে চাইছে শিল্প-সাহিত্যে। য়্যান্টি-নভেল, য়্যান্টি-ড্রামার মধ্যে য়্যান্টি-ম্যান স্থষ্টির চেষ্টা চলেছে: 'I know that some bourgeois wirters in the west are trying hard to create an antipode to man—an antiman. Inhumanity and cynicism are counterposed to humanism. I am horrifed by the thought of a shrunken, contradictory, passive, anti-hero, a destroyed split-personality that has no strength left to fight its 'minus''। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্রুততার সঙ্গে, তথ্য ও জ্ঞানের সঞ্চয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতি সমানতালে চলতে পারছে না। অজস্র নতুন-নতুন তথ্য প্রতিদিন বিজ্ঞানীর ভাণ্ডারে জমছে, কিন্তু তার অনুরূপ চিত্রকল্প শিল্পীর মনে তৈরী হচ্ছে না। নতুন তথ্য-জ্ঞানের সম্যক ধারণা সময়সাপেক্ষ, আর চিত্রকল্পের উন্মেষ বস্তুর বা তথ্যের সঠিক ধারণার উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী আজ পৃথিবীকে চালনা করছেন। কিছুদিন আগেও একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন ভাবজগতের অধিবাসীরা। রোমাঁ রোলাঁ, বারবুস ও গর্কির স্থান নিয়েছেন যুদ্ধোত্তর যুগে জোলিয়েট কুরি ও বার্নাল প্রমুখ বিজ্ঞানী। সাহিত্যিক তার আত্ম-বিশ্বাসে আজ বিজ্ঞানীর মতো অটল নয়। সর্বজনমান্য সাহিত্যিক আজ নেই

বললেই চলে। সাহিত্য-শিল্পে ক্ষিপ্ততার প্রকাশ এই সিংহাসন-চ্যুতির ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত নয় কী ? স্বীকার করতে হবে যে, শিল্পসাহিত্যের প্রভাব ক্রমক্ষীয়মান। মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের বিস্ময়ানুভূতি উদ্রেক করছে মহাকাশ-যাত্রা, যান্ত্রিক মস্তিষ্ক। জীবনকে জানবার জন্য আজ আর কবিতাপাঠ নয় ; দর্শন-বিজ্ঞানের কাছে জীবনের অর্থ কিম্বা অস্তিত্ব-সংকটের ব্যাখ্যা খোঁজা সিরিয়স পাঠকের ধর্ম। চিত্তবিনোদনের জন্য আছে সিনেমা, রেডিও টি-ভি, অথবা ওদের স্বগোত্র হালকা জিনিস। বিজ্ঞান সর্বজন-স্বীকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সাহিত্য জাতি-শ্রেণী-গণ্ডীর সীমা ভেঙে অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে সর্বজনীন হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এ-যুগের পাঠকের মনকে ঠিক মতো বুঝতে পারছেন না শিল্পী ও সাহিত্যিক। মানসিক পরিবর্তনের গতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে গভীরতাকে বর্জন করছেন, কিম্বা গভীরে প্রবেশ করে পরিবর্তনকে অস্বীকার করছেন। ইলিয়া এরেনবুর্গের কথায় বলা চলে : The literature and art of today have not yet embraced these tremendous changes which have already occured in the spiritual world of the reader and the spectator। পাঠকের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে, আজকের সাহিত্যিক দিশেহারা।

কিন্তু এ-থেকেও সম্পূর্ণ উত্তর আমরা পাচ্ছি কী ? বুদ্ধি-অনধিগম্য, নিয়ন্ত্রণা-তীত, বহির্বাস্তব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্তরর্লোকে অবতরণ করে কি দেখছি ? ব্যক্তি-নির্জ্ঞান ও সমষ্টি-নির্জ্ঞান দ্বারা বোধশক্তি ও চেতনা প্রভাবিত, পরিচালিত। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও কোনোরকম স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি আমাদের নেই। বহির্জগৎ যন্ত্রদানবের অধীন আর অন্তর-জগৎ নির্জ্ঞান-অধ্যুষিত। ইচ্ছা ও ব্যবহারের স্বাধীনতা আমলাতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আর চিন্তার স্বাধীনতা জৈব-প্রবৃত্তি পরিচালিত। আমরা অসহায়, অক্ষম, অপদার্থ। আত্মসৃষ্ট জগতে আমরা বন্দী। এই ব্যক্তি-মানস সমীক্ষা, আত্মবিদ্ধির নামে আত্মপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রাতিগ-শক্তি-উৎক্ষিপ্ত ব্যক্তি আজ সমাজ-সম্পর্ক-রহিত, আত্মরতি-মগ্ন। ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা ছেড়ে সে অবাধ ভাবানুষঙ্গের আশ্রয় গ্রহণে তৎপর।

এবার অন্য প্রশ্ন উঠবে, মানুষকে আজ 'সোশ্যাল বিইং' মনে না-করে শুধু 'সাইকোলজিক্যাল বিইং' হিসেবে গণ্য করার কারণ কী ? মার্কসবাদসম্মত

প্রতিফলন-তত্ত্ব দিয়ে মানসিকতার বিচার না-করে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্বের দিকে প্রবণতা কেন? এর ফলে, মানুষকে জড়যন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়াশীল ও নিয়মানুগামী মনে করায়—প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যই সাধিত হচ্ছে না কী? বিচ্ছিন্নতার কারণ ঐতিহাসিক নয়, স্বাভাবিক—নিও-ফ্রয়েডীয় এই প্রচার নৈরাশ্যবাদকে পোষিত করছে ও প্রগতিকে ব্যহত করছে বলে মনে হয় না কী?

আমার মনে হয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর যুগের প্রথম দিকে ব্যক্তিমানসের দিকে মার্কসবাদীরা বিশেষ নজর দিতে পারেন নি। মানুষকে একান্তভাবে সামাজিক জীব প্রতিপন্ন করার অতি-উৎসাহে প্রতিফলনতত্ত্বকে যান্ত্রিক ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করার ঝোঁক এসেছিলো। ফলস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অগভীর অনুশীলন শিল্প-সাহিত্যকে অনেক ক্ষেত্রে প্রচার-সাহিত্যের সামিল করে তুলেছিলো[৬]। ব্যক্তিসত্তাকে সমাজ-যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করার ফলে সমাজতান্ত্রিক মানুষকে কার্যত অনেক ক্ষেত্রে ছোট করে দেখা হয়েছিলো। ব্যক্তি-মানস ও সমাজ-মানসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণগুলোর দিকে বেশি নজর পড়ায়, এদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরতা অগ্রাহ্য করায়, প্রতিফলনতত্ত্ব ও পাভলভীয় উচ্চতর স্নায়ুবিজ্ঞান সম্যকভাবে বিকাশ লাভ করেনি।

গূঢ় জৈবপ্রবৃত্তি-পরিচালিত মানুষ স্বভাবতই আত্মসুখ-অন্বেষী, মানবপ্রকৃতি অপরিবর্তনীয়, অথবা এ-যুগের ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিশেষ,—এই বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বের ধারণা-প্রভাবিত সাহিত্যিকের পক্ষে ব্যক্তিসত্তার দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা নিরসন-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। যন্ত্রযুগের খণ্ডিত মানুষের জীবনদর্শন সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহণে অক্ষম। দেহ-মন-সমান্তরালবাদ ও ব্যক্তি ও সমষ্টিনির্জ্ঞান-তত্ত্বের মধ্যে এ-একালের খণ্ডিত জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি: "The individual can not help his age; he can only express that it is doomed"—বিচ্ছিন্নতার প্রথম পর্বে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ শিল্প-সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছিলো, আজ বিচ্ছিন্নতার শেষ পর্বে—এই একচ্ছত্র পুঁজিবাদী পর্বে তার রেশ মহাকাশে বিলীয়মান। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রকৃতি-বিজ্ঞান বহির্জগতকে নিত্যনতুনভাবে আবিষ্কার করে চলেছে, মনোবিজ্ঞান

---

৬ 'প্রলেটকাল্ট' আন্দোলন স্মরণীয়।

অন্তর্জগতের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে রহস্যময়তার আবছা অন্ধকারে পথ হারিয়েছে। মনোজগতের কারবারী শিল্পী তাই বহির্জগত, বিশেষ করে সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে সংযুক্তির উপায় নির্ধারণে অক্ষম। পুরণো কোনো পদ্ধতিতে এই বাস্তব-বিযুক্তি রোধ করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। নতুন উপায়েরও সন্ধান মিলছে না। সামাজিক পটভূমিকার দ্রুত পরিবর্তনের প্রতিলিপি সাহিত্যিকের মানসপটে অঙ্কিত হতে পারছে না। বিজ্ঞানী আজ মস্তিষ্কের পরিপূরক ও মস্তিষ্ক-শক্তি-পরিবর্ধক বহু যন্ত্রের সাহায্যে বাস্তব অনুধাবন ও বাস্তবের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের সুবিধা-সুযোগের অধিকারী। সে-সুযোগ শিল্পীর নেই। কাজেই সে বেছে নিয়েছে বাস্তব-বিচ্যুত মনোসমীক্ষকের নির্জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের পথ; অথবা আচরণবাদীর অতি সরল 'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া' তত্ত্ব। সাহিত্যিক বাস্তবকে কোনো সময়ে সরাসরি অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করছে, আবার অন্য সময়ে মানুষকে যান্ত্রিকভাবে তার পরিবেশের দাস মনে করছে। বর্তমান সংকটের মধ্যে, এই একচ্ছত্র পুঁজির লোভ ও দিশেহারা নিষ্ঠুরতার যুগে, এই চরম বিচ্ছিন্নতার পর্বে, নতুন কল্যাণময় ভবিষ্যতের সূচনা তার শৈল্পিক চেতনায় ধরা পড়ছে না।

সমাজবাস্তবের ধারা বিচ্ছিন্নতা-নিরসন-পদ্ধতি নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাসের এ-কম্বুরেখ গতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অনুধাবন সাপেক্ষ।

বিজ্ঞানের কাছে এই নিউক্লিয়ার ও অটোমেশন যুগের মানুষের অনেক প্রত্যাশা। গুণগত পার্থক্য থাকলেও, এই প্রত্যাশার মধ্যে আদিম যুগের যাদু-বিশ্বাস ও যাদু-নির্ভরতার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অতি সাম্প্রতিক শিল্প-সাহিত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রভাব ক্ষীণ হলেও প্রতীয়মান। বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য—আদিম যাদুর এই দ্বিমুখী ধারা ভবিষ্যতে পুনর্মিলনের অপেক্ষায় স্পন্দমান। আজ দেখা দিয়েছে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির বিচ্ছিন্নতার বিলোপ-সম্ভাবনা, দ্বিখণ্ডিত সত্তার সংযুক্তির আভাস।

বিজ্ঞান-যুগে মস্তিষ্কের আবেগধর্মিতা ও বিচারমন্যতা সুসমন্বিত হতে চলেছে। পাঠক ও দর্শকের এই রূপান্তরিত চৈতন্যের চাহিদা মেটাতে শিল্প-সাহিত্যের বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গীতে আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বন্যা। শিল্পীর চেতনার প্রখরতায় সামগ্রিক জীবন আবার প্রতিবিম্বিত হবে—এ-আশা আর দূরকল্পনা নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান। বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্পী-মনের প্রথম অনুভূতি হবে,

'Man is capable of creating situations he wants and needs';—তখন সাহিত্যে পারমাণবিক ধ্বংসের আতঙ্কই শুধু পরিবেশিত হবে না, 'অমিত শক্তির অধিকারী মানুষ দুর্বল ও শক্তিহীন'—এই স্ববিরোধী উক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেবে না আর সাহিত্যিক। যখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রের সঙ্গে সে পরিচিত হবে, তখন জানবে যে, স্ববিরোধী অবস্থার ক্রমপরিবর্তনে অতি-স্ববিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়, নঙর্থক উদ্দীপক তখন গড়ে তোলে বিপরীত সদর্থক প্রতিক্রিয়া, অতি-আতঙ্কজনিত নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটে সক্রিয় নির্ভীক প্রতিরোধে। এই বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তাকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দেবে। তখন ক্রমবিচ্ছিন্নতা অপ্রতিরোধ্য বলে সে আর ভাববে না।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ককোষ স্বভাবতই নিস্তেজিত। আংশিক নিস্তেজনা অন্য অংশ উত্তেজনা জাগায়, ফলে স্থিতি-সাম্য কিছুটা বজায় থাকে, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন বিলম্বিত হয়। কিন্তু পূর্ণ নিস্তেজনা—আজকের সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতা অনেকটা কুম্ভকর্ণের নিদ্রার সঙ্গে তুলনীয়। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যাবে উত্তেজনার চাঞ্চল্য, সংযুক্তির আকুতি ও আনুসঙ্গিক কর্মকাণ্ড; যার ফলে ঘটবে বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তি। নিস্তেজনা ও উত্তেজনা পরস্পরের পরিপূরক মস্তিষ্কধর্ম দ্বান্দ্বিক নিয়মে সংযুক্ত। পরিদৃশ্যমান নিস্তেজনা-তরঙ্গের মধ্যেই সুপ্ত আছে উত্তেজনাতরঙ্গ, ব্যাপক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে একাত্মীভবনের বিরাট সম্ভাবনা। শিল্পী-সাহিত্যিককে সক্রিয় উদ্যোগ ও জীবনযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দ্বারাই এ-সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

১০

শিল্পীমনের ভবিষ্যৎ : মনোবিদের জল্পনা

শিল্পীমন অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ এবং বিজ্ঞানীমন চিন্তা ও বিশ্লেষণপ্রবণ ;— এ-ধারণা বহু পুরণো। এই ধারণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথমে পাই ইভান পেত্রভিচ পাভলভের কাছে। বিবর্তনের পথে ধাপে-ধাপে অনেক নতুন মস্তিষ্ক-ধর্মের অধিকারী হয়েছে মানুষ। বাচনধর্ম এই রকম একটি ক্রম-আরব্ধ মস্তিষ্ক-ধর্ম। বাক্-শক্তি আয়ত্তে আসার ফলে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির সামান্যীকরণ বিমূর্তকরণ সম্ভব হয়েছে ও বাক্-কেন্দ্রিক চিন্তা, যুক্তি, বিশ্লেষণ ইত্যাদির স্ফূরণ ঘটেছে। বহির্বাস্তবের সঙ্কেত পঞ্চেন্দ্রিয় মারফত গ্রহণ করে আবেগতাড়িত অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা পশুধর্ম ; আর সেই সঙ্কেতকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুদ্ধিচালিত অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা মানবধর্ম। বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে এই দুই ধর্ম মোটামুটি সমন্বিত। আবেগ-অনুভূতি আর যুক্তিবুদ্ধি চৈতন্যের দুই স্তর। 'অবজেকটিভ রিয়ালিটি' দু'ভাবেই মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হতে পারে। যুক্তিবুদ্ধি-প্রয়োগে বস্তুর সঠিক কল্পনা বা যথার্থ রূপটি মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় ; বিষয়গত এই ধারণার সঙ্গে বিষয়ীগত অনুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। আবেগ বা প্রক্ষোভ (ইমোশন) ধারণাকৃত বস্তুটির (আইডিয়ার) বিশেষ ব্যক্তিগত তাৎপর্যের মান নির্ণয় করে। আইডিয়াবর্জিত ইমোশন যেমন স্পষ্ট

হতে পারে না; তেমনি মনে রাখা দরকার, আইডিয়ামাত্রেই, সামান্যমাত্রায় হলেও, ইমোশন সৃষ্টি করবেই। কর্মতৎপরতা আবেগধর্মিতার উপর নির্ভরশীল কিন্তু বাস্তবের সংকেত সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মায় যুক্তিবুদ্ধি থেকে। যুক্তিসমন্বিত আবেগ তাই মানুষকে সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশদানে সক্ষম। বিষধর সাপ দেখে ভয়ের (আবেগ) বশবর্তী হয়ে স্থানত্যাগ করা সঠিক কর্মপন্থা; কিন্তু রজ্জুকে সর্পভ্রম করে অথবা নির্বিষ সাপ দেখে পলায়ন করা অনুচিত বা বেঠিক কর্ম, সঠিক ধারণার অভাবের নিদর্শন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও আবেগ দুইই চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য ও অতিপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া—মস্তিষ্কের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষার উপায়।

সব মানুষ কিন্তু এই সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না। অসমন্বিত দুই বিশিষ্ট মস্তিষ্ক-ধর্মীরা দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। একদল বিমূর্ত ধ্যানধারণার জগতে বাস করেন। মূর্ত রূপকল্প এবং আবেগ তাঁদের স্পর্শ করে না। শুধু যুক্তি-বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তবকে উপলব্ধির চেষ্টায় এঁদের জীবনে রসানুভূতির সৌভাগ্য কমই ঘটে। এঁরা অসুস্থ নন, তবে অসাধারণ। এঁদের মস্তিষ্ককে বিজ্ঞানধর্মী মস্তিষ্ক বলা হয়েছে। সব বিজ্ঞানীই এই ধাঁচের, এই সরলীকরণ যেন এ-থেকে না-করা হয়। এঁদের মস্তিষ্কে, দ্বিতীয় বা বাক্-সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য থাকে।

অপর মেরুতে রয়েছেন আবেগ-অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীমনা মানুষ। যুক্তিবুদ্ধি এঁদের আবেগকে প্রভাবিত করে না। বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত ধারণা দ্বারা এঁরা পরিচালিত হতে চান না। এঁদের মস্তিষ্কে থাকে প্রাথমিক সাংকেতিক স্তর বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরের প্রাধান্য। এই বোহেমিয়ানবাদ অবশ্য সকল শিল্পীর ধর্ম নয়।

আদিম সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে শ্রেণীসমাজে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি ও অনুভূতির মধ্যে অনন্বয় ঘটেছে। তার ফলেই চৈতন্যের এই খণ্ডিতরূপ; এই দ্বৈত-প্রক্রিয়ার প্রকাশ। শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী ভিন্নগোত্রীয় বলে অনুমিত। মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, ভয়ভাবনা ও অবাধ কল্পনাকে আশ্রয় করে শিল্পসাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে, আর বিজ্ঞানচর্চা চলেছে ল্যাবরেটরির আবেগ-অনুভূতিরহিত নির্জন কক্ষে, যুক্তির নীরস আশ্রয়ে। মনে হয়েছে বুঝি, শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মনকে, আবেগকে আন্দোলিত করা, আর বিজ্ঞানের

কাজ বুদ্ধিকে শাণিত করা, অথবা প্রকৃতি-জগতের সংবাদ সরবরাহ করা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে, হিউম্যানিটি অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি বা মনুষ্যধর্মের পরিচয় দিতে পারে শুধু 'হিউম্যানিটিজ্' বা প্রাচীন সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানই আমাদের জীবনপথে দিঙ্‌নির্ণয়ের কম্পাস। বিজ্ঞানের চর্চা বা গবেষণা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই : বিজ্ঞানী জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন আইভরি-টাওয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীকে জানবার বিশেষ চিন্তা করেন নি এতকাল। আমি বলছি রেনেশাঁস পরবর্তী ইয়োরোপের কথা।

নন্দনতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র তো দূরের কথা ; জীবনদর্শনে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও জীবনের মূল্য-নির্ণয়ে বিজ্ঞানের কোনো অবদান থাকতে পারে না—এই ছিল এই সময়কার শিল্পী-সাহিত্যিক, তথা সাধারণের ধারণা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এ-ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার জীবনযাত্রার মান ও সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে চিরকাল, কিন্তু জনসাধারণের কাছে প্রত্যক্ষ ও আপাত-প্রতীয়মান হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। প্রাকৃত-বিজ্ঞানের প্রভাব বোঝা গেলেও, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের প্রভাব সহজে বোধগম্য হয় নি অনেকদিন পর্যন্ত।

আজ শিল্পসাহিত্যে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানী আর অবহেলিত নয়।

শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্র নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ বিজ্ঞান-অনুপ্রাণিত, বলা চলে, জীবনদর্শন আজ মূলত বিজ্ঞানী-প্রভাবিত। বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে শুধু অত্যাবশ্যক নয়,—শিল্পকৃতি-সাহিত্যকৃতির মধ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত। রিলেটিভিটি, কোয়াণ্টাম, পজিট্রন, জিন, লিবিডো—এগুলো এখন আর শুধু শব্দচিহ্ন নয়, কাব্যময় ব্যঞ্জনাসৃষ্টির প্রতীক হিসাবে অনেকস্থলে ব্যবহৃত। মনোবিজ্ঞানের সূত্র ও উপাত্তের সঙ্গে সাহিত্যিক শুধু কৌতূহলের বশে পরিচিত হতে চান, একথা ভাবলে ভুল হবে। মনের অতলরহস্যের সন্ধান পেতে চান তিনি মনোবিজ্ঞানের চর্চার সাহায্যে। বিজ্ঞানী আজ গল্প-উপন্যাসের নায়ক, পরমাণু-বিজ্ঞানীর মানসিক দ্বন্দ্ব আজ নাটকীয় ট্রাজেডির বিষয়বস্তু। প্রেমের জৈবিক ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবিচার

আজ কথাসাহিত্যের প্রতিপাদ্য। ধনতান্ত্রিক দেশে বিজ্ঞান-প্রভাবিত সাহিত্যের দুটি ধারা প্রধানত চোখে পড়ে। একটি অগভীরতথ্যবাহী ধারা; বিজ্ঞানভিত্তিক দূরকল্পনাকে আশ্রয় করে এই ধারা ধাবমান। সায়েন্সফিক্‌শন এই ধারার বিশেষ অবদান। এর আবেদন সর্বজনীন, কিন্তু এর সাহিত্যিক মর্যাদা কম। অন্য ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও অবাধ-অনুষঙ্গ তত্ত্বভিত্তিক এই ধারা-প্রবাহে ভাসমান অনেকানেক, বহুনন্দিত মর্যাদাশালী সাহিত্যিক। এই ধারায় অস্তিবাদী দর্শনের প্রভাবও পরিলক্ষিত। নির্জ্ঞান, অবাধ-অনুষঙ্গ, অস্তিবাদী দর্শন, নয়াদৃষ্টবাদ; আধুনিক সাহিত্যের এইসব প্রধান-উপজীব্য বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ-সম্মত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে প্রতিক্রিয়া হিসেবে, এই সব তত্ত্বকথার জন্ম; কাজেই এইসব প্রভাবকে বিজ্ঞানের প্রভাব বলেই গণ্য করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে সাহিত্যশিল্পে বিজ্ঞানের প্রভাব আরও বেশি প্রত্যক্ষ। ব্যক্তিমনের আকুতির গভীর তাৎপর্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়ত অনেকসময় অবহেলিত, প্রতিফলনতত্ত্ব সময়-সময় যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপিত, মানুষের উপর আর্থ-সমাজনৈতিক প্রভাব কখনও বা অতিরঞ্জিত; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের নানাদিক শিল্পসাহিত্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত। বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী চিন্তার প্রভাব থেকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিক মুক্ত হতে পারেন না।

নন্দনতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা আজ সব দেশেই প্রচলিত।

বিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশের শেষফল কি দাঁড়াবে,—এই নিয়ে সাহিত্যিকমহলে আজ অনেক রকমের গবেষণা শুরু হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের ফলে সাহিত্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে না কি? যন্ত্রকে দিয়ে আজ অর্ডারমত কবিতা লেখানো চলে, ক্যামেরা আজ ফোটোকে অনুকৃতির থেকে উচ্চ-পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে বিজ্ঞানীর কল্পনা আজ কবির কাব্যকে ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। 'শিল্পের প্রয়োজন ফুরিয়েছে'—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকে বলতে শুরু করেছেন। "Art is on its last legs. It has been driven out by science and technology. When the human race can fly to the moon, is there any real need of moon-struck poets? The aeroplane is swifter than the gods,

the car more efficient than Pegasus. The astronaut can see what the poet merely dreamt of." (আর্নস্ট ফিসার)। মানবজাতির শৈশবে ও বয়ঃসন্ধিকালে শিল্পের গুরুত্ব ছিল। আজ বয়ঃপ্রাপ্ত বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ মানবজাতির কাছে শিল্পের কোনো প্রয়োজন আছে কি? হেলেনের অবগুণ্ঠনে ঢাকা কোন রহস্য আজ বিজ্ঞানের কাছে অনুন্মোচিত? ফাউস্টের কোনো যাদুবিদ্যা আজ বিজ্ঞানী কর্তৃক অনায়ত্ত আছে কি? হারকিউলিস, প্রমেথিয়ুসের কোনো মূল্য আছে কি যন্ত্র-শাসিত পৃথিবীতে? হোমার, শেকসপিয়ার মোজার্ট, গ্যয়টে আর জন্মাবে না; কেননা তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আজ প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে, শিল্পীমন ও বিজ্ঞানীমনের পার্থক্য তিরোহিত হতে চলেছে। এই হলো এক পক্ষের অভিমত।

অন্যপক্ষ বলছেন, এই ভয় অযৌক্তিক। বিজ্ঞান কি কোনোদিন পারবে বিশেষকে নির্বিশেষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে? আধুনিক বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক, পূর্ণাবয়ব শিল্পকৃতির অনুরূপ কিছু কোনোদিন সৃষ্টি করতে পারবে না। বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই দেশকাল গণ্ডীসীমিত আপেক্ষিক সত্য। নিউটন গ্যালিলিও আজ উপেক্ষিত, মৃত। তাঁদের আবিষ্ক্রিয়ার গুরুত্ব ইতিহাসের পাতাতেই নিবদ্ধ। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে আজকের বহুপঠিত বিজ্ঞান-পুস্তক, আজকের নতুন গবেষণা ও তত্ত্বকথা। অনুসন্ধানের স্রোতকে উজ্জীবিত করেই বিজ্ঞানের কাজ ফুরিয়ে যায়। প্রাচীন শিল্প কিন্তু নতুন শিল্পের আক্রমণে পরাজিত হয় না। তার মূল্য কালজয়ী, দেশজয়ী। নিউটন আজ একটি আধুনিক বিজ্ঞানীকে কোনো কথা শোনাতে পারেন না, কিন্তু হোমারের শ্রোতা আজও রয়েছে হাজারে-হাজারে—ক্ষেতখামারে, শহরে, পল্লীতে। শিল্পসাহিত্য বিজ্ঞানের আক্রমণে সাময়িকভাবে স্বধর্মচ্যুত হলেও কোনোদিন মরবে না। তার প্রয়োজন ফুরুবে না।

তা ছাড়া, মানুষের যন্ত্রণাকে কোনোদিন রূপ দিতে পারবে কি যন্ত্র? মানব-মনের এই যন্ত্রণার অভিব্যক্তির জন্যই শিল্পসাহিত্য বেঁচে থাকবে। মানুষ কোনোদিন মৃত্যুকে জয় করতে পারবে না। মৃত্যুকে ঘৃণা ও ভয় মানুষ করবেই আর সেই ভয়কে জয় করার প্রেরণা জোগাবে চিরকাল শিল্পসাহিত্য। মানুষ তার খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সত্তার বিলাপ থেকে হয়ত সাম্যবাদী সমাজে মুক্তি লাভ করবে, কিন্তু মহত্তর বৃহত্তর জীবনের ছবি তাকে হাতছানি দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে

নিয়ে যেতে চাইবে। সেই যাত্রাপথের অজানা রহস্য হবে সে-সময়ের শিল্প-সাহিত্যের উপজীব্য।

প্রথমোক্ত দল এর উত্তরে বলতে পারেন, বিজ্ঞানের প্রভাবে শিল্পসাহিত্যের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে শিল্পের পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখা যায় না। ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পসাহিত্য আজ পণ্য। মনোপলির মুনাফা-শিকারের উপায়। সমাজের মনোবিকার, যৌনসর্বস্বতা ইত্যাদি দুষ্ক্ষত বহন করে, য়্যান্টি-ম্যাটারের প্রভাবে য়্যান্টি-নভেল, উদ্ভট-নাটকের পথে আত্মধ্বংসের দিকে চলেছে সাহিত্য। আর সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনায়কদের প্রচারের অথবা উদ্দেশ্যমূলক আমোদ-প্রমোদ বিতরণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সাহিত্য। গত পঞ্চাশ বছরে সাহিত্যের নামে যাকিছু সৃষ্ট হয়েছে, তার কতটুকু বেঁচে থাকবে? অবসর-বিনোদনের কিম্বা সাময়িক উত্তেজনার শস্তা খোরাক হয়েই তাদের উপযোগিতা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আজ সমাজের নেতৃত্বের পুরোভাগে কজন শিল্পী-সাহিত্যিককে দেখা যাচ্ছে? বিজ্ঞান সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চলেছে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর নেতৃত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞানের কাছে শিল্পসাহিত্য পরাভূত, তার স্বকীয়তা বিনষ্ট। শিল্পীমনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। বিজ্ঞানীর যুক্তিধর্মী মনের প্রভাবে শিল্পীমন স্বধর্মবিচ্যুত। মহৎ শিল্প আর সৃষ্ট হবে না।

দুই পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই অনেকখানি ফাঁক থেকে গেছে। শিল্পসাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন এঁরা দুই শিবিরে বসে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কূট তর্কজাল বিছিয়েছেন। শ্রেণীসমাজের চৈতন্যের খণ্ডিত সত্তাকে এঁরা চিরন্তন ও শাশ্বত বলে মনে করছেন। শিল্পীমন ও বিজ্ঞানীমনের পার্থক্যকে, আবেগধর্মিতা ও যুক্তিধর্মিতাকে,—এঁরা পরস্পর-নিরপেক্ষ বিরুদ্ধচারী মস্তিষ্কধর্ম বলে ধরে নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য তাই মনে হবে। বিজ্ঞান ও শিল্প মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরাশ্রয়ী, কাজেই বিজ্ঞানের বুদ্ধি-গ্রাহ্য ক্ষেত্র আর শিল্পসাহিত্যের অভিভাবন-অনুভাবিত ক্ষেত্র চিরদিনই পৃথক থাকবে। মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার দুয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রভাব বিস্তারের পদ্ধতি আলাদা, প্রভাবিত মানুষের চরিত্রও আলাদা। বিজ্ঞানী চলেন ন্যায়শাস্ত্রের অনড় যুক্তির পথে, তথ্য-প্রমাণের বোঝা কাঁধে নিয়ে; বন্ধুর সেই পথে অতি সাবধানে পা-ফেলতে হয় তাঁকে। আর শিল্পী চলেন আবেগের

বন্যায় গা-ভাসিয়ে অনুভূতির রঙিন পাল খাটিয়ে, বে-হিসেবী দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে। বিজ্ঞানী যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা মেনে নিতে বলেন না, সন্দেহ-অবিশ্বাস তাঁর ধর্ম; আর শিল্পী অন্যের পোষাক গায়ে চড়িয়ে, অন্যের আবেগ-অনুভূতিকে নির্বিচারে নিজস্ব করে নিয়ে রসের সাগরে ডুব দিতে নির্দেশ দেন। বিজ্ঞানীর জগৎ বাস্তব জাগরণের, আর শিল্পীর জগৎ অবাস্তব স্বপ্নের। বিজ্ঞানী নিজেকে বিস্মৃত হন না, অন্যকেও আত্মবিস্মৃত হতে বলেন না; কিন্তু আত্মবিস্মৃত শিল্পী নায়কের সঙ্গে একাত্মীভূত, পাঠককে শ্রোতাকে একাত্মীভূত করা তাঁর উদ্দেশ্য।

এই ধরনের বিপরীত মেরুতে অবস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এঁদের কাছে, বিজ্ঞানী কোনো সময়ে, স্ফটিকস্তম্ভের বাসিন্দা আপনভোলা আত্ম-সমাহিত ঋষি, আবার কোনো সময় কঠোর বাস্তবধর্মী হিসাবপরীক্ষক—পাই পয়সার হিসেবেও যাঁর গরমিল হয় না। তেমনি শিল্পী-সাহিত্যিকেরও বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন পরিচিতি। যথা—রোম্যান্টিক, বোহেমিয়ান, স্যুররিয়ালিস্ট, ন্যাচারালিস্ট, রিয়ালিস্ট। শিল্পীমন ও বিজ্ঞানীমনের যে-বৈপরীত্যের ছবি এঁরা আঁকেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে-পার্থক্য এঁদের কাছে ধরা পড়ে, বিভিন্ন স্কুলের শিল্পীদের মধ্যে অথবা বিভিন্ন জীবনদর্শনাবিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কি সেই বৈপরীত্য, সেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না? ব্লেক ও মিল্টন কিম্বা গোর্কী ও পিরান্‌দেল্লোর মধ্যে যে-মানসিক পার্থক্য, সেকি রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মানসিক পার্থক্যের থেকে অনেকাংশে বেশি গভীর নয়? ক্ল্যাসিকাল ও রোম্যান্‌টিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য কি শিল্পী-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যের চেয়ে কোনো অংশে কম? মানুষের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত আছে—মনে করেন রোম্যান্‌টিক। মনে করেন যে, "Man the individual, is an infinite reservoir of possibilities"। আর অপর দিকে—"One can define the classical as the exact opposite to this. Man is an extraordinarily fixed and limited animal whose nature is absolutely constant"—এ মন্তব্য করেছেন Hume। আধুনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি আরও কৌতূহল-উদ্দীপক: "There are two kinds of art, geometrical and the vital, absolutely distinct in kind

from one another. These two arts are not modifications of one and the same art but pursue different aims and are created for the different necessities of mind"। বলা বাহুল্য, এ-সবই অতিশয়োক্তি; চিন্তাবিদ্‌দের বিভক্তসত্তার পরিচায়ক, শ্রেণীসমাজের বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন।

আসল কথা এই যে, শিল্প-বিজ্ঞানের ব্যবধান অলঙ্ঘ্যনীয় নয়। যাদুর সাহায্যে আদিম মানুষ একদিন প্রকৃতিকে, বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল। বাস্তবকে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টার স্রোত পরবর্তীকালে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি বিজ্ঞানের, অপরটি শিল্পের। তারা কোনোদিনই পুরোপুরি সমান্তরাল ছিল না। আজ বিজ্ঞানের যুগে ধারা দুটির যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ, নানা শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে তারা আরও বেশি সংযুক্ত। আজ সাহিত্যশিল্প যেমন যন্ত্রবিদ্যা-প্রভাবিত, বিজ্ঞানেও তেমনি মানববিদ্যার ছায়া প্রতিবিম্বিত। শিল্পসাহিত্যে আজ একদিকে আছে বিজ্ঞান-প্রভাবিত বিমূর্ত রূপ, অন্যদিকে রয়েছে বিজ্ঞান-সম্মত অতিবাস্তব প্রতিচ্ছবি। বাস্তবের প্রতিফলনকে এড়িয়ে যাবার, যুক্তিহীনতার আশ্রয় নিয়ে যুক্তিকে খণ্ডন করার প্রয়াস থেকে যে-উদ্ভটসাহিত্য সৃষ্ট হচ্ছে, তার মূলেও বিজ্ঞানের প্রভাব। সমাজবিজ্ঞানের, মনোবিজ্ঞানের আলোতে আজ সমাজমানস, ব্যক্তিমানসের প্রতিটি অন্ধকার কোণ আলোকিত। তারই প্রতিক্রিয়ার ফল— এই সব সংজ্ঞানবিচ্যুত, যুক্তিরহিত সাহিত্যকৃতি। অবাধ যুক্তিহীনতা, বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে পলায়ন; যুক্তি ও বিজ্ঞানের আধিপত্যেরই নিদর্শন।

ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-শাসিত সমাজে শিল্পসাহিত্য কি রূপ নেবে?

দ্বিধাহীন ভাবে বলা চলে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার দৌলতে আজ কায়িক ও মানসিক শ্রমের সীমারেখা লুপ্ত হতে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে এছাড়া আবার শ্রমের চাপও লাঘব করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজে কষ্টকর কায়িকশ্রম লুপ্ত হবে আশা করা যায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মস্তিষ্কের ঔৎসুক্য-পরাবর্তের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। অতি-শ্রম-কাতর ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীন মানুষের জন্য এতদিন যে শস্তা চিত্তবিনোদনকারী শিল্পসাহিত্যের চাহিদা ছিল, সাম্যবাদী সমাজে সে-সাহিত্যের চাহিদা নিশ্চয়ই কমবে। আগামীদিনের মানুষের জ্ঞানপিপাসা আরও বহুগুণ

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। অতি-উত্তেজনার প্রতিষেধক হিসেবে দেহ-মন-শ্লথক (body and mind relaxant). অবসরবিনোদক শিল্পের প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষিত না-হলেও, অনেকখানি কমবে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্কের চিন্তা ও বিশ্লেষণপ্রবণতা বাড়বে। নিম্নমস্তিষ্কের পাশব-বৃত্তিগুলো সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্লেষণের প্রভাবে ক্ষীণশক্তি হয়ে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। 'কমিক ও ক্রাইম নভেলে'র প্রতি মানুষের আকর্ষণ আপনাথেকেই হ্রাস পাবে। সমাজে পুরুষ-আধিপত্য লুপ্ত হবার ফলে নরনারীর সম্পর্ক তখন অনেকখানি স্বাভাবিক, কাজেই কৃত্রিম যৌন-আবেদন সাহিত্যের বিষয়বস্তু থাকবে না। মস্তিষ্কের যুক্তিধর্মিতা বাড়ার ফলে শস্তা অনুভূতি ও নেতিধর্মী ভাবাবেগের অবসান ঘটবে। তা'বলে অনুভূতি বা আবেগের মৃত্যু ঘটবে না। অনুভূতি হবে তীক্ষ্ণ ও গভীরতর এবং আবেগ হবে মহত্তর। উচ্চমস্তিষ্কের দুই সাংকেতিক স্তরের সমন্বয়ের ফলে নতুন মননশক্তিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। তারা নিঃসন্দেহে সৃষ্টি করবে অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিগ্রাহ্য শিল্পসাহিত্য। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পথ ও প্রকাশভঙ্গী হয়ত বহুদিন আলাদা থাকবে, কিন্তু তারা সুসমন্বিত সাংকেতিক স্তর দুটিকে সমভাবে উদ্দীপ্ত করবে। বিজ্ঞানীমনের ঔৎসুক্য ও শিল্পীমনের সম্পূর্ণতাবোধ আগামীদিনের মানুষের মধ্যেও সমানভাবে কাজ করবে। বিজ্ঞানী শিল্পীকে পরিবর্তিত করবে এবং ফলে নিজেও পরিবর্তিত হবে। এরপর কি একদিন শিল্পবিজ্ঞানের দুই ধারার মিলন ঘটবে? একই মানুষের মধ্যে শিল্পীসত্তা ও বিজ্ঞানীসত্তার মিলনে এক নতুন সত্তার উন্মেষ ঘটতে পারে না কি?

১১

রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ভূমিকা

কবি ও শিল্পীমানস বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক তাঁর নিজস্ব প্রত্যয় ও তত্ত্ব-সূত্র অনুযায়ী বিশেষ পদ্ধতির অনুরাগী। কবি বা শিল্পীর মানসিকতার কোন বৈশিষ্ট্য তাঁকে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে? শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পরিবেশ-নির্ভর না অন্তর্নিহিত? কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির মূলে সমাজবাস্তবের ভূমিকা মুখ্য না গৌণ? শিল্প বা কাব্য পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সংজ্ঞান-নির্ধারিত না নির্জ্ঞান-প্রণোদিত এবং স্বত-উৎসারিত? নির্জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার বিচার্য, ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিনির্জ্ঞান না ইয়ুঙ্গীয় সমষ্টিনির্জ্ঞান,—কোন নির্জ্ঞান দ্বারা শিল্পসৃষ্টি প্রভাবিত। এইসব প্রাথমিক বিচারে মনস্তাত্ত্বিকরা প্রধানত দুই শিবিরে বিভক্ত। এক শিবির প্রতিফলনতত্ত্বে, অন্য শিবির নির্জ্ঞানতত্ত্বে বিশ্বাসী। প্রতিফলনতত্ত্বে বিশ্বাসীর বিচার্য কবি বা শিল্পীর স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্কের টাইপ, বহির্বাস্তবের দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং শিল্পীর বিশিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রের উপর বহির্বাস্তবের প্রতিফলনক্রিয়া। আর নির্জ্ঞানবাদীরা অবদমিত কামনার উদ্গতির ফলশ্রুতি হিসেবে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সমীক্ষায় ব্রতী। একদল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রণালী মনোবিশ্লেষণে প্রযোজ্য মনে করেন; অন্যদল কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টি ও দূরকল্পনার সাহায্য ছাড়া মনোসমীক্ষা অসম্ভব বলে দাবী করেন। অস্তিবাদ

দর্শনদ্বারা সাম্প্রতিককালে নির্জ্ঞানবাদ অনেকখানি সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত। কিন্তু তার মৌলিকতত্ত্ব অপরিবর্তিত। প্রসঙ্গক্রমে নির্জ্ঞানবাদের উল্লেখ অপরিহার্য হলেও, আমরা প্রতিফলনতত্ত্বের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা, বৈচিত্র্যমণ্ডিত রচনা, বাস্তবধর্মী ক্রিয়াকলাপ, কল্পনাভিত্তিক ধ্যানধারণা, তাঁর শিল্পীসত্তা ও সামাজিক সত্তা, তাঁর সামগ্রিক বিরাটত্ব; এ-সব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; আরো অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রমানসের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ছাড়া তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, সেই বিশ্লেষণ বহু-বহু বৎসরের শ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ সেই বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক ভূমিকা মাত্র: উদ্দেশ্য, যোগ্যতর ও তরুণ মনোবিজ্ঞানীদের এই সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করা।

কবি, তথা যে-কোনো সৃজনী-প্রতিভামাত্রেই বিশেষ এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী। পাভলভীয় পরিভাষায় শিল্পীর মস্তিষ্কে 'প্রথম সাংকেতিক স্তর'র প্রভাবাধিক্য পরিলক্ষিত। সৃজনীপ্রতিভার অধিকারী মাত্রেই অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁদের অতি মাত্রায় সজাগ ও স্পর্শপ্রবণ। শুধু তাই নয়, শিল্পীমন সংবেদক উদ্দীপক (sensory stimuli) গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে এক বিশেষক্ষমতার অধিকারী। পরিবেশের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের খবর শিল্পীর মস্তিষ্কে পৌঁছে মনকে আন্দোলিত করে। অরুণাচলের বালার্কচ্ছটা এবং অস্তাচলের রক্তিমাভ শেষরশ্মির পার্থক্য কবিমানসে প্রতিভাসিত; ঋতু-পরিবর্তনের সূক্ষ্মতম আভাস কবিমনে প্রতিফলিত; সমাজাকাশের বর্ণালীর রং-রেখার বিশেষত্ব কবিচিত্তে অনুভূত। কবিমানসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য,—তার অসাধারণ এম্প্যাথী (empathy): কবিমাত্রেই দরদী ও মরমী। অন্যের চিত্তলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার ভাবাবেগ ও অনুভূতির শরিক হয়ে যান কবি। অন্যের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আর্তি-আকুতির অংশগ্রহণ করার অত্যদ্ভুত শক্তি কবিমনের বৈশিষ্ট্য। বহির্জগতের চেতন-অচেতন, সকল পদার্থের সঙ্গেই একাত্মতা কবির স্নায়ুতন্ত্রের নিজস্ব ধর্ম। রবীন্দ্রমানসে এ-সকল কবিজনোচিত স্নায়ুবৈশিষ্ট্য সুসন্নিবিষ্ট। মনে হয়, রবীন্দ্রমানসের এম্প্যাথী আরো বিস্তৃত, আরো গভীরে প্রবিষ্ট। মনস্তাত্ত্বিকের কথায় বলা যায়—'he has a peculiar

empathic animation of inanimate objects'। 'জল পড়া' 'পাতা নড়া'—কবিমনে চিত্রপ্রতীক সৃষ্টিই শুধু করে না, জল ও পাতার মর্মবাণীও কবি শুনতে পান। বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে কবিমস্তিষ্ক যেন 'সুপারসনিক সাউণ্ডে'র হ্রস্বতমতরঙ্গলেখার অনুধাবন-পটুতা অর্জন করেছে। প্রকৃতির কবিমাত্রেই জড়-প্রকৃতিতে চৈতন্য-আরোপ করেন; রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই চৈতন্য আরোপ শুধু খেয়ালীমনের কল্পনাপ্রয়াণ নয়, মরমিত আত্মীকরণ। আত্মচেতনায় জড়চেতনার অনুরণনে কবি যখন বসুন্ধরার 'কোলের ভিতরে বিপুল অঞ্চলতলে' আশ্রয় খোঁজেন; যখন বলেন, 'সচকিয়া আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে' অথবা 'শুভ্র উত্তরীয় প্রায় শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়'—এই বাসনা প্রকাশ করেন; তখন মনে হয় কবিমানস পাষাণ-নদী-পর্বতের মানসের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। এই বিশেষ মানসিকতা শুধু উপনিষদের শিক্ষা, কিম্বা সর্বেশ্বর ও সর্বচৈতন্যবাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না; মস্তিষ্কের গ্রাহীকেন্দ্রের অতি-সংবেদনশীলতা ছাড়া এই ধরনের একাত্মতা সম্ভব নয়। ওষধি-জল-বনস্পতির মধ্যে এবং নিজের মধ্যে অমৃতের অস্তিত্ব কল্পনা থেকে এই আত্মীয়তা—একথা না-ভেবে, এই ধরনের একাত্মতা-অনুভূতির ফলেই ঐ ধরনের দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব—এই ভাবাই বোধ হয় বেশি যুক্তিসঙ্গত। অতি সংবেদনশীলতা এবং এমপ্যাথী-আধিক্য সৃজনীপ্রতিভার পক্ষে অপরিহার্য নিঃসন্দেহ; কিন্তু শিল্প বা কাব্য সৃষ্টির জন্য স্নায়ুতন্ত্রে অন্যধর্মের সংযোজনও অত্যাবশ্যক। বৈশাখের আকাশে জলগর্ভ মেঘসন্দর্শনে স্নায়ুতন্ত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেই 'নবযৌবনা বরষা'র বন্দনাগীতি 'বর্ষামঙ্গল' হয়ে ওঠে না, ময়ূরের মত হৃদয় নেচে উঠলেই 'শতবরণের ভাবউচ্ছ্বাস'কে কলাপের মত কবির ভাষায় বিকশিত করা যায় না। নীলনবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই না-থাকলেও 'আষাঢ়' কবিতার চিত্রকল্প সকলের মনে ফুটে ওঠে না। মনে ফুটলেও ছন্দে ও ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। কবিমানসের বিশেষ ধর্ম গ্রাহীকেন্দ্রের উত্তেজনাকে চিত্র বা ভাষার মাধ্যমে রূপদান। সেই রূপ আবার শিল্পসম্মত, বহুজনগ্রাহ্য হওয়া চাই। এর জন্য প্রয়োজন, "an intactness of sensory motor equipment, permitting the building up of projective motor discharge for expressive function."। মস্তিষ্কের গ্রাহী ও চেষ্টীয় সংগঠনের এই বৈশিষ্ট্য (যা সংবেদন ও সহমর্মিতাকে রঙে-রেখায়-ছন্দে ব্যক্ত করে দর্শক ও

পাঠকমনকে অভিভূত করে, অনুরণিত করে) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতি, স্মৃতি থেকে অভিব্যক্তি,—এই প্রক্রিয়ায় শিল্পসাহিত্যের প্রকাশ। শিল্পীমানসের এই অভিব্যক্তি-দক্ষতা ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। কিন্তু অভিজ্ঞতা সর্বদাই সমাজ-বাস্তব ও ইতিহাস নির্দিষ্ট। রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে আমরা কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত মস্তিষ্কধর্মকে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করি; কিন্তু তাব'লে রবীন্দ্রমানস গঠনে সমাজ-বাস্তবের ভূমিকাকে গৌণ বলে মনে করি না। রবীন্দ্রমস্তিষ্কে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন রবীন্দ্রমানসের জনক। কাজেই রবীন্দ্রমানস-বিশ্লেষকের প্রধান কর্তব্য কবির পরিবেশ বিশ্লেষণ। এ-বিশ্লেষণ হবে দু'ধরনের। প্রথমত, ইতিহাসসম্মত বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তৎকালীন সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হবে; দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনানুগ প্রেক্ষণের সাহায্যে কবির প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের বিশেষ রূপটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই দুই ধারার পরিশীলনকে আবার সমন্বিত করতে হবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রপ্রয়োগে। তবেই রবীন্দ্রমানসের বৈচিত্র্য, জটিলতা, দ্বন্দ্ব-বিরোধের অনুধাবন-প্রচেষ্টা অন্তত আংশিক ফলবতী হবে। মনোবিদ্যা এখনও বিরাট প্রতিভার সম্যক বিশ্লেষণের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, একথা নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে বলা চলে।

রবীন্দ্রমানস যে-বিশেষ স্নায়ুতন্ত্র-নির্ভর, সেই স্নায়ুতন্ত্রের টাইপ কতখানি কুলসংক্রমিত, আর কতটা পরিবেশ-প্রভাবিত;—এ-কূটতর্কে প্রবেশ না-করেও বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ দেশ-কালের সৃষ্টি। দেশকাল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কবিমানসের বিশেষ আধারে রসসিঞ্চিত করে সমকালীন সমাজের জন্যই তিনি সাহিত্য পরিবেশন করেছেন। জনসমাজবহির্ভূত কোনো নির্জন দ্বীপে লালিত হলে ঐ মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিফলন থেকে যে-মানসিকতা সঞ্জাত হতো, আমাদের পরিচিত কবিচিত্ত থেকে তা হতো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রমানসের বিরোধ-বৈপরীত্যের বিচারে তৎকালীন সমাজের বিরোধ-বৈপরীত্যের বিশ্লেষণ তাই পূর্বিতার দাবী রাখে।

অন্য সব মহৎ সৃষ্টির মতই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিরও মূলে আছে বিততি ও দ্বান্দ্বিক বিরোধ। মন-সমাজ-সাহিত্যকর্মকে, বিশেষ কোনো মত অনুযায়ী,—থিসিস্-য়্যান্টিথিসিস্-সিন্থিসিস্ রূপে সরলীকৃত না-করেও বলা চলে, শিল্প-সাহিত্যকর্ম যেহেতু

সাযুজ্য-ইচ্ছাসঞ্জাত, সেই হেতু শিল্পী ও সাহিত্যকর্মী মাত্রেই বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত। নিঃসঙ্গতাবোধ, বিরহ-বেদনা, বিচ্ছেদ-বিলাপ আদিসাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা। আদি কবি ক্রৌঞ্চ-বিরহ ব্যথায় শুধু ব্যথিত নন, আত্ম-কৃতকর্মের ফলভোগী হিসেবে পরিবারচ্যুত। 'মা-নিষাদ' শ্লোকে ক্রৌঞ্চ মিথুনের বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে বাল্মীকির বিচ্ছিন্নতার আর্তনাদ শোনা যায় নাকি? কুরুক্ষেত্রের ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত সংগ্রামের মহাকাব্য রচনায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মইতিহাস ও নিঃসঙ্গ শৈশব কি কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি? অধিকাংশ মহাকাব্যের গল্পাংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নায়ক ভাগ্য-বিরূপতায় বা দেব-দেবীর অভিশাপে দেশ, সমাজ বা পরিবার থেকে বিযুক্ত হয়ে জীবনপণ সংগ্রামের বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংযুক্তির জন্য সচেষ্ট। বিচ্ছিন্নতা—বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগ্রাম—বিচ্ছিন্নতার নিরসন; Fission—Feud—Fusion,--এই তো সভ্যতার প্রথম পর্বের মহাকাব্যের মূলকথা। মহাকবির মনে ঐ ধরনের দ্বন্দ্ববিরোধের অস্তিত্ব অনুমান করা কি অলস কল্পনা? ক্রমশ সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কবিমনেও জটিলতা দেখা দিতে থাকে। এখন আর শুধুমাত্র আদিম শ্রেণীহীন বর্বর সমাজে, (যেখানে ব্যক্তিমানস মিলিত ছিল গোষ্ঠীমানসে) ফিরে যাবার আকুতি নয়, ব্যক্তিত্ব সহস্রদলে বিকশিত হয়ে অখণ্ড সত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শিল্পে ও কাব্যে প্রকাশ পাচ্ছে সেই ব্যাকুলতা। নতুন সমাজের প্রগতিশীল ভূমিকার ধারক ও বাহক শিল্পী-সাহিত্যিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এখন সচেষ্ট। এখন ডায়োনিসাসের খণ্ডিত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন সত্তার অখণ্ড ও সম্পূর্ণ হবার প্রয়াসের পাশাপাশি দেখা দিচ্ছে 'Apollonian entertainment' ভিত্তিক শিল্পসাহিত্য। শিল্পী এখন দর্শকের সঙ্গে অভিন্ন হতে চায় না, তার আত্মসচেতনতা বজায় রাখতে উন্মুখ, ব্যক্তিত্ব বিলোপে পরাঙ্মুখ। এ-হলো ধনতন্ত্রের প্রথম পর্ব। পরবর্তী পর্বে —বুর্জোয়াশ্রেণীর অবক্ষয়ে যান্ত্রিক দুনিয়ায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ, মানুষ যন্ত্রাঙ্গে পরিণত। শিল্পী-সাহিত্যিক বিচ্ছিন্নতাপীড়িত, নতুনতর সমাজ ব্যবস্থার জন্য আকুল,—যেখানে ঘটবে বিচ্ছিন্নতার উত্তরণ।

রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সমাজ-বিচ্ছিন্নতা, এবং রবীন্দ্রমানসে ও রচনায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার অগ্রাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রজীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্টদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক

পর্যন্ত বিস্তৃত : সাহিত্য-জীবনের ব্যাপ্তিও সুদীর্ঘ—প্রায় ষাট বছর। বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই সময়ের মধ্যে অনেক পটপরিবর্তন ঘটেছে, অনেক ইতিহাস রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানসাকাশে কালের কুটিল গতি তার ছায়া ফেলেছে, সেখানেও ঘটেছে পটপরিবর্তন, রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন 'বেঁচে' ছিলেন। খুব কম লোক সম্পর্কেই এ-কথা বলা যায়। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেঁচে ছিলেন না, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে বেঁচেছিলেন। অবশ্য নিজস্ব ভূমিকায়। বাংলাদেশের সমাজে তথা ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রমের কাঠামো ভেঙে খুব বড় রকমের কোনো পরিবর্তন না-ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মানসরাজ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; কেননা তিনি সারা পৃথিবীর পরিবর্তনের ছবি নিজের মানসমুকুরে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যকৃতিতে এই পরিবর্তন লিপিবদ্ধ ও রেখায়িত হয়ে আছে।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কিশোরকে 'শেষলেখা'র বৃদ্ধের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর; আর সেইটেই হচ্ছে রবীন্দ্রমানসের সবথেকে গৌরবোজ্জ্বল দিক। পুরাতনকে নিষ্করুণ-ভাবে বর্জন, নতুনকে গ্রহণ, অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ; সারাজীবন তিনি এইভাবে সমকালীনত্ব বজায় রেখে গেছেন। আশি বছরের কবি আঠারো বছরের কবির কাছে হার মানতে চান নি। অগ্রগামী পথচারীদের সঙ্গে, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষাই যেন রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। চলমান জীবনধারা থেকে মুহূর্তের বিচ্ছিন্নতায় কবিমন কাতর হয়ে বিচ্ছিন্নতা-বিলোপের সংগীত গেয়ে উঠেছে। জীবনের প্রথমদিকের কবিতা ও শেষদিকের কবিতা ঐ এক বিষয়ে পরস্পরের আত্মীয়।

সাধারণ মানুষের মন শৈশবে বা প্রথম যৌবনে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষীণ ভাবধারার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; জীবনের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে প্রত্যাগতি না-ঘটলেও, অগ্রগতি ঘটে না। চক্রাকার পুনর্বৃত্তি ঘটতে থাকে জীবনে এবং সেই সংস্কার-মোহাচ্ছন্ন মানসিক পুনর্বৃত্তিতেই আত্মসন্তোষ লাভ করে। সংকীর্ণ গণ্ডী, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে, নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখে; কাজেই বিচ্ছিন্নতার ব্যথা, নিঃসঙ্গতার বেদনায় বিচলিত হয় না। নিজের পরিধির সীমাবদ্ধতা থেকে এই মানুষ কোনোদিন মুক্তিলাভ করে না।

রবীন্দ্রমানসে এই বিধির বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত। কোনো গণ্ডী, গোষ্ঠী,

বা ভাবের সঙ্গে তিনি বেশিদিন একাত্ম থাকতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নতাবেদনা মর্মে বেজেছে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আকুল হয়ে উঠেছেন। এইভাবে একাত্মতার পরিধি ক্রমশ দিগন্তবিস্তৃত হয়েছে। বিযুক্তিবোধ—বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগ্রাম—নবস্তরে সংযুক্তি; সেই fission-feud-fusion: রবীন্দ্রমানসপ্রগতির এই হচ্ছে ডায়ালেকটিকস।

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সহজাত নয়, তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাস জাত। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ইতিহাস, তাঁর শৈশব-যৌবনের ইতিহাসের সঙ্গে বেশিরভাগ পাঠকই পরিচিত। সে-সময়কায় ইংরিজী শিক্ষিত নব্য ভাবধারায় দীক্ষিত বাংলাদেশের নাগরিকসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ও তাঁর জীবনীকারদের লেখায় নিঃসঙ্গতা-বোধ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই নিঃসঙ্গতাবোধের কারণ এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা। বিশেষ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের দরুন রবীন্দ্রনাথ জন-সাধারণের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন,—এ বোধ হয় বিতর্কাতীত সত্য। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও মরমী কবিচিত্ত একদিকে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের অভিলাসে ও বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের প্রচেষ্টায় সদাসচেষ্ট; অন্যদিকে অচলায়তনের নিগড়ে বাঁধা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ থেকে স্বকীয় মুক্তমনের বৈশিষ্ট্য, মার্জিত রুচি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অন্বিষ্ট। কবিমানসের এ-বিরোধ-বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে কোনো সময় স্পষ্ট, কোনো সময় অস্পষ্ট। এ-নিয়ে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন আছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার অনন্বয় ও সঙ্গে-সঙ্গে সমন্বয় সূত্রের সন্ধানে রবীন্দ্রমানস অস্থির ও চঞ্চল। অন্তর্বিষয়ী ও বহির্বিষয়ী যে-বৈপরীত্যের কথা তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন; যার একদিকের মন্ত্র "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" এবং অন্যদিকের বাণী—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—সে-বৈপরীত্যের মূলেও আছে অন্তর-জগত ও বহির্জগতের বিচ্ছিন্নতা। অন্তরসত্তা বহির্বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ চাইছে, বহির্বাস্তব অন্তরসত্তা থেকে বিরহের অবসান চাইছে। কিন্তু খাঁচার পাখি বনের পাখির মিলন ঘটছে না। এই মিলন ঘটলে রবীন্দ্রনাথ হয়ত মহর্ষির আরো উপযুক্ত পুত্র হতেন কিন্তু Dionysus আর Apollo—দুই দেবতার আশীর্বাদসিঞ্চিত রচনাধারা থেকে গৌড়জন বঞ্চিত হত। যুগবিচ্ছিন্নতা, সমাজবিচ্ছিন্নতার আর্তি কবিমানসে প্রতিফলিত হয়ে কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে

এবং কবি ও পাঠক দুজনেরই বিচ্ছিন্নতা-দ্বীপ থেকে উত্তরণের সেতু তৈরী হয়েছে।

মানুষের তৈরী এস্‌টাবলিশমেন্ট যখন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সমাজের চালিকাশক্তি বিধিনিষেধের নিগড় হয়ে প্রতিপদে চলার পথে বাধা জন্মায়। 'অচলায়তন' সেই বিচ্ছিন্নতার নাটক। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"—এই বাণীর মধ্য দিয়ে bureaucratic alienation দূর করার চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। 'রাজা' নাটকে আমরা দেখতে পাই ভুল রাজার গলার মালা দেওয়ার ফলে অর্থাৎ ভুল সংযুক্তির ফলে বিপত্তির উৎপত্তি। এবং এই বিপত্তি বা feud-এর মাধ্যমে সঠিক সংযুক্তি বা fusion। 'রক্তকরবী'—সকলেই জানেন, যন্ত্রযুগের বিচ্ছিন্নতার নাটক। অতি পরিচিত 'সোনার তরী' কবিতা চাষীর শ্রম-বিচ্ছিন্নতা ও শ্রমোৎপন্ন ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতার করুণ ছবি। আর 'সবুজপত্রে'র যুগে কবি নর-নারীর, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন 'স্ত্রীর পত্র' 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী'। বিচ্ছিন্নতার আলোচনার ইতি টেনে এখন রবীন্দ্রমানসের অন্য দু-একটা দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

শৈশবে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে পাশাপাশি যে-দুটি বিরোধী অথচ মিলনউন্মুখ স্রোত বর্তমান, তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। পিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ultra conformity নেই; বিরোধের ভাব থাকলেও সেটা প্রচ্ছন্ন। তাঁর সাহিত্যকৃতি ও মানসিকতায় আমরা তারই আংশিক প্রতিফলন দেখতে পাই। পিতা-পুত্রের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক নিয়ে আরো আলোচনার অবকাশ আছে।

'জীবনদেবতা' ও 'মানসসুন্দরী'র মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিচয় ছাড়া রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। জীবনদেবতা ও মানসসুন্দরী কি অন্তর্লীন জীবনবিরোধের প্রতীক? জীবনদেবতা কি ইন্দ্রিয়াতীতলোকের অধিবাসী? জীবনদেবতার আরাধনা কি higher form of transcendence-এর চেষ্টা? মানসসুন্দরী কি বহির্বাস্তব ও ইন্দ্রিয়াতীতলোকের মধ্যবর্তী অন্তর্লোকবাসিনী, যার সাহচর্যে বাস্তব আর অবাস্তবের দ্বন্দ্বের সাময়িক নিরসন ঘটে?

রবীন্দ্রমানস চর্চায় রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের বহু-আলোচিত সৃষ্টি, তাঁর ছবির মর্মার্থ অনুধাবন চেষ্টা অপরিহার্য। তাঁর ছবির দুর্বোধ্যতা এবং অঙ্কন

পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উক্তি থেকে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বক্তব্য: রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। একালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে খাপছাড়া। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবে গোড়াতেই মাথায় আসে। তারপর ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আর ছবি আঁকা প্রণালীটা ঠিক উল্টো, রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপর যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পৌঁছোয় মগজে। এ-থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কবিতা সংজ্ঞান-সৃষ্ট, পরিকল্পিত আর ছবি নির্জ্ঞান-সৃষ্ট, অপরিকল্পিত। আর্নষ্ট ফিশারের উক্তি পুনরুক্ত করছি: For make no mistake about it,...work for an artist is a highly conscious rational process at the end of which the work of art emerges as mastered reality—not at all a state of intoxicated inspiration। মত্ত প্রেরণার intoxicated inspiration-এর কথা রবীন্দ্রনাথ না-বললেও, তিনি যে ছবি আঁকার ব্যাপারে অস্বেচ্ছিক প্রেরণা তাড়িত, এইরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মানসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তির সম্পর্ক কি? এ-উক্তির মধ্যে কতখানি মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্য নিহিত? একই মানুষের কবিতা লেখার ও ছবি আঁকার প্রেরণা ও পদ্ধতি বিপরীত ধরনের হওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে তার কারণ কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর রবীন্দ্রমানস-বিশ্লেষণে আমাদের বিশেষ সহায়ক হবে, তাছাড়া শিল্পসৃষ্টির উৎস ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করবে।

আমরা শিল্পী বা কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ মূল্য দিয়েও তার সামাজিক পরিবেশকে তার সৃষ্টির মূল প্রেরণা বলে মনে করি। মানসিকতাও আমাদের মতে প্রধানত সমাজবাস্তবনির্ভর। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার অভ্যাস অনেকদিনের হলেও, প্রধানত ১৯২৬।২৭ সাল থেকেই তিনি ছবিকে আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বাহন সব থেকে পুরণো, আদিম যুগের আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি। অনেক অস্পষ্ট চিন্তা, অস্ফুট ভাব, যা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না, রং ও রেখা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায়। আদিম গুহামানবের চিন্তাধারা, মানসিক ভাবসম্ভার নিঃসন্দেহে ছিল আদিম ও অপরিণত। অন্য কোনোভাবে তার অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না। এর পর ভাষা; প্রথমে ছন্দোবদ্ধ,

তারপর ছন্দের বন্ধনমুক্ত শব্দসম্ভার ভাবপ্রকাশের বাহন হল। তখনো কিন্তু চিত্রশিল্প, এই আদিম পদ্ধতি, গুরুত্ব সহকারেই ভাবের বাহন হিসেবে টিঁকে রইল। তার বাইরের ফর্মের রদবদল অনেক ঘটল কিন্তু দর্শন-ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিল্প রং ও রেখার উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকল। উৎপাদনব্যবস্থার ও ফলে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা, দুর্বোধ্যতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানবমনের জটিলতা, অস্থিরতা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, অস্ফুট, অস্পষ্ট, অপরিণত দুর্বোধ্য চিন্তা ও ভাব মানসিকতাকে যতই সংক্রামিত করতে লাগল, ভাবাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়ল। এবং চিত্রশিল্প বিমূর্ততা ও absurdত্বের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের ছবি কোন শ্রেণীতে পড়ে? খাপছাড়া? উদ্ভট? অমূর্ত? যে-শ্রেণীতেই ফেলা যাক না কেন, মনোবিজ্ঞানীর কাছে এগুলো অস্পষ্ট, অস্ফুট এবং দুর্বোধ্য চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ। এই চিন্তাভাবনার উৎস তদানীন্তন পৃথিবীর সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, অস্থিরতা। ১৯২৬ থেকে তিনি নতুন দৃষ্টি দিয়ে যেন পৃথিবীকে দেখতে শুরু করেছেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা, নতুন সভ্যতার দেশ সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে অনেক নতুন চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে। তিনি ফ্রয়েড, রলাঁ, মুসোলিনী, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন। প্রথম যুদ্ধের ভয়াবহতা স্মৃতিতে রয়েছে; আবিসিনিয়া, স্পেনও কোরিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের নতুন ভয়াবহ নাটক অভিনীত হচ্ছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলেছে। এদিকে তাঁর দেশে কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার মধ্যে মানুষের হিংস্রতার নগ্নরূপ ফুটে উঠছে। শিল্পীমনে সাধারণত এই অবস্থায় প্রথমে জাগে অস্থিরতা; তারপর আসে অবসাদ। এ-যুগের প্রসিদ্ধ নাট্যকার বেকেট বলেছেন, সামাজিক অবস্থা যত আতংকজনক হয়, শিল্প তত বিমূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীর বিশেষ মানসিক গঠন ও সামাজিক সচেতনতার উপর শিল্পের প্রকাশরূপ নির্ভরশীল। বেকেটের উক্তি আংশিক সত্য। প্রথমে সংবেদনশীল শিল্পী আতংকজনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন; তাঁর মানসিক গঠন যদি দুর্বল হয়, মস্তিষ্ক যদি পাভলভীয় পরিভাষায় নিস্তেজনাপ্রবণ হয়, আর সামাজিক দুর্যোগ যদি বাড়তে থাকে তবে শিল্পী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে নিজের মধ্যে আত্মগোপন করেন। তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে এ্যালিয়েনেটেড, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও

অহংবাদী হয়ে উঠতে পারেন; অথবা শুধু ব্যর্থতা হতাশাকে ও সংগ্রাম-বিমুখীনতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। 'অ্যাবস্ট্রাকশন' ছাড়া অন্য কোনো বাহন তাঁর থাকে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতি-সংবেদনশীল মস্তিষ্ক, ঐ বয়সেও নিস্তেজনাপ্রবণ হয়নি। তিনি সমাজসচেতন, আশাবাদী, মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী; যদিও এ-বিশ্বাস, এ-আশা কোনো বিপ্লবী বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবতার জয়, মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান, মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে একাত্মতা, সর্বশেষে মানুষের মুক্তি—বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে, কসমসের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্তি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরকালের স্বপ্ন ও এর জন্যই আজীবন চলেছিল তাঁর সাধনা। তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ইডিওলজির বা মতবাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সংযোগসূত্রগুলো ছিল শিথিল। অত্যাচারীকে ধিক্কার দিয়েছেন, ঘৃণা করেছেন; কিন্তু তাকে অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত আগাছা বোধে নিঃশেষ করতে চাননি। অমানুষ, অত্যাচারীর মধ্যেকার মানুষটাকে জাগানো যেতে পারে—এ-বিশ্বাস হয়ত তিনি মনে-মনে পোষণ করতেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এই বিশ্বাসের খুব অনুকূল ছিল না। মানুষের বীভৎস, উদ্ভট রূপের কারণ কোথায়? মানুষের মনে, না মানুষের তৈরী সমাজে? মানবমনের নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, লোভাতুরতা, যুক্তিহীনতার মূল নিহিত শোষণভিত্তিক সমাজের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, যুক্তিহীনতার মধ্যে—মনোবিজ্ঞানের এই প্রতিফলনতত্ত্বের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত বা একমত ছিলেন না। অন্তত আমি তাই মনে করি এবং আমার এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিলমাত্র অশ্রদ্ধাসূচক নয়। এই কথাগুলো মনে রাখলে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা বোঝা অনেকটা সহজ হবে। বুর্জোয়া সভ্যতার অবক্ষয় ও বীভৎসতার কারণ যন্ত্র নয়, যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার ফলেই মানুষ বিচ্ছিন্ন ও যান্ত্রিক—এই তত্ত্বে তিনি অনীহ। দ্বিধাগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ ছবিগুলোর প্রায়শই নামকরণ করেন নি। সসংকোচে মাঝে-মাঝে চিত্রলেখা দেবীকে দু-একটি বাক্যে ঘিরে সীমাবদ্ধ করেছেন মাত্র। ছবির নামকরণ করে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা বা মুহূর্তকে তার মধ্যে ধরে রাখতে চান নি। ধীরে-ধীরে আঁকিবুকি কাটতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কলমে যুক্তিহীন উদ্ভট অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের অমূর্ত অদ্ভুত চিত্র ফুটে উঠেছে। যেন গুহাবাসী

মানবের কবরখানা থেকে অতীতের ভয়াবহ প্রেত বেরিয়ে এসেছে। আমার মতে ছবিগুলো কিন্তু অতীতের নয়, অদৃষ্টপূর্বও নয়। বীভৎস যুক্তিহীন শোষণ-ভিত্তিক সমাজেরই দৃশ্যপট। রূঢ় বাস্তবের ঐসব দৃশ্য, এইসব চিত্র তিনি দেখতে চান নি, সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন; দেখলেও ভুলতে চেয়েছেন: কাজেই সমাজবাস্তবের এই দিক তাঁর মস্তিষ্কে অস্পষ্ট, অস্ফুট, অপরিণতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের এ-অধঃপতন তাঁর অন্তরাত্মার অনুমোদন লাভ করেনি। তাই, মস্তিষ্কে integrated হয়নি। প্রকাশের জন্য তার projective motor discharge-ও তাই কিম্ভূতকিমাকার রূপ নিয়েছে। প্রকাশ অটোমেটিক মনে হয়েছে। তিনি মানুষের ভবিষ্যতে আস্থা হারাতে চান না, কেননা সেটা পাপ; কিন্তু আস্থা বজায় রাখার যন্ত্রণাও কম নয়। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। পুরণো ধর্মের নামে মানুষকে মেলানো যাবে না, তাই নতুন 'মানুষের ধর্ম' অন্বেষণ করেছেন। পশ্চিমী যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে যে মেলাতে পারে না—এ-বিষয়েও তিনি সুনিশ্চিত। এই সময়ে কবি বিশেষ মানসসংকটের মধ্য দিয়ে চলেছেন মনে হয়। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক সবল, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল। কাজেই ঐ-যুগেও সাহিত্যকৃতির মধ্যে তিনি যুক্তিবাদী, তিনি আশাবাদী, তিনি বাস্তবধর্মী। সুপরিকল্পিত ও সংজ্ঞা-পরিচালিত তাঁর রচনা। ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি অন্য মানুষ। যেন জানেন না কি বলতে চান, যেন বোঝেন না কি এঁকেছেন। খানিকটা হতাশা ও বিভ্রান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে মনে হয়। চিত্র শুধু চিত্রই—এই অভিমত জানিয়েছেন, বলেছেন চিত্রের জন্যই চিত্র। চিত্রের মধ্যে কোনো বক্তব্য নেই। কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই সময়ে রবীন্দ্রমানসের দুই বিপরীত ধারা পরস্পরকে আদৌ প্রভাবিত না-করে সমান্তরালভাবে প্রবহমান। দ্বৈত ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট।

সোনার তরী

'সোনার তরী' প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী নিবন্ধে লিখেছি, "অতিপরিচিত সোনার তরী কবিতা চাষীর শ্রমবিচ্ছিন্নতা ও শ্রমোৎপন্ন ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতার করুণ

ছবি।" এ-সম্পর্কে এবার বিশদতর আলোচনার চেষ্টা করছি। বিযুক্তিবোধ—বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগ্রাম—নবস্তরে সংযুক্তি; সেই fission—feud—fusion; রবীন্দ্রমানসপ্রগতির এই হচ্ছে ডায়ালেকটিক্স্। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সহজাত নয়, তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসজাত।

"If man was alienated, it was not because of some ideal consequence of the act of creation as such: it was because of the specific conditions of production in an historical period of social developmet"। বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে, উইলিয়ম্ এ্যাশের কথাগুলির সঙ্গে মার্কসবাদী মাত্রেই একমত। 'সোনার তরী'র (১৮৯২) কালে বিশেষ অবস্থাবিপর্যয়ে বাংলার চাষীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট; কেননা তার আর্থনীতিক শোষণ চরমে উঠেছে। কৃষি-অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিচ্ছে। "বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতির সৃষ্টির পিছনে অন্যতম কারণ ইংরেজ-অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় যারা জমি চাষ করে তারা জমির মালিক নয় এবং যারা জমির মালিক, তাদের জমি চাষ করে যারা, তারা জমির মালিককে উৎপন্ন অংশের এক বিরাট অংশ খাজনা বলে দিতে বাধ্য হয়। ফলে, ফসলের যে-উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চয়ে রূপ নিতে পারত, তা জমিদারশ্রেণীর ভোগবিলাসে ব্যয় হত আর চাষীকে উচ্ছিষ্ট সামান্য উপার্জনে দিন যাপন করতে গিয়ে গ্রাম্য মহাজনদের কাছে জমি থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বাঁধা রাখতে হত।" [রবীন্দ্রনাথ: ১৯৬১, পৃ ২৬৮, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়] শিল্পায়িত দেশের শ্রমিকের যে-অবস্থা মার্কস উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রত্যক্ষ করে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বৃটিশ ভারতের চাষীদের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ অনুভব করেছিলেন। অবশ্য এ-অনুভূতি কবির অনুভূতি, তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও এ-নিয়ে তাত্ত্বিক কোনো চিন্তার উদয় হয়েছিল কিনা জানা যায় না। মার্কসের মত এ-নিয়ে কোনো লেখা যে তাঁর নেই, এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। *সামন্তযুগের চাষীর তুলনায়, উপনিবেশী ভারতের, বিশেষ* করে 'পারমানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের' দৌলতে বাংলার চাষী শ্রম ও শ্রমলব্ধ ফসল—দুই থেকে বিচ্ছিন্ন। উৎপন্ন ফসলের উপর তার কর্তৃত্ব নেই, জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ মেটানোই যেন তার শ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের লাঠি আর মহাজনের আদালতের নিলামপরোয়ানা তার কাছে জমি

ও ফসলের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব। জমিতে ফসল বোনে, জমির সেবাও করে, কিন্তু জানেনা ঐ ফসল তার ঘরে উঠবে কিনা? এর বেশির ভাগই যে জমিদার-মহাজনের গোলাজাত হবে—এত সন্দেহাতীত। তার জন্য তার শ্রম নয়, তার ফসল নয়; শ্রমের জন্যই সে, ফসলের জন্যই সে। তাদের কাছে এখন "a definite social relatlon between men thus assumes in their eyes, the fantastic form of a relation between things" (**Marx**)। কিন্তু এই আন্তর্মানবিক সম্পর্কের স্রষ্টা তারা নয়, এই সম্পর্ক তাদের জন্যও নয়; কাজেই এর সবকিছুই দুর্বোধ্য, সবকিছুই রহস্যময়। "Membership in society determines the very nature of the individual human being, but this membership, as mediated by things, has become a mystery to him"। বৃটিশ প্রভুর দৌলতে উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার কৃষকের অবস্থা পুঁজিবাদের প্রথম যুগের শ্রমিকের মত। ঠিক সামন্তযুগের কৃষকের মত নয়; আবার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, শিল্পবিপ্লবের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। ভারতের অঢেল ঐশ্বর্য সাগরপারে গিয়ে মূলধন হিসেবে জমছে ও মুনাফা জোগাচ্ছে। এখানে শতকরা প্রায় সত্তর জন ভারতবাসী কৃষি-নির্ভর হয়ে প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে বিদেশী শিল্পপতিদের কাঁচামাল-জোগানদারীর কাজে নিযুক্ত। নিজের শ্রমের উপর, উৎপন্ন ফসলের উপর কর্তৃত্ব যত কমছে, ততই এরা অদৃষ্টনির্ভর জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। মাঝে-মাঝে এরা বিদেশী শাসক, দেশীবিদেশী শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে; কিন্তু সেই অপরিকল্পিত অসংগঠিত স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে; ফলে হতাশা—নিরাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে; আন্তর্মানবিক ও আন্তর-প্রতিবেশী সম্পর্কের অবনতি ঘটছে; বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি ঘটছে।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার এবং জমিদারের প্রতিভূ। আবার জমিদারদের মাধ্যমে বৃটিশ বণিকেরও প্রতিভূ, কেননা তাদের দেওয়া রাজস্ব বৃটিশ বণিকের মূলধন জোগাচ্ছে। শিলাইদহে বোটে অফিস বসিয়ে জমিদারীর তত্ত্বাবধান করছেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ খাজনা আদায় করছেন, খাজনা আদায় তাঁর ধর্ম, খাজনা দেওয়া প্রজার ধর্ম। জমিদার প্রজার মধ্যে যে-ব্যক্তিগতসম্পর্ক কিছুদিন আগেও বিদ্যমান ছিল, পারমানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের কড়াকড়ির ফলে সে-সম্পর্ক এখন অবলুপ্তির পথে। প্রজার দুঃখদুর্দশার কথা শ্রবণ করে খাজনা মকুব করবার মত

হৃদয়বৃত্তি জমিদারদের মধ্যে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছে। অসহায়ত্ববোধ মনের গভীরে জমছে। জমিদার রবীন্দ্রনাথের নীতিবোধের সঙ্গে মানুষ রবীন্দ্রনাথের নীতিবোধের বিরোধ বাধছে। মানুষ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রজাকুলের দুঃখদুর্দশায় পীড়িত, কবি রবীন্দ্রনাথ তাদের বেদনায় সংবেদিত। কিন্তু এরাও কমবেশি বিচ্ছিন্ন। "The worker is alienated in his life ; but the non-worker, the bourgeois intellectual, is alienated in his thought" (Marx)। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কল্পনা করা যেতে পারে যে, তিনি এই সামাজিক অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাপীড়িত ; বিচ্ছিন্নতানিরোধের জন্য সচেষ্ট। আবার মার্কসের কথায় আসতে হয়। ব্যক্তি যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হবার পথ খোঁজে ; প্রতিটি দেশও তার নিজস্ব নিয়মে স্বকীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার নিরসন চায়। "...in Germany through a philosophical extension of self consciousness ; in France through a political realisation of equality ; in Britain through a philosphical application of economic doctrine" (Marx)। ভারতের বেলায়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঔপনিষদিক মানবতাবাদের চর্চা ও প্রয়োগ বিচ্ছিন্নতার নিরসনের উপায় বলে মনে করা যায়। নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে দেখেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধনগত উপকরণের প্রতি মানুষের দুর্নিবার লোভের ফলে মানুষের অন্তর উপেক্ষিত, অবহেলিত। সভ্যতার সংকটের ফলে আন্তরিক দৈন্য, পারস্পরিক প্রীতি-সহানুভূতির অভাব, হার্দিক যোগাযোগ-সূত্রের বিনাশ ঘটেছে ; একথা তিনি অনেকবার বলেছেন। এ-সবই বিচ্ছিন্নতার ফল, আমরা জানি।

এবার 'সোনার তরী'র প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। চাষীর চৈতন্যজগতের বিচ্ছিন্নতা ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসঙ্গে মার্কস-এর সুপরিচিত লাইনগুলো মনে করতে পারি : "In religion, the spontaneous activity of the human imagination, of the human brain and the human heart, operates independently of the individual—that is, operates on him as an alien, divine or diabolical activity....it belongs to another, it is the loss of his self...."

সবকিছুই—শ্রম, শ্রমোৎপন্ন ফসল, চৈতন্যোদ্ভূত ঈশ্বর—তার থেকে স্বতন্ত্র এবং

তার থেকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। 'স্বকীয়তা', 'নিজস্বতা' বলে তার কিছু নেই। স্বতঃস্ফূর্ত কর্মতৎপরতা নষ্ট হয়েছে। নিজেকে কাঁধে জোয়াল-দেওয়া কলুর বলদ মনে হচ্ছে। চাষীদের এই মনোভাবই যেন ধ্বনিত হচ্ছে রামপ্রসাদের কণ্ঠে,—'মা আমায় ঘোরাবি কত, চোখ বাঁধা বলদের মত'। বাইরের জমি চাষ করে কোনো ফয়দা হচ্ছে না, কোনো ফসল মিলছে না বলেই তিনি 'মানব জমিন' বা 'মানস জমিন' চাষ করতে চান—যেখানে সোনা ফলার সম্ভাবনা। স্বচক্ষে চাষীদের দুঃখদুর্দশা অসহায়ত্ব দেখছেন কবি কিন্তু অন্যায়-অবিচার প্রতিকারের নির্দিষ্ট কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রতিকার তাঁর একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। আউল-বাউলদের গানে, সুফীদের ধর্মাচরণে তাঁর অসীম আগ্রহ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ / তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মাগৃধ কস্য চিদ ধনম্॥" ঈশোপনিষদের এই প্রথম মন্ত্রটি জপ করে তিনি দ্বন্দ্ববিরোধ কাটাবার চেষ্টা করেন ; "য ওষধিষু য বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নম" মন্ত্র আউড়ে, গায়ত্রী জপ করে মানসিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হতে চান। নিখিলবিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধের আকুলতা ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতাবোধ কিন্তু নিরসিত হচ্ছে না, নিজেকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দিতে পারছেন না।

বোট থেকে যেমন অনন্ত আকাশ, চলমান নদীকে দেখছেন, তেমনি দেখছেন ছোট-ছোট টুকরো জমিতে শ্রমরত চাষীদের। তারা উদয়াস্ত শ্রম করেছে, রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা সারা হয়েছে। বসন্তের দিনে কল্পনায় দেখলেন গগনে বরষাসূচক ঘন মেঘ। কী এক দুর্যোগের ইঙ্গিত। কূলে একা বসে কোনো ভরসা নেই এই দুর্যোগরোধের। এই 'আমি' শ্রমহৃত চাষী। তার সঙ্গে আত্মীভূত কবি 'একখানি ছোট খেতে একেলা'—বাইরের জগৎ থেকে ক্ষুরধার নদীর বাঁকা জল দিয়ে বিচ্ছিন্ন। লোকালয় অনেক দূরে, ঐ পারে অস্পষ্ট ঝাপসা। রাশি রাশি ধান কাটা হয়েছে ;—গতি কি হবে? চাষীরা বেশির ভাগ ছোট টুকরো জমিতে একক প্রচেষ্টায় ফসল ফলায়। ফসল ফলানো তবু সোজা, কিন্তু সেই ফসল ঘরে তোলা সহজ নয়। ঘর তো অদূরে—কিন্তু দুস্তর ক্ষুরধার নদীর ব্যবধান ঘরকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। শ্রমোৎপন্ন ধান নিজের গ্রামে, নিজের ঘরে তোলবার উপায় নেই ; পথে অনেক বাধা। ক্ষুরধার নদীর বাধা, বাঁকা জলের বাধা। জমিদার-জোতদারের আমলা-গোমস্তা-বরকন্দাজ ক্ষুরধার নদীর মত শক্তি ধরে। মহাজনের খত তমসুক আদালতের আইন—

বাঁকা জলের মত কুটিল। 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ধান দিয়ে কি হবে? বিদেশগামী যাত্রীর কাছে সোনার ফসল গছিয়ে দুর্যোগ এড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এ-যাত্রী শক্তিশালী, বলদৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। ভরাপালে গান গেয়ে নিরুপায় ঢেউগুলির মাথার উপর দিয়ে সে এগিয়ে আসছে। ঘন দুর্যোগের মুখে যে ভরাপালে গান গাইতে পারে—সে নিশ্চয়ই শক্তিশালী, বলদৃপ্ত এবং আত্মপ্রত্যয়ী। তার কাছে আত্মসমর্পণ করা চলতে পারে। কিন্তু কে সে? ঘনায়মান দুর্যোগমুহূর্তে যার উপর নির্ভর করতে চায় একখানি ছোট খেতে একত্ববোধ পীড়িত এই "আমি"। 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'—এই যাত্রী ইয়োরোপীয় যন্ত্রশিল্পী, বিজ্ঞানকুশলী। কিছুদিন পূর্বেই কবি ইংলণ্ড থেকে ফিরেছেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতে চঞ্চল হয়েছেন। ভারতীয় চাষীর দুর্দশা মোচনের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়ন ও কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ। পরবর্তীকালে কবি এ-নিয়ে অনেক লিখেছেন, অনেক বলেছেন। চিন্তাশীল ও সমাজতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের অনেক পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথের মনে অস্ফুট-ভাবে জেগে উঠেছে পাশ্চাত্যের সঙ্গে লেনদেনের এই ছবি। কিন্তু কবির দৃষ্টি ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করে অনেকদূর অবধি দেখতে পাচ্ছে। জমিদার-জোতদার-মহাজনদের বন্ধন থেকে চাষীর তথা দেশের মুক্তি শুধু পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের আবাহন, শুধু প্রকৃতির উপর আধিপত্যকারী বিজ্ঞানের আরাধনা দ্বারাই সম্ভব কি? ধনতন্ত্রের শোষণপদ্ধতি দেখে গণতন্ত্রের সব চমক চিন্তাবিদের মন থেকে তখন মুছে যাচ্ছে। রামমোহন থেকে দ্বারকানাথ যে-উদারনীতির গুণগান করে গেছেন, সেই উদারনীতির পাশাপাশি চণ্ডনীতির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ থেকে আহৃত সম্পদ বৃটেনের শিল্পপতির যন্ত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে; ভারতের কোনো লাভ হয় নি। সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা হল, স্বেচ্ছায় সোনার পণ্য তার ঢেউভাঙা জাহাজে তুলে দেওয়া হল; কিন্তু সে-জাহাজের যাত্রী হতে পারা গেল না। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটে সে তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।...যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

অন্য দিক। চাষী জমিদার-মহাজনের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বুর্জোয়া মানুষকে, যে গান গেয়ে তরী বেয়ে আসছে; তাকে সে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু এই বুর্জোয়া ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তও তার ফসলকে আত্মসাৎ করে, তাকে নৌকায় তোলে না। সে একা পড়ে থাকে। এর অনেক পরে প্রমথ

চৌধুরী মহাশয়ের বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে তো তিনি এই ভয়ের কথা তুলেছিলেন। জমিদারী ব্যবসায়ের অবসান ঘটিয়ে খোলাবাজারে জমির কেনাবেচা হলে ছোট ক্ষেতের চাষী লাভবান হবে না। 'নতুন মালিকানার সৃষ্টি হবে, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না।' তিনি মনে করতেন, একমাত্র সমবায়-প্রথাই সমস্যা সমাধানের উপায়—বিচ্ছিন্নতা বিনাশের অমোঘ অস্ত্র। নানা স্তরের বিরোধ-দ্বন্দ্বের ফলে কবিমানস কবিতা-জন্মের অনেক আগে থেকেই আলোড়িত হচ্ছিল। জমিদার-কবি, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—ইত্যাদি সাময়িক দ্বন্দ্বমূলক উদ্দীপক সম্পর্কে কবি অনবহিত ছিলেন, মনে হয় না। কিন্তু এদের ঘাত-প্রতিঘাত, বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ফলেই যে মনের গভীরে ছন্দোবদ্ধ কবিতার উন্মেষ ঘটেছে, বিচ্ছিন্নতার সাময়িক নিরসন সম্ভব হয়েছে—এই বিষয়ে কবি সচেতন ছিলেন না। অতি স্থূল বাস্তবকে কবিতার উৎস মনে করা সে-সময় রেওয়াজ ছিল না।

'সোনার তরী'র ধান—চাষীর নয়, মার্কস-এর ভাষায়—"It belongs to another ; it is the loss of his self".

সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটছে, যন্ত্রশিল্পের পত্তন হচ্ছে ; কিন্তু আজও শ্রমোৎপন্ন ফসলের সঙ্গে ছোট ক্ষেতমালিকের সংযুক্তি ঘটে নি। কবি সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

অন্তরঙ্গতা ও কসমিক বিচ্ছিন্নতা

রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে আগে লিখেছি : "কোনো গণ্ডী, গোষ্ঠী বা ভাবের সঙ্গে তিনি বেশিদিন একাত্ম থাকতে পারেননি। বিচ্ছিন্নতাবেদনা মর্মে বেজেছে ; বৃহত্তর জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আকুল হয়ে উঠেছেন। এইভাবে একাত্মতার পরিধি ক্রমশ দিগন্তবিস্তৃত হয়েছে। বিযুক্তিবোধ—বিচ্ছিন্নতা নিরসনের সংগ্রাম—নবস্তরে সংযুক্তি ; fission—feud—fusion :—রবীন্দ্রমানসপ্রগতির এই হচ্ছে ডায়ালেক্‌টিক। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সহজাত নয়, তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসজাত।" রবীন্দ্রনাথের নিজের ও তাঁর জীবনীকারদের লেখায়

নিঃসঙ্গতাবোধ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই নিঃসঙ্গতাবোধের কারণ এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা। বিশেষ পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের দরুন, রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এ বোধহয় বিতর্কাতীত সত্য। অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও মরমী কবিচিত্ত একদিকে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের অভিলাসে, বিচ্ছিন্নতা উত্তরণের প্রচেষ্টায় সদাসচেষ্ট ; অন্যদিকে অচলায়তনের নিগড়ে বাঁধা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ থেকে স্বকীয় মুক্তমনের বৈশিষ্ট্য, মার্জিতরুচি ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য এর সমর্থনে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়—সাধারণত মানুষের সঙ্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়—আমার চারিদিকেই এমন একটা গণ্ডী আছে, যা আমি কিছুতেই লঙ্ঘন করতে পারিনে।…অথচ মানুষের সংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাও নয়—থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ, সেও যেন প্রাণ-ধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাসে যারা সংকটের দ্বারা মনকে ভ্রান্ত করে দেয় না, এমন কি যারা আনন্দ দান ক'রে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।" প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, জীবনের সন্ধ্যায় লিখিত কবির 'ঐকতান' কবিতায় এই কথারই প্রতিধ্বনি।

কবির কবিতা বিচিত্রপথে আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু সর্বত্রগামী হয়নি। এই সর্বত্রগামী না-হতে পারার ব্যাখ্যা ঐ-প্রবন্ধের শেষের দিকে এইভাবে দিয়েছি: "তিনি সমাজসচেতন, আশাবাদী, মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী ; যদিও এ-বিশ্বাস, এ-আশা কোনো বিপ্লবী বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবতার জয়, মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে একাত্মতা, সর্বশেষে মানুষের মুক্তি,—বিশ্বনিখিলের সঙ্গে, কসমসের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্তি—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরকালের স্বপ্ন ও এর জন্য আজীবন চলেছিল তাঁর সাধনা।"

কসমসের সঙ্গে, বিশ্বনিখিলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা নিয়ে আলোচনার যে-সূত্র আগেই তুলে ধরেছি, সেই সূত্র ধরে আরো কিছুদূর অগ্রসর

হতে চাই। এই বিচ্ছিন্নতাকে কেউ-কেউ কসমিক বা 'এক্‌জিস্‌টেনশিয়াল আউটকাষ্টনেস্' বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম-মৃত্যু-জীবন নিয়ে প্রচলিত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ধারণা সব মানুষকে প্রভাবিত করে, কবিকে তো করবেই। বলা হয়ে থাকে, ধার্মিক ব্যক্তির উপর এই ধরনের প্রভাব বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। যিনি ঈশ্বরে ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী, তাঁর জন্মমৃত্যু দিয়ে সীমিত জীবনকে "a short time spent in a physical world with inscrutable void on the other side" মনে হবে না। মনে হলেও এই ধরনের চিন্তা বিশ্বাসীর জীবনকে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করবে না। পশ্চিমী-সভ্যতাপুষ্ট মানুষ সাধারণত জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির ভাবধারায় আচ্ছন্ন। প্রাক্-বিজ্ঞান যুগে পাপকার্যে আসক্ত হবার ফলেই মানুষের মনে ঈশ্বর-ত্যক্ত বা স্বর্গোদ্যান থেকে পতিত হইয়েছে ; এই বিশ্বাসের উদয় হল। নানা উপাচারে ঈশ্বরের সন্তোষবিধান দ্বারা পাপস্খালন করে ঈশ্বরের সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। উনিশ শতকের পূর্বে আমরা যাকে বলি কসমিক বা 'এক্‌জিস্‌টেনশিয়াল আউট্‌কাষ্টনেস', তদনুরূপ কোনো মানসিক অবস্থা খুবই বিরল ছিল। বর্তমানে অস্তিবাদী ভাবধারা প্রসারলাভ করেছে। জীবনের অস্তিত্বের কোনো সুসংগত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র বিজ্ঞানের যুগে যাদের ছিন্ন হয়েছে, তারা মনে করছে যে, এই মরজীবনের কয়েকটি বছরের অস্তিত্বের কোনো অর্থ আরোপ যদি করতেই হয়, সে-অর্থ মানুষকেই আবিষ্কার করতে হবে। স্বভাবত সে-অর্থ হবে একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্যের জীবন বা ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সর্বগ্রাহ্য অর্থ বা সত্য কিছু নেই। "Truth is subjective and solipsistic।"

সেদিন আর নেই, যখন মনে করা যেত যে, এক বিজ্ঞ পরমকারুণিক পরমেশ্বর অনেক ভাবনা-চিন্তা করে মানুষের জন্য এই বিশ্বনিখিল সৃষ্টি করেছেন ; যেখানে সত্য অবজেক্‌টিভ এবং সেই সত্যকে আশ্রয় করে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এইসব কথা পশ্চিমী দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিকরা প্রচার করছেন এবং ইয়োরোপ-আমেরিকায় এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। কিয়ের্কেগার্ড অস্তিবাদী দর্শনের জনক। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর এই নতুন বিষয়ীগত (সাবজেক্‌টিভ) ধ্যানধারণা ক্রমশ শিল্পী-সাহিত্যিককে বিশেষভাবে সংক্রামিত করেছে। কামু, সার্ত্র, জ্যাসপার, রিলকে, ক্লাউস, কাফকার সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে 'কসমিক

আউটকাইনেস' প্রতিফলিত ; রবীন্দ্রনাথ এদের সকলের না-হলেও, অনেকেরই প্রায় সমসাময়িক। কসমিক বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা এবং প্রকাশ পেয়ে থাকলে সেই প্রকাশের কোনো পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা—এই আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক হলেও, ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নধর্মাবলম্বী। উপনিষদের ব্রহ্ম ও আত্মার ধারণা বোধ হয় কিশোর বয়স থেকে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। সৃষ্টিস্থিতিলয় সবই ব্রহ্মাশ্রিত। বিশ্বনিখিল ব্রহ্ম হতে সৃষ্ট, ব্রহ্ম-কর্তৃক রক্ষিত, আবার ব্রহ্মে গিয়ে লীন হচ্ছে। কর্মফলে মানুষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। জন্মজন্মান্তর ধরে কর্মস্রোত প্রবাহিত। তবে মুক্তিরও নির্দেশ আছে। মুক্তির উপায় ব্রহ্মোপলব্ধি। তাঁকে জেনে জীব মরণ এড়ায়। মরণ এড়ালে আর জন্মলাভ করতে হবে না, অস্তিত্বের যন্ত্রণাভোগও থাকবে না। পশ্চিমী ধ্যানধারণার সঙ্গে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু-কিছু জায়গায় মিলও রয়েছে। দ্বয়বাদী ধ্যানধারণার মূলগত ঐক্যকে অস্বীকার করা চলে না। হিন্দুদর্শনের মায়াকে যদি Phenomenon বলি, আত্মাকে Noumenon বলতে পারি। আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, পশ্চিমী দর্শন ও জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির ভাবধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কসমিক ধারণা বোধহয় এদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সর্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা এবং মৃত্যুর পর আত্মার যেকোনো জৈব বা অজৈব বস্তুতে বিচরণ বোধ হয় ভারতীয় চিন্তার এক বিশিষ্ট দিক। কাজেই অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বনিখিল সংক্রান্ত চিন্তায়, জন্মমৃত্যু-রহস্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী কবি-দার্শনিকদের সঙ্গে কিছু-কিছু মিল থাকলেও, অমিল ও পার্থক্য যথেষ্ট থাকবার কথা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি ও দেশের অগণিত লোকের দারিদ্র্য তাঁর চিত্তলোককে স্বভাবতই ব্যথিত করেছে ও তাঁর জীবনদর্শনকে ও কাব্যকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। দেশকালের প্রভাব থেকে কোনো কবিই মুক্ত হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাবিচারে একথা উল্লেখ্য যে, তিনি নিজে হিন্দু প্রকৃতির সঙ্গে ইওরোপীয় প্রকৃতির কোনো বিশেষ বিরোধ দেখছেন না। "হিন্দু প্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির কোনো বিরোধ নাই ; কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব গোঁড়ামী ও কিম্ভূত-

কিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানিই যথার্থ অহিন্দু।" ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত, ভিন্নদেশের ভাবধারায় প্রোৎসাহিত, তবুও সমসাময়িকতার দরুন একইভাবে অনুপ্রাণিত, কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনিখিলচিন্তা, জীবন-মৃত্যুচিন্তা, পশ্চিমী চিন্তা থেকে অংশত বিভিন্ন আবার অংশত অভিন্ন। এই সম্পর্কে তুলনামূলক কোনো প্রবন্ধের মাধ্যমে যদি বিভিন্নতা অভিন্নতা দৃষ্টান্ত সহকারে কোনো রসজ্ঞ সমালোচক তুলে ধরতে পারেন, তবে রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে নতুন পথের পথিকৃৎ হবেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও অমরতা সম্পর্কে ধারণা এই প্রসঙ্গে এসে পড়বে। কসমিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে মৃত্যু ও অমরত্বের ধারণা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কুড়ি বছরের রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কবিতার বিষয়বস্তু করলেন কেন? মৃত্যু বিরহক্লিষ্টা রাধিকার কাছে শ্যামসমান। মৃত্যু বিচ্ছিন্নতা দূর করে অনন্ত প্রেমের বন্ধনে বিরহিনীকে অনন্তকাল ধরে রাখবে। মৃত্যু কিশোর রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় জীবনযন্ত্রণা এড়াবার উপায় নয়, মিলনানন্দ লাভের উপায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মীভূত হবার দুর্বার আকুতি কি রবীন্দ্রনাথকে 'মরণ' কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল! এর মধ্যে নৈরাশ্যবাদের ছায়া নেই, ব্যর্থতার বা বঞ্চনার জ্বালাও অনুভূত হয় না। এর মধ্যে পশ্চিমী 'আউটসাইডার'-এর মৃত্যুপ্রীতির লক্ষণ নেই। অমরত্বের বাসনা তরুণ কবিকে তাড়িত করেছে, এরকমই মনে হয়। 'প্রাণ' কবিতায় সুন্দর ভুবনে কবি মরতে চান না, মানবের মাঝে বাঁচতে চান। আরো অনেক সহজ ও স্পষ্টভাবে মৃত্যুকে অস্বীকার করার বাসনা। জন্ম ও মৃত্যু (নৈবেদ্য) কবিতা দুটিতে জন্ম-মৃত্যুকে অজানা-অচেনার জগৎ থেকে অতি-পরিচিতের স্তরে নিয়ে এসেছেন সুন্দর কয়েকটি পংক্তির মধ্য দিয়ে। জন্ম-প্রাক্কালে এ-জগৎসংসার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু "নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম | নিতান্তই পরিচিত—একান্তই মম।" মৃত্যুও অজ্ঞাত, কিন্তু তাতে ভীত হবার কি আছে? "মৃত্যুর প্রভাতে | সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার | মুহূর্তে চেনার মত।" জীবনকে যেমন ভালবেসেছি, জীবনান্তের জীবনকে তেমনিই ভালবাসব। মৃত্যুর পর এইরকমেরই অন্য একটি জীবন অপেক্ষা করছে। মৃত্যু জীবন থেকে জীবনান্তরে যাবার বাহন। মিথ্যাই ভয়। "স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে | মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে

স্তনান্তরে।" জন্মান্তরবাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস এই দুই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুভয় আছে, আবার সেই ভয় দূর করবার মাভৈ বাণীও আছে। অস্তিত্ববিলোপের ভয় জয় করবার অটোসাজেশন কবিকে অনেক দিতে হয়েছে। "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়? জয় অজানার জয়। ।" "মরণকে তুই পর করেছিস ভাই। জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই। দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে—তাইতে যদি এতই ধরে, | চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়। জয় অজানার জয়।" এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে, কবি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকেই চিরকালের আবাস ভাবছেন; এই ইহলোকে যেন দুদিনের জন্য প্রবাসে এসেছেন। ব্যক্তিসত্তাকে ব্রহ্মসত্তাতে লীন করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে যে-অমরতার বাসনা দেখা যায়, তা আমাদের দৃষ্টিতে অবাস্তব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় নয়। অন্য একটি সঙ্গীতে বলছেন, "মরণ সাগর পারে তোমরা অমর; | তোমাদের স্মরি | নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, | তোমাদের স্মরি | সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক। জয় হোক জয় হোক তারি জয় হোক।" ইহলোকে সত্যের অমর দীপ জ্বালিয়ে অমরত্বের বাসনা এ-গানে সহজভাবে ফুটে উঠেছে। যখন এপারে গান বা সাহিত্যকৃতির প্রসাদে অমরতার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তখন ওপারে যাবার আগে অভয়বাণীর সাজেশানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। অন্যথা গাইতে হচ্ছে, "জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর | জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর, শঙ্কর শঙ্কর।" কিন্তু কোনো সময়েই কবি দুঃখ বা মরণের কাছে পরাভব মানতে রাজী নন। "দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন— | পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন।" এই জীবনের ব্যথা এখানেই ফেলে রেখে দিব্যধামে প্রস্থান করবেন। এই ভাবে দুঃখ এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কবিচিত্তে বলিষ্ঠতার অভাব অনুভূত হচ্ছে কি? "মরণরে তোর নয় রে চিরন্তন—দুয়ার তার পেরিয়ে যাবি। ছিঁড়বে রে বন্ধন। | এ বেলা তোর যদি ঝড়ে, পূজার কুসুম ঝরে পড়ে, | যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন।" বলিষ্ঠতার অভাব নয়, ইহজীবন-পরজীবনের মধ্যে সংযুক্তিসাধনের কামনা প্রকাশ পাচ্ছে এই কথাগুলির মধ্যে। কসমিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সেই বিচ্ছিন্নতাবোধের নিরসনসঙ্গীত এইভাবে বহু রাগ-রাগিণীতে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। তা বলে কি এই ধরণীকে ভাল লাগে নি? সর্বদাই কি ইহজগতের বাসিন্দা হয়ে পরজগতের আকর্ষণ অনুভব

করেছেন? না। "যেতে যদি হয় হবে | যাব যাব যাব তবে।" এই ধরায় কত ভাবে কত কাজে সুখে দুখে লাজে গরবে বহুকাল কাটিয়েছেন, স্রোতে ভেলা ভাসিয়েছেন, আনমনে বেলা কাটিয়েছেন। কত ভালো লেগেছে উদারনভে সাদা কালো মেঘের মেলা। কিন্তু ডাক এলে মুহূর্তে পাট চুকিয়ে যাত্রার জন্য কবি প্রস্তুত। "দেওয়া নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা খসে যাওয়া বুকে | যাব চলে হাসিমুখে—যাব নীরবে।" এখানে ভাল লাগলেও, তিক্ততা স্পষ্ট না-হলেও কবি অন্যলোকের ডাকের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এই বৈরাগী মনোভাব আরো নানা গানে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। পশ্চিমী বিচ্ছিন্নতার কোনো আভাস এই মনোভাবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যখনই এই জগৎ-সংসারের মায়া-মরীচিকার অন্বেষণে তৃষ্ণার্ত মন ছুটতে চেয়েছে, যখনই প্রশ্ন জেগেছে, "পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কি আছে শেষে | এত সাধনা এত কামনা কোথায় মেশে?" তখনই রুদ্রস্বরে গেয়ে উঠেছেন, "যাত্রাবেলার রুদ্ররবে বন্ধনডোর ছিন্ন হবে। | ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে | মুক্ত আমি রুদ্ধদ্বারে বন্দী করে কে আমারে। | যাই চলে যাই অন্ধকারে ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যারে।" | জীবনসন্ধ্যায় মৃত্যুর অন্ধকারে পাড়ি জমাতে কখনই গররাজী নন কবি। ইহজীবনকে স্বীকার করে, অসংখ্য বন্ধনকে মেনে নিয়ে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সাহসের অভাব না-ঘটে, এই দিকে কবির সদাসতর্ক দৃষ্টি।

ভয় যে নেই এমন নয়। "দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও। | আমার দিকে ও মুখ ফেরাও।" অথবা "আর নহে আর নহে, | আমি করি নে আর ভয়।" ইত্যাদি লাইন ভয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু নিয়ে বারবার বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছে। 'জন্ম' ও 'মৃত্যু' কবিতার পর দুবছরের মধ্যেই 'জন্ম ও মরণ' (উৎসর্গ)-এর মধ্যে সেইভাবে অটোসাজেশন দেবার চেষ্টা চলছে। একমাত্র ক্রন্দন সম্বল করে এসে প্রবাসী কবি এই পৃথিবীতে স্নেহপ্রীতি পেয়েছেন; মানুষের প্রীতি তাঁর কণ্ঠ থেকে সঙ্গীত নিঃসৃত করেছে। এখানে প্রেমে বাঁধা পড়েছেন। তবু এখান থেকে চলে যেতে হবে বলে ভয় বা দুঃখের কিছুই নেই। নব নব প্রবাসে এইভাবে নূতন প্রেমে বাঁধা পড়তে তাঁর এতটুকুও দেরী হবে না। নব নব পুষ্পদলে ভুবনে ভুবনে তিনি বিকশিত হয়ে উঠবেন। এখানেই, এই ভুবনেই মৌরসি পাট্টা নিয়ে চিরকাল বসে থাকবেন

কেন? দেশে দেশে যার ঘর, তার আবার ভাবনা কি? একই জায়গায় স্থাণু হয়ে বসে থাকতে কে চায়? "কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে। এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে। বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে। তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"। পার্থিব অমরত্বের কাঙাল নন কবি। মৃত্যুর মাধ্যমে নব-নব জন্ম নিয়ে অনন্ত জীবনস্রোতে তিনি প্রবাহিত হতে চান।

উৎসর্গের বিখ্যাত কবিতা 'মরণ-মিলনে' কবির নির্ভীক মৃত্যুজয়ের স্বাক্ষর।

মরণ এখানে আবার ভানুসিংহের আমলের প্রণয়ী। চুপি চুপি ধীর পদে এসে কবির চোখে চোখ রাখতে চাইছে। প্রণয়ের এ-ধরন কবি পছন্দ করলেন না। মরণ আসবে, নিঃশব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন; এইভাবে মৃত্যুর কাছে পরাভব মানতে কবি রাজী নন। এই মহামিলনে কোন সমারোহ থাকবে না কেন? শ্যামের মত মুরলী বাজিয়ে মিলনের সংকেত জানাবে, এই ধরনের গোপন প্রণয়ের আর তিনি পক্ষপাতী নন। চোরের মত এসে তাঁকে অবশ করে হরণ করে নিতে তিনি দেবেন না। শ্মশানবাসী ত্রিলোচন নন্দীভৃঙ্গী ইত্যাদিকে বরযাত্র নিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে মিলনের জন্য আসবে। রক্তবসনে সাজিয়ে, বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে, কোনদিকে দৃকপাত না-করে তাঁকে সকল কাজের মাঝ থেকে প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে যাবে তাঁর ঈপ্সিত জীবনস্বামী; এই তাঁর প্রার্থনা! কোলাহলে, বাদ্যরোলে, আকাশ-বাতাস ভরে যাবে, ভূতনৃত্যে দশদিশি কাঁপতে থাকবে, এখানকার আত্মীয়-পরিজন চোখের জল মুছতে থাকবে, আর তিনি মহাআড়ম্বরে ঈশানের জ্বালাময় বিদ্যুৎচমকের মধ্যে মৃত্যুতরণীতে গিয়ে আরোহণ করবেন। "আমি ফিরিব না করি মিছে ভয়। আমি করিব নীরবে তরণ। সেই মহাবরষার রাঙা জল। ওগো মরণ, হে মোর মরণ।" কবিতাটি পাঠ করে আগেকার দিনের সতী-সাধ্বীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহমরণের ছবি মনে পড়বে। অবশ্য সেখানে মৃত্যুর ডাক আসত মৃত স্বামীর কাছ থেকে; এখানে ডাক আসছে ভূতনাথের কাছ থেকে! সেখানে সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে লোকাচার, সংস্কার এবং বিচ্ছেদের বেদনা; আর এখানে প্রেরণা দিচ্ছে "কসমিক এসট্রেঞ্জমেণ্ট" বা মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতা। বিশ্বনিখিলের অণুপরমাণু থেকে সৃষ্ট মরদেহ বিশ্বনিখিলে লীন হবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। জীবনের দুয়ারের

সামনে মৃত্যুর ভেরী বাজছে, খণ্ডজীবনের কাছে অখণ্ড জীবনপ্রবাহের আহ্বান এসেছে। আর দেরী নয়। অথবা বলা চলে, মৃত্যুকে প্রেমিকরূপে আবাহন করে মৃত্যুকে জয় করবার এই প্রচেষ্টা সবলের কাছে আত্মসমর্পণের এক সুন্দর কাব্যরূপ। এর মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়েছে। যা ঘটবেই, যা অপ্রতিরোধ্য, আগে থেকে তার চিন্তা করে তাকে সহনীয় করার প্রচেষ্টা কবির মধ্যে পরিলক্ষিত। একে একটি চিরাচরিত ভয় দূর করবার প্রথা বলা চলতে পারে। সেই অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু এর ফলে তাঁর কাছে শুধু সহনীয় নয়, মহান ও বরণীয়ও হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কসমিক বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যে রিক্ততাবোধ আছে, পাশ্চাত্য-দেশীয় তিক্ততা নেই। সীমাহীনের প্রতি আকর্ষণ আছে কিন্তু সীমাবদ্ধতার প্রতি ঘৃণা নেই। জুডিও-খ্রীষ্টীয় পাপবোধ রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিব্যক্তির মধ্যে নজরে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ সাবজেক্‌টিভ হয়েও আত্মকেন্দ্রিকতার কূপমণ্ডুক নন।

মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে Development estrangement বলেছেন, তার পরিচয় পাই '২৫শে বৈশাখ' কবিতাতে। জগতের মত ব্যক্তিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পুরণো সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বালকের মধ্যে শিশুকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধের মধ্যে যুবককে দেখা যায় না। আমেরিকার ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অনুসন্ধানী কেনিস্টন ছাত্রদের মধ্যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার সন্ধান পেয়েছেন। "These 'alienations' which I will call 'development estrangement' are critical and salient in the lives of alienated students but comparable, if milder, estrangement exists in the lives of all" (Keniston : The Uncommitted.)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একদিন ছিলেম বালক। তোমরা তাকে কেউ জান না। সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে, না আছে কারো স্মৃতিতে।" আবার অন্যত্র : "পঁচিশে বৈশাখ তারপর দেখা দিল আর এক কালান্তরে। তরুণ যৌবনের বাউল সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে।" আর এক পঁচিশে বৈশাখে যুবক রবীন্দ্রনাথ এসে সেদিনকার কিশোরের একতারাতে

চড়িয়ে দিলেন নতুন তার। আবার বিরোধ-সংক্ষোভের দিনে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথকে আবাহন করতে এসেছে নতুন তরুণের দল।

পঁচিশে বৈশাখ জন্মদিনের ধারাকে বহন করে মৃত্যুদিনের দিকে এগিয়ে চলে, ছোটো-ছোটো জন্ম-মৃত্যুসীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা গাঁথা হতে থাকে। রথে চড়ে এগিয়ে চলেছে কাল; পান সারা হলে পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে পদাতিক। চাকার তলার ধুলোয় ভাঙাপাত্র গুঁড়িয়ে যায়। নতুন পাত্র নিয়ে যে ছুটে আসে, সে নতুন রস পায়। "একই তার নাম | কিন্তু বুঝি সে আর একজন।"

কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ বা মানসিক কোনো ধর্মই স্বভাবগত নয়। জন্মসূত্রে পাওয়া মস্তিষ্ককোষের টাইপবৈশিষ্ট্য পরিবেশগত বিশেষ-বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষভাবে আত্মীকরণ করতে পারে, একথা কিন্তু অস্বীকার করা চলে না। ভারতীয় ঐতিহ্যবিশিষ্ট পরিমণ্ডল কবির অতিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুয়েরই সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই বৈপরীত্যের কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। অন্তর্বিষয়ী ও বহির্বিষয়ী এই বৈপরীত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি একদিকে "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" ও অন্যদিকে "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়",—উল্লেখ করেছেন। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ-প্রয়াসে কবি সততই সচেষ্ট। অন্তরসত্তা বহির্বাস্তব-বিচ্ছিন্নতার বিলোপ চাইছে, আবার বহির্সত্তা একই সঙ্গে অন্তরসত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা-নিরসনের উপায় খুঁজছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে। "ওরে তুই ওঠ আজি। | আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি। জাগাতে জগৎজনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে | শূন্যতল।" পলাতক বালকের বহির্বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন মানসের অলস মধ্যাহ্নের বাঁশী বাজানো বন্ধ হল। কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের অত্যাচারের সংবাদে বাঁশী ফেলে কবি গর্জে উঠলেন। 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দেবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সংসারের তীরে ফিরতে চাইছেন। আর অপরূপবেশ, নতুনতর আচার নিয়ে সঙ্গীহীন হয়ে সৃষ্টিছাড়ার মত দিন কাটাবেন না। কিন্তু কিছু পরেই দেখা গেল "বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার", তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। কেন বের হয়েছিলেন, তা যেন ভুলে গিয়েছেন। অনেকের মধ্যে, রূঢ়

বাস্তবের মধ্যে এসে আবার কল্পনা রঙ্গময়ীর ছলনায় মুগ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নয়, ব্যথিতের ক্রন্দন নয়, তাঁকে ডাকছে সেই রঙ্গময়ী। তিনি চলেছেন "তার কাছে জীবন সর্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে | জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।" আবার অজ্ঞেয় রহস্যময়তা বা অসীমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। মানুষের দুঃখে আত্মবিসর্জন নয়, বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলি দেবার বিমূর্ত কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। সব অঙ্গীকার, মানুষের দুঃখবেদনার অংশীদার হবার সব শপথ বিস্মৃত হয়ে তিনি মহিমালক্ষ্মীর বরমাল্যখানি কণ্ঠে ধারণ করে রুদ্ধ অশ্রুজলে তাঁর চরণযুগল ধুয়ে দিচ্ছেন। বহির্জগতের ডাকে বহির্বিচ্ছিন্নতা দূর করবার ইচ্ছা অন্তরজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মহিমাময়ীর বরমাল্যখানি লাভ করবার বাসনার মধ্যে অমরতার আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে। এই কসমিক-বিচ্ছিন্নতা-ভীতি তাঁর কবিতাকে সর্বত্রগামী করল না। চাষী-কৃষাণের জীবনের শরিক হতে পারলেন না। 'ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে' গিয়েও ভিতরে প্রবেশের শক্তি পেলেন না। দরদ ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও 'জীবনে জীবন যোগ করা' সম্ভব হল না। সাধারণের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তাঁর রয়েই গেল, দূর হল না। তবু আন্তরিকতা হারালেন না, বেদনাবোধ নষ্ট হল না। মানুষের ওপর বিশ্বাস বজায় রেখে উচ্চতর মানবধর্মের সন্ধানে অন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করলেন। কাফকার মত নিজের জগতে বন্দী থেকে বললেন না "I am separated from all things by a hollow space and I do not even reach to its boundaries"। স্পেংগ্‌লারের মত প্রগতি নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন না; নীৎসের মত এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না যে, "Oh, that I am banished | from all truth | Mere fool! Mere poet!" কামুর মত 'মিথ অফ্ সিসিফাস' নিয়ে গবেষণা করেন নি। রিলকের মত দেবদূত বা সুপারম্যানের আবাহন করেন নি। 'ঐ মহামানব আসে' কবিতায় সেইরকম তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। ঈশ্বরের পতনের ফলে ইয়োরোপের চিন্তাবিদ্ কবি-সাহিত্যিকদের মনে নতুন ঈশ্বর সৃষ্টির প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তার অপ্রত্যক্ষ ফল হিসেবে একনায়কত্বের জন্ম,—একথা বললে বোধহয় অতিকথনের দোষ ঘটে না। অবশ্য ধনতন্ত্রের উৎপাদনশক্তির

অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের বনিয়াদ তৈরীর সব কিছু শর্ত আগে থেকে হয়ত প্রস্তুত করেছিল ; তা বলে ভাবধারার জগতের এই প্রবণতাকে ছোট করে দেখা কিছুতেই চলে না।

মৃত্যু ও অমরত্বের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই।

অমরত্বস্পৃহা মানে কেবল মৃত্যুকে অস্বীকার নয় ; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লোক-লোকান্তরে, জন্ম-জন্মান্তরের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে বেঁচে থাকবার বাসনার মধ্যে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা আছে। মরদেহ বিনষ্ট হবেই ; "Biological death is inevitable"। ব্যক্তির খণ্ডজীবনের সঙ্গে সে তাই অতীতকে সংযুক্ত করতে উন্মুখ, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত দেখতে উদ্‌গ্রীব। ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে অথবা জন্ম-জন্মান্তরের চক্রে আবর্তিত হয়ে অমরত্বের কল্পনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব। কেননা, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন এই ধরনের অমরত্বচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। লিফটন লিখেছেন ; "The sense of immortality is much more than a mere denial of death, it is part of compelling, life-enhancing imagery binding each individual person to significant groups and events removed from him in place and time". (Lifton : Revolutionary Immortality. Pelican). "It is the individual's inner perception of his involvements in what we call the historical process" (Ibid). সাধারণ মানুষ সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়ে অমরত্ব চায়, ধর্মনিবিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পরজীবনে বিশ্বাস ক'রে অমরত্বের স্বপ্ন দেখে অথবা অন্যভাবে কোনো ধর্মীয় প্রথায় মৃত্যুকে জয় করতে চায়। সাধুসন্তরা নানারকম ধ্যানধারণ, যৌগিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি অভ্যাস করে জীবনকে নিশ্চল করে রাখতে চান, সাময়িকভাবে সময়কে তাঁরা জয় করে (কয়েক সেকেণ্ডের জন্য) মনে করেন বুঝি কালজয়ী হয়েছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে চান। কেউবা নিজেকে অজৈব অপরিবর্তনীয় জড়জগতের সঙ্গে একাত্মীভবনের চিন্তা ক'রে নিজেকে মৃত্যুজয়ী মনে করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তিন দিক থেকে অমরত্বসাধনার সম্ভাবনা ছিল। জন্ম-জন্মান্তরের কল্পনা, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং সাহিত্যসৃষ্টি ; এই তিন দিক দিয়েই তিনি

অমরত্বের সাধনা করেছেন। যেসব কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে মৃত্যু-পরলোকের কল্পনা আছে বা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং পরমব্রহ্মের সঙ্গে লীন হবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে, সেই সব কবিতা-সঙ্গীত অমরত্বলাভের ব্যাপারে তিন দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু মনে হয়, সাহিত্যকৃতির চেয়ে কসমিক একাত্মতার মধ্য দিয়ে যেন বেঁচে থাকতে তিনি বেশি উৎসুক। নিজের স্থানকালের মধ্যে থেকে অতীতের সঙ্গে সেতু রচনা করেছেন, আবার কল্পনার পাখায় ভর করে ভবিষ্যতের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন "to maintain an inner sense of continuity with what has gone on before and what will go on after his own individual existence" (Ibid)। লক্ষকোটি বৎসর ধরে যে-শুকতারা অপলক দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গে এক হয়ে তিনি লক্ষকোটি বৎসর পেছনে চলে যেতে সক্ষম। আবার অনেক দূরভবিষ্যৎ অবধি লোক-লোকান্তরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের একটি অম্লান পারিজাতের মালা কণ্ঠে ধারণ করে তিনি অমর থাকতে চাইছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে বুঝি শুধুই বিরোধ; কিন্তু আসলে জীবন ও মৃত্যু সুস্থ মানসে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে সমন্বিত। আত্মরক্ষামূলক ও প্রজাতিসংরক্ষণমূলক সহজাত শর্তহীন রিফ্লেক্স [Instinctive Unconditioned Reflex] সকল প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান এবং পরস্পর-সাপেক্ষ। আত্মরক্ষা থেকে প্রজাতিসংরক্ষণপ্রবৃত্তি অনেক সময় বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতির জন্য অনায়াস আত্মবিসর্জনের পেছনে গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতির সঙ্গে নানা সামাজিক প্রক্রিয়ায় একাত্মীভবনের প্রক্রিয়াও অনেকখানি কাজ করে থাকে। গোষ্ঠী, জাতির জীবনধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য ব্যক্তির খণ্ডজীবন বলিদানের মধ্যে গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রবণতা পরিদৃষ্ট নয় কি? অতীতের অজানা সিন্ধুতীর থেকে ভবিষ্যতের অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রপৃষ্ঠ অবধি প্রবাহিত ব্যক্তিজীবনের অখণ্ড বিস্তারকল্পনা যা রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সঙ্গীতে অভিব্যক্ত, তাকে প্রজাতিসংরক্ষণস্পৃহার কাব্যদর্শনাশ্রিত ভাববাদীরূপ বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভাববাদদর্শনের অবিনশ্বর অখণ্ড ব্রহ্ম প্রজাতির অমরত্বের

প্রতীকরূপ। ব্রহ্মস্বরূপে স্থায়ী আত্মনিলয় গঠন; স্পেসিস্ বীইং-এর (Species being) কাছে 'সেলফ' (Self)-এর আত্মনিমজ্জন। দার্শনিকের এসেন্স (essence) বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর কাছে 'স্পেসিস্ বীইং'-এর বিমূর্ত কল্পনা। কসমিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে Species annihilation (প্রজাতি ধ্বংস)-এর সম্ভাবনা দেখেছেন কবি, তাই বোধহয় বারবার কসমসের সঙ্গে একাত্মীভূত হবার আকুতি।

১২

দেশে-দেশে ছাত্ররোষ, গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা

"বাতাস বিষাক্ত, আকাশে রঙ নাই, মন্দাকিনী স্রোতহীন, পারিজাতে গন্ধ নাই। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ ইত্যাদি জন-বরেণ্য দেবগণ অধোমুখে সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। মর্তলোক হইতে নৈবেদ্য-থালি বন্ধের নোটিশ আসিয়াছে। সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রের দু'এক টুকরা এখনও মাঝে-মাঝে আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাও যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হইতে পারে। ভক্তি ও ভয় লোপ পাইতে বসিয়াছে। মর্তের মানুষ ক্রীড়নক নহে, নিজ-ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হইতে চলিয়াছে···।"

[স্বর্গবার্তা—১লা মে, ১৯৬৭]

"বয়স্করা আর সমাজ, রাষ্ট্র কিছুই পরিচালনা করিতে পারিতেছে না। গত দেড়শ বৎসরের যুদ্ধ-বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ক্ষমতালোলুপ বয়স্কসমাজ আত্মরতিতে মগ্ন। সমসাময়িক যুবসমাজ জগদ্দল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে।"

[যুবগেজেট—৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৮]

"ন্যুরেমবার্গ বিচারে ইউ. এস. এ. এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, আদেশ প্রতিপালনের অজুহাতে কৃতকর্মের দায়িত্ব হইতে রেহাই পাওয়া যায় না।

…কৃতকর্মের অসাফল্য তিক্ততা আনিতে বাধ্য। অপদার্থ নেতৃবৃন্দের অনুচর হইতে আমরা অক্ষম, আবার নেতৃত্বপ্রদানেও অসমর্থ।"

[জনৈক আমেরিকান ছাত্র—এপ্রিল, ১৯৬৬]

"এই সমাজব্যবস্থার সবকিছুই নীতিহীন। নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকগণ, শিক্ষক ও গুরুজন সকলেই অপদার্থ, নীতিজ্ঞানবর্জিত। আমরা তরুণরা, ঐসব নপুংসক অথর্বদের দাবাখেলার ঘুঁটি হয়ে থাকব না।"

[অন্য একজন ছাত্র—হার্ভার্ড, মার্চ, ১৯৬৭]

"এই সমাজকে গ্রাহ্য না-করা, এই রাষ্ট্রকে স্বীকার না-করা, এই সমাজ-রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পারিবারিক ও বিদ্যায়তনিক শৃংখলাকে অমান্য করা—এই দশকের যুবধর্ম।"

[তরুণের ইস্তাহার—জানুয়ারী, ১৯৬৮]

"সংস্কার নহে, বিপ্লব; আমূল পরিবর্তন আমরা দাবী করিতেছি। ফ্রান্সের ছাত্রদের বিদ্রোহ চাকুরির জন্য নহে, শিক্ষাসংস্কারের জন্য নহে, এই সমাজের সবকিছুকে পরিবর্তনের জন্য। সমাজ-রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া ফেলিতে চাই।"

[ছাত্র গেজেটিয়ার—নভেম্বর, ১৯৬৮]

"কোথায় গুরুভক্ত আরুণি-উপমন্যু! কোথায় অনুগত কর্ণপুত্র বৃষকেতু! গুরুভক্তি নিঃশেষিত, আদেশপালনের আসক্তি নাই। মাতা-বসুমতীর সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত। আবার সেই অতিবিতর্কিত আশ্রমযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইজম্‌সর্বস্ব যাবনিক সভ্যতার বিলোপ ভিন্ন ভারতের মুক্তি নাই। গণতন্ত্র নিয়মানুতন্ত্রের হন্তারক, ইহার পিছনে কোনো যুক্তি নাই।"

[মহদারণ্যক—৩য় পর্ব]

উপরের উদ্ধৃতির সাহায্যে বর্তমানে দেবদ্বিজ, পার্টি ও রাষ্ট্রনায়ক প্রমুখ শ্রদ্ধার্হদের শোচনীয় অবস্থাচিত্রণে প্রয়াস পাইয়াছি। উদ্ধৃতি কাল্পনিক না বাস্তব, এ-বিচারের কোনো প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠান, পার্টি, রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট পরিচালক নায়ক এবং আশ্রিত আমলাদের অনড়ত্ব ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ প্রাচীন-নবীন সর্বদেশে বিক্ষোভের বহ্নি ধূমায়িত। গত কয়েক বৎসরের সংবাদপত্রগুলির উপর চোখ বুলাইলে এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। শুধুমাত্র শিকাগো-প্যারী, প্রাগ-মেলবোর্ণ, টোকিও-বুদাপেস্ত নহে; বিক্ষোভকম্পন উন্নত-অনুন্নত, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র সর্বদেশেই অল্পবিস্তর অনুভূত। ইহাদের সম্পর্কে একজন অধ্যাপক লিখিয়াছেন:

"পৃথিবীর দিকে-দিকে আজ যুদ্ধমান ছাত্র চেঁচাচ্ছে, পাথর ছুঁড়ছে, কাচ ভাঙছে, গাড়ী উল্টোচ্ছে···পুলিশ এদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, পেটাচ্ছে। এরা যুদ্ধমান নিঃসন্দেহে···কিন্তু এরা ছাত্র কিনা, এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

উত্তরে একজন ছাত্র বলিয়াছেন :

"ভিয়েতনামের ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে, এমনভাবে চলছে যে, মনে হচ্ছে এর আর শেষ নেই। আমাদের বয়সী ছেলেদের মনে হচ্ছে, এবং আমরাই বোধ হয় প্রথম এইরকম মনে করছি যে, বিরাট এক মাংসচূর্ণযন্ত্রে টুকরো মাংস হিসেবে আমাদের নিয়ত চালান দেওয়া হচ্ছে; এটা কি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমরা শান্তভাবে চালান হতে চাচ্ছি না?

নিগ্রোনিপীড়ন বা ভিয়েতনাম কোনো সাময়িক উত্তেজনার উপলক্ষ নহে। আমেরিকার ছাত্রমানসে এক নূতন স্তরের উপলব্ধি জন্মাইতেছে। এক নূতন নীতিবোধের উন্মেষ ঘটিতেছে—এই প্রতিবাদ তাহারই নিদর্শন। ইয়োরোপের ছাত্ররাও এই নূতন নীতিবোধের শরিক হইতে চলিতেছে। এশিয়ার ছাত্রদেরও কিয়দংশে এই নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটিতেছে ভাবিলে ভুল হইবে না। যদিও দেশবিশেষে এই নীতিবোধ বিশিষ্ট, কালবিশেষে এই চেতনা বিশেষভাবে বিকশিত—তথাপি ইহাদের মধ্যে একটি সাধারণ মানসধর্মের একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে অতিবাম-প্রবণতার কারণ অনুসন্ধান-প্রয়াস করিব। তাহার পূর্বে পরিবেশন করিব দেশে-দেশে ছাত্র-বিক্ষোভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

আমেরিকার বিক্ষোভ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

আমেরিকার আন্দোলনকে ড্যানি কোন বেণ্ডিট্ ব্যর্থ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ব্যর্থতার কারণ ছাত্র-আন্দোলনকে বার্কলের ছাত্ররা ছাত্রদের মধ্যেই সীমিত রাখিয়াছিল। ফ্রান্সের ছাত্ররা গত বৎসরের ২২শে মার্চের আন্দোলনকে [Obsolete Communism : The left wing alternative ; Daniel Cohn Bendit and Gabriel Bendit.] শ্রমিকবিপ্লবে উত্তরিত করিয়া এই আন্দোলনকে নাকি নূতন বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। আবার আমেরিকান জর্জ. এফ্. কেন্নান মনে করেন [Democracy And The

Student Left : George. F. Kennan]. বার্কলের ছাত্রআন্দোলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা কর্তব্য। উনিশশতকের রুশদেশের ছাত্রআন্দোলন এইভাবেই শুরু হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরিয়াই পরবর্তীকালে, রুশবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। হিট্‌লারও এইরকম বিক্ষোভকারীদের পরোক্ষ সহযোগিতায় ক্ষমতাদখল করিয়াছিলেন। আমেরিকার সৌভাগ্য যে, বিক্ষোভ-কারীরা এখনও রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়ে নাই। আমেরিকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এই বিক্ষোভে যথেষ্ট পরিমাণে সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফ্রাংকেল ছাত্রদের এই আন্দোলনকে শুধু গুরুত্ব নয়, সহানুভূতির সঙ্গে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং বিভিন্ন উন্নত দেশের ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে এক যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁর মতে—"বিভিন্ন উন্নত দেশের ছাত্ররা যে-আন্দোলন করছে, এক সুগভীর অর্থে সেগুলি একই ধারায় চলেছে। এইসকল আন্দোলনের বক্তব্য হল—সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ সুবিবেচনাপ্রসূত হচ্ছে না। আমরা এক সুগভীর রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছি—এই সংকটের মূল কথা হল ন্যায়পরতা। আর এই সংকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আড়াল করে রাখা চলে না।" এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝ্যাক্ বারজুনের অভিমত ["বিশ্ববিদ্যালয়কে বাইরের জগত থেকে আড়াল করে না-রাখতে পারলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।"] খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—"মিঃ বারজুনের সঙ্গে আমি একমত নই। বর্তমানে ছাত্ররা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সমাজসচেতন। ছাত্রদের এই উপলব্ধিকে উপেক্ষা করতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় এবং আজকের দিনের ভাল ছাত্ররা সমাজ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। মানসিকতার স্বাধীনতা এবং মানসিকতার ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ এক জিনিষ নয়।" জর্জ. এফ্. কেন্নানের বিপরীত ধারণা পোষণ করেন একজন আমেরিকান সাংবাদিক। তিনি ১লা মে তারিখের কলিকাতার একটি ইংরাজী দৈনিকে যে-সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ : কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রপর্ষৎ বর্তমানে কয়েকটি বিবদমান দলে (রাজনৈতিক) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে···যখন এই সময়ের ইতিহাস লেখা হইবে, তখন দেখা যাইবে, ফিদেল কাস্ত্রোর প্রভাবে আমেরিকার গৃহশান্তি বিশেষভাবে বিঘ্নিত হইয়াছে। অন্যত্র এক রিপোর্টে পড়িলাম : ···"The new left and the black extremist groups sought disruption for its own

sake and that Marx, Castro and Ho-Chi-Minh were among their idols"। কেন্নানদের ধারণা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বহুমুখীন বিশৃংখলা, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আচরণ ও নিজদেশের ছাত্রবিক্ষোভ এবং সর্বোপরি এই সব নয়াবামদের নৈরাজ্যবাদী চরিত্র—ইহাদের মধ্যে 'মার্কসীয় ইমেজ' গঠনের, তথা যে কোনো সাংগঠনিক নিয়মানুবর্তিতা গ্রহণের পরিপন্থী। মুখে মার্কস, কাস্ত্রো বা হো-চি-মিনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সত্ত্বেও নয়াবামগোষ্ঠীর এ্যাক্‌টিভিষ্টরা মোটামুটি পার্টি-রাজনীতির প্রভাবমুক্ত আছেন বলিয়াই মনে হয়। আমেরিকার ছাত্ররা একটি বিষয়ে মোটামুটি একমত যে—ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণের সব দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া জনসন ডিক্টেটরিয়াল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন ; তাহার ফলে সে-দেশে গণতন্ত্র কথাটি প্রহসনের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাত্ররোষের উদ্দেশ্য।

ফরাসীদেশ তথা পশ্চিম ইয়োরোপের অবস্থা

ড্যানিয়েল কোন বেণ্ডিট্‌কে নয়াবামের প্রবক্তা হিসাবে গ্রহণ করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসিতে বাধ্য হইব যে, 'ছাত্রবিক্ষোভকারী নয়াবাম' পার্টি-রাজনীতির প্রভাবমুক্ত শুধু নয়, পার্টি সমেত সর্বপ্রকার সংগঠনের বিরোধী। বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতি ইহারা রীতিমত বিরুদ্ধ বা শত্রুভাবাপন্ন। শিক্ষাজগতে বিপ্লব ঘটাইয়া ইহারা শ্রমিক-কৃষককে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চাহিতেছে। আমূল পরিবর্তন,—বিপ্লবই ইহাদের আশু লক্ষ্য। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একদিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও একচ্ছত্র শিল্পপতিদের অর্ডার অনুযায়ী তরুণ ছাত্রদের ভাঙিয়া-চুরিয়া পেষণযন্ত্রে গুঁড়াইয়া আমলাতন্ত্রের ছাঁচে ফেলিয়া যন্ত্রের দোসর, এই সমাজব্যবস্থার পরিপোষক ইঞ্জিনিয়ার, কারুকৃৎ, পরিচালক, সংচালক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, কেরাণী ও দক্ষ শ্রমিক তৈরী করিতেছে। অন্যদিকে আবার একই সঙ্গে তরুণমানসে মানবতাবাদী দর্শনের, মানবতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ সাহিত্যের, বিশ্লেষণকারী মনোবিদ্যার ও অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানচেতনার সাড়া জাগাইতেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শোষণব্যবস্থার মূল চরিত্র আর ঢাকিয়া রাখা যাইতেছে না। শোষণযন্ত্রের অঙ্গবিশেষে পরিণত হইতে আসিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৌলতেই ছাত্রদের অগ্রগামী অংশ শোষণের স্বরূপ বুঝিতেছে,

দুর্নীতি ও বিবেকহীনতার কারণগুলি জানিতেছে, শোষণযন্ত্র, তথা সর্বপ্রকার আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ধ্বংস করিবার উন্মাদনায় অধীর হইয়া বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছে। যে-বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে যন্ত্রাঙ্গে পরিণত করিতেছে, সেই আবার তাহাকে মুক্তি-প্রয়াসী বিপ্লবীতে পরিণত করিতেছে। সকল উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ই এই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া এই নয়াবামদের বক্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, সংগঠন, পরিচালন-ব্যবস্থা—কোনোটাই দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়া পরিবর্তিত হইতেছে না। তাই সংগ্রামী বামরা শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে, বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিবে, কারখানার পরিচালক প্রশাসক-পদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিবে, শ্রমিকদের বুঝাইবে যে, তাহারাও কারখানা চালাইতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দখল করিয়া ক্রমে এগুলিকে জনগণের মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিবে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ব্যুরোক্র্যাট বনিয়া গিয়াছেন। কি করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর কিছু ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো যায়, কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই-একটা সংবিধানগত পরিবর্তন ঘটানো যায়—ইহা ছাড়া শ্রমিকনেতাদের আর কোনো চিন্তা নাই। বুর্জোয়া সুবিধাবাদ ইঁহাদের পাইয়া বসিয়াছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ও তাহার সাহায্যকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার করিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনে ইঁহারা অনিচ্ছুক। কি করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানো যায়, কি করিয়া বুর্জোয়া সমাজের আরো উপরের তলায় ওঠা যায়—ইহাই ইঁহাদের একমাত্র চিন্তা। স্বকীয় নিরাপত্তা ও আরামপ্রদায়ী সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা ও কর্মধারাকে ইঁহারা বিসর্জন দিয়াছেন। ইঁহারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে চান, বিপ্লব চান না; গত বৎসরের ৩রা মে হইতে ১৩ই মে'র ঘটনাবলী হইতেই নয়াবাম ও তাহাদের অনুরাগীদের এই ধারণা জন্মাইয়াছে। নয়াবামদের মতে, কেবলমাত্র ক্ষমতাসংরক্ষণে তৎপর, পার্টি বা প্রতিষ্ঠানমাত্রেই আমলাতান্ত্রিক সংগঠন; সুতরাং বিপ্লবী ভূমিকা পালনে অক্ষম। কাজেই ইঁহারা পার্টি সংগঠনে নারাজ। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র অ্যাকশন কমিটির সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমেই মাত্র সত্যকারের বিপ্লব সংগঠিত হইতে পারে। তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত বক্তব্য ও লিখিত মন্তব্য হইতে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, তাঁহারা কোনো সম্মিলিত কেন্দ্রীয় মোর্চা গঠনের পরিবর্তে বিপ্লবস্রোতের প্রতিটি ধারার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে চান।

বিশেষজ্ঞের মর্যাদাদানে অনিচ্ছুক, আদেশের শৃঙ্খল পরিতে নারাজ, কমিটিতে উচ্চনীচ ভেদাভেদ মানিতে পরাঙ্মুখ, কায়িক-মানসিকশ্রমের পার্থক্যনিরসনে আগ্রহী। ইঁহারা অবিলম্বে শ্রমিকসমাজের সর্বপ্রকার পার্থক্য ঘুচাইতে বদ্ধপরিকর, স্বার্থত্যাগ, আত্মদান ইত্যাদি পুরানো মামুলি বুলি পরিহার করিতে চান, সর্বোপরি তথ্য-তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতা মূল্যহীন মনে করেন। নিয়মানুবর্তিতা যেমন বিপ্লবস্রোতকে বাধাদান করে, তথ্য-তত্ত্বের কূটতর্কজালেও বিপ্লবের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তেমনি স্তিমিত হইয়া যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বভাবতই এঁদের সুনজরে দেখিতে পারেন না। "ইহারা হঠকারী, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলারোগে ভুগিতেছে। তত্ত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও প্রকারান্তরে মার্কিউস-তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মনে করিতেছে যে, উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণী আর বিপ্লবী-ভূমিকা পালন করিতে পারিবে না; তাহারা (কমিউনিষ্টরা) ধনতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। নয়াবামপন্থীরা তাই মার্কসবাদে বিশ্বাস হারাইয়াছে।" কর্তৃস্থানীয় কমিউনিষ্টদের অনেকে মনে করিতেছেন যে, এই ছাত্রবিদ্রোহীদের পার্টির ছত্রছায়ায় আনা অপরিহার্য, কিন্তু পথ বা উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ফ্রান্স ও ইতালীর পার্টিনেতারা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাদের শখের বিপ্লব একটা সাময়িক খেয়াল বা নেশামাত্র। দুইদিনেই ইহারা নিজ-নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইবে অথবা বাস্তবের সহিত মোকাবিলা করিতে গিয়া নিজেদের ভুলত্রুটি বুঝিতে পারিয়া, শিশুজনোচিত অতিবিপ্লবী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে সম্মত হইবে। এখনও পর্যন্ত সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ছাত্র-বিক্ষোভের তীব্রতা স্তিমিত হইবার আশু কোনো সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনেকে বিব্রত বোধ করিতেছেন। এই ধরনের স্বতঃউৎসারিত ছাত্রবিক্ষোভের মৌলিক কারণগুলি লইয়া ইঁহারা চিন্তা করিতেছেন। আত্মসমালোচনার পর্যায়ে না পৌঁছাইলেও, নয়াবামদের পার্টি-বিরূপতা—আত্মজিজ্ঞাসাকে তীব্র করিয়াছে। পার্টির অতি-নিয়মানুবর্তিতা, আমলাতান্ত্রিক গয়ংগচ্ছতা ইত্যাদি লইয়াও আলোচনা শুরু হইয়াছে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, পার্টি আত্মরক্ষাত্মক কার্যক্রমকে বড় করিয়া দেখার দরুন, আক্রমণাত্মক কৌশল ভুলিতে বসিয়াছে। পার্টি-কর্তারা সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত নিয়মের দাসত্ব করিতেছেন। পশ্চিম ইয়োরোপের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্গে অর্থাৎ

পুরানো বামের সঙ্গে নয়াবামের বিরোধ তীব্র এবং ইহাই স্বাভাবিক। কমিউনিষ্ট নেতাদের দুই-একজন নয়াবামপন্থী ছাত্রবিদ্রোহীদের মতই এই ধারণা পোষণ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র আজ অস্তিমদশায় উপনীত। শেষ আঘাত হানিতে ইতস্তত করিয়া আমরা পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। অনেকসময় নিজেদের অজ্ঞাতেই আমরা পুরানো দিনের মোহ ও পুরানো ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। লক্ষণীয় যে, নয়াবামের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই চীন-রুশ বিতর্কের মধ্য দিয়া এই ধরনের মতভেদ প্রকাশ পাইয়াছিল। 'শোধনবাদী' 'সংকীর্ণবাদী' কথা দুটির যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া চীন ও রুশ পরস্পরকে হেয় করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং এখনও পাইতেছেন। নয়াবামরা কোনোরকমের পার্টির বন্ধন স্বীকার করিতে চাহেন না, সুতরাং স্বভাবতই চীনপন্থীদের সহিত এঁদের কোনো আত্মীয়তা থাকিতে পারে না; কিন্তু ইয়োরোপীয় পার্টিগুলির অবিপ্লবী (?) মনোভাবের সহিত প্রধানত এই নয়াবামদের বিরোধ এবং এঁরা সোভিয়েত বিদ্বেষী; তাই অনেক দেশের চীনাপন্থী কমিউনিষ্টরা নয়াবামের বড় সমর্থক। কোনো-কোনো জায়গায় অবশ্য নয়াবামদের চে-গুয়েভারা-ভক্তি ও ট্রট্স্কীবাদ চীনপন্থীদের সহিত ইঁহাদের আত্মীয়তার বাধাস্বরূপ হইয়াছে। বিরোধ বিসংবাদও ঘটিতেছে।

সত্যই কি এই বিদ্রোহ খুব নূতন ব্যাপার? প্রতি যুগসন্ধিক্ষণেই তো এই ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য অনেকটা এই রকম:

এই নয়াবাম আন্দোলন পেটিবুর্জোয়া রোমান্টিক বিক্ষোভ। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুগে-যুগে ছাত্র ও তরুণের দল বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে, শাসক ও শোষকের অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, গিলোটিনে বসিয়াছে, ফাঁসিমঞ্চে উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে খুব বেশি নূতনত্ব আছে কি? আজকের আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃত তো হইবেই; কেননা পৃথিবীর সর্বত্র ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে, শিক্ষাসঙ্কট তীব্রতর হইয়াছে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারে উৎপাদনসমস্যা জটিলতর হইয়াছে, অটোমেশনের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় বেকারীর সম্ভাবনা বাড়িয়াছে, খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সর্বোপরি তাপপারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াই গিয়াছে। তাই ছাত্রদের একটি ক্ষুদ্র সংগ্রামী অংশ অবিলম্বে বিপ্লব ঘটাইয়া এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটাইতে

চাহিতেছে। তরুণ মাত্রেই আবেগপ্রবণ, তাৎক্ষণিক অনুভূতিদ্বারা তাড়িত। কাজেই এদের উত্তেজিত করা সহজ। সংবাদ আদান-প্রদান ও পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুতোন্নতি দূরকে নিকট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মধ্যেও সেই হেতু আত্মীয়তা বাড়িয়াছে। তড়িৎবেগে খবর ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাহার ফলে আন্দোলন ও বিক্ষোভ একই সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘটিতেছে। অতিবাম হঠকারী নৈরাজ্যবাদী বিপ্লববাণী আগেও শোনা গিয়াছে। মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত পন্থার বিরুদ্ধে বাকুনিনের (১৮১৪-১৮৭৬) ও ব্ল্যাংকুই-এর [১৮০৫-১৮৮১] মুখেও এই ধরনের নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিসিজম্ ও ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের প্রচার শোনা গিয়াছিল। বাকুনিন ভাবিতেন, রাষ্ট্রই মানুষের প্রধান শত্রু; রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যতিরেকে মানুষের মুক্তি আসিতে পারে না। মার্কিউসের মতাবলম্বী এই নয়াবামরা এমন কিছু নূতন কথা বলিতেছেন না। বাকুনিনও বিশ্বাস করিতেন যে, রাষ্ট্র ধ্বংস করিলেই সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের শৃংখল মোচন হইবে। তাহা হইবামাত্রই মুক্তির স্বর্গরাজ্যের সন্ধান মিলিবে। তিনি মনে করিতেন, চাষী ও লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই শুধু বিপ্লবের সহজাত প্রবৃত্তি বিদ্যমান। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রস্তুতি ছাড়া, সংগঠন ব্যতিরেকেই বিপ্লব সম্ভব। ব্ল্যাংকুই ছিলেন গুপ্ত-সমিতির ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ দ্বারা সর্বহারাবিপ্লব সংগঠনের পক্ষপাতী। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের 'বাবুভিজমে'র দ্বারা তিনি প্রভাবিত। গ্রাক্কাস বাবিয়ুফ (Gracchus Babeuf) ফরাসীবিপ্লবোত্তর কালে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বরূপ বুঝিতে পারেন এবং বঞ্চিতদের গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়া ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের দ্বারা সর্বহারার ক্ষমতা বজায় রাখিবার চেষ্টা পান। তাঁহার ইতিহাসের উপলব্ধির মধ্যে হয়ত কোনো ভুল ছিল না; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা-অধিকারের পদ্ধতি ছিল ভ্রান্তিমূলক। ব্ল্যাংকুই এই মাদকতাময় পেটিবুর্জোয়াসুলভ, অসংগঠিত, নেতৃত্ববর্জিত, স্বতঃস্ফূর্ত অতি-বিপ্লবের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। সৃজনশীল মার্কসবাদের কাছে বাকুনিন-ব্ল্যাংকুইবাদ পরাভূত হইয়াছে। গতিশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কাছে হঠকারী বামবাদের আত্মসমর্পণ অবধারিত সত্য। পার্টিকর্তারা নয়াবামদের প্রতি প্রথমদিকে যে তাচ্ছিল্যভাবে দেখাইতেন, অধুনা সে-ভাব অনেকখানি পরিমার্জিত। রাজনৈতিক স্তরে লড়াই চালানো মানে বিরুদ্ধশক্তিকে গুরুত্বপ্রদান।

ফ্রান্স সম্পর্কিত বক্তব্য মোটামুটি সমগ্র ইয়োরোপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

পূর্ব ইয়োরোপের কি অবস্থা?

"ছাত্রবিক্ষোভ সম্পর্কে বি. বি. সি'র এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে" একজন ভারতীয় (যুগান্তর, ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৮) লিখিয়াছেন, "পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের মৌলিক পার্থক্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পূর্ব ইয়োরোপের ছাত্র-নেতারা প্রশ্নের জবাবে তাঁদের দাবী স্পষ্টভাষায় পেশ করতে পেরেছেন। তাঁরা চান নির্বাধ ও গোপন নির্বাচন, গোয়েন্দা পুলিশ ও সেনসরশিপের অবসান, বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, উন্মুক্ত বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি। পশ্চিম ইয়োরোপের ছাত্রনেতারা আবেগ-কাঁপা গলায় প্রচলিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের কথা বললেও বিকল্প ব্যবস্থাদির কোনো সুপারিশ করতে পারেন নি।" অন্যত্র—"ইয়োরোপের দুই অংশে তরুণের বিদ্রোহের দুই রূপ। পূর্ব ইয়োরোপের তরুণ-তরুণীরা ক্রমশ 'স্বাধীনচেতা' ও বাস্তববাদী হয়ে উঠছে; তাদের বিদ্রোহ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। একদিকে তারা চায়, রাশিয়া তার উপগ্রহসম দেশগুলির উপর থেকে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটাক—অন্যদিকে তারা চায়, নিজ-নিজ দেশে পূর্ণতর গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও আইনের শাসন।" এই ভদ্রলোকের রুশ-বিরোধিতা সুবিদিত বলিয়া ইঁহার বক্তব্যকে একেবারে নস্যাৎ করিবার কোনো কারণ নাই। সত্যই তো, ছাত্রবিক্ষোভ সমাজতান্ত্রিক দেশেও ঘটিতেছে। ইনি এবং এঁর মত অনেকে ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর ছাত্রবিক্ষোভ, ওয়ারশ'র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্য অসন্তোষ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ছাত্রবিদ্রোহের মধ্যে গঠনধর্মী, উদ্দেশ্যমূলক রূপ দেখিয়াছেন। কমিউনিষ্টরা মনে করেন, এই ছাত্রবিক্ষোভের মূলে আছে পশ্চিমী ষড়যন্ত্র, ক্ষমতালোভী পাদ্রী-জমিদারদের অভ্যুত্থানচেষ্টা, সি. আই.'এ-র অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা। অবশ্য স্তালিনী আমলের জবরদস্ত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ হিসাবেও এই বিক্ষোভের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা ছাত্রবিক্ষোভ পূর্ব ইয়োরোপেও দেখা দিয়েছে। তবে তার কারণ ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে উল্লিখিত রুশ-বিরোধী লেখক অভ্রান্ত নহেন, বরং অনেকখানি পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। পূর্ব ইয়োরোপের কিছু ছাত্রের বি. বি. সি.'র যে-বিবৃতির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ঐরূপ বিবৃতি খুবই মামুলী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিলোপকারী ভূমিকা অনেক পুরানো বিরোধী-প্রচার। তবে আমি বলিতেছি না যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের অভিমত পুরোপুরি গ্রাহ্য এবং রাষ্ট্রের 'রাগী ছোকরা' মাত্রেই

গুপ্তচর বা ধনতন্ত্রের দালাল। আমার ধারণা, পূর্ব ইয়োরোপের ছাত্রনেতারা বি. বি. সি.'তে ঐ বিবৃতি দিয়া যদি আবার পূর্ব ইয়োরোপে ফিরিয়া গিয়া থাকেন তবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতাপহরক, এ-অপবাদ দেওয়া চলিবে না। আর যদি তাঁহারা ফিরিয়া না-যান, তবে সন্দেহ হইতে পারে, তাঁহারা পুরোপুরি সমাজতন্ত্রবিদ্বেষী ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং সেক্ষেত্রে তাঁহাদের বিবৃতির গুরুত্বেরও বহুলাংশে লাঘব হইবে। সে যাহাই হোক না কেন, এ-যুগের ছাত্র ও তরুণদের মানসিকতার সম্যক বিশ্লেষণ ছাড়া এই ছাত্রবিক্ষোভের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের ছাত্রবিক্ষোভের তুলনামূলক বিচারের দ্বারাই ইহার ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সামান্যীকরণ ও চরিত্র-বিভিন্নতার ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে। আমার ধারণা, সত্যকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত বিচার-বিশ্লেষণ এ-সম্পর্কে খুব বেশি হয় নাই।

এশিয়া—অনুন্নত দেশের অবস্থা

অনুন্নত দেশের ছাত্রবিক্ষোভ বেশিরভাগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পার্টি-প্রভাবিত। যে-নয়াবাম বা অতিবিপ্লবীদের কথা বলিলাম, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য বলা চলে। কোনো-না-কোনো বামপার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত এইসব ছাত্রসংগঠন। ইহার বাহিরে যেসব ছাত্রদের ধ্বংসাত্মক ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত দেখা যায়, তাহারা অসংগঠিত, আদর্শবিহীন, উচ্ছৃঙ্খল। ইহাদের রাজনৈতিক কোনো বিশ্বাস বা মতবাদ নাই। নির্বাচন ইত্যাদি বিশেষ উপলক্ষে সরকারী পক্ষ [অন্যপক্ষও] ইহাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোরিয়াতে আমরা যেমন ছাত্রদের বামপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সীংম্যান রীর পতন ঘটাইতে দেখিয়াছি, আবার তেমনি ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের পতনে ও কমিউনিষ্টদলনে ছাত্রদের দক্ষিণপন্থী উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে লিপ্ত দেখিয়াছি। মনে রাখা দরকার, সুকর্ণ পি. কে. আই.-এর সহযোগিতায় চালিত হইলেও ক্রমশ দেশকে গভীর অর্থনীতিক সংকটের মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন; দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে প্রতিবিপ্লবের সুযোগ হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এছাড়া চীন-সোভিয়েত বিরোধে কমিউনিষ্ট নেতা আইদিতের ভূমিকাও ছাত্রদের বাম হইতে দক্ষিণে ঠেলিয়া দিয়াছিল। তবে 'কাম্নি' আন্দোলনকে নয়াবাম বিক্ষোভের সঙ্গে সংযুক্ত করা না-চলিলেও, ইহার

তাৎপর্য সারা দুনিয়ার ছাত্রবিক্ষোভের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাম আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিলে দেশের রক্ষণশীল শক্তি ছাত্রদের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। ইন্দোনেশিয়ার মত ছাত্রদল যদি অন্য কোথাও ঐরূপ প্রতিপত্তিশালী হয়, সেখানেও নাৎসী নিও-নাৎসী প্রভাবিত ছাত্রসংঘ গড়িয়া উঠিবে। বর্তমানে আমেরিকায় সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়েও ফ্যাসিবাদ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের ছাত্রসম্প্রদায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। বর্তমানেও দেখা যাইতেছে ইহারা কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট (দক্ষিণ, বাম ও হালে নকশাল), ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. প্রভৃতি রাজনৈতিক পার্টিকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত। পার্টি-বিরোধী নৈরাজ্যবাদী নয়াবামের আন্দোলনের ধারা বর্তমানে অতি ক্ষীণ। বিশৃঙ্খলা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অপরাধপ্রবণতা ছাত্রদের মধ্যে বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্ররাও ফুঁসিতেছে, প্রতিষ্ঠানবিরুদ্ধতায় ফাটিয়া পড়িতেছে; এবং তাহাদের বিক্ষোভ বা প্রতিবাদে অনেক সময়েই ন্যায়নীতি বা সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হইতেছে না। সমাজবিরোধী তৎপরতা মানেই নয়াবামবিক্ষোভ নহে। চীনে সম্ভবত প্রতিষ্ঠানবিরোধী অতিবাম ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। তাহাকেই বোধ হয় মাও সে-তুং কৌশলে পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করিয়া ছাত্র-সংগঠনগুলিকে নিজের কব্জায় আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নয়াবামের প্রতিষ্ঠানবিরোধী উগ্রবাম মতবাদকে বিরোধী গ্রুপকে শায়েস্তা করিবার কাজে লাগাইয়াছেন। আরো কিছুদিন না-গেলে এ-সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

নয়াবাম সমীক্ষার ফলাফল

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীরা নয়াবাম বিক্ষোভ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল পত্রিকা-পুস্তিকা মারফৎ প্রচার করিতেছেন। গবেষকদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এ-বিষয়ে এঁরা একমত যে, এই বিক্ষোভকারীরা [activists, new left, protestors ইত্যাদি নানা নামে ইহারা অভিহিত] উচ্চ

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এরা বুদ্ধিমান, শিক্ষা বিষয়ে উচ্চগ্রেড প্রাপ্ত। এরা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তার অভাব বা দারিদ্র্য-জনিত হীনমন্যতা এদের বিক্ষোভে অনুপ্রাণিত করে নাই। এদের মাতা-পিতারা উচ্চশিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী; সাধারণত ডাক্তার, উকীল, অধ্যাপক; সন্তানদের স্বাধীন মত পোষণে ও নীতির সংগ্রামে উৎসাহদাতা। অবশ্য শেষোক্ত অভিমতটি সর্বজন-অনুমোদিত নহে। কেহ-কেহ মনে করেন, নয়াবামদের অবচেতনায় মাতাপিতা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার ভাব বর্তমান। তাহাদের পরিবার শক্তিশালী, কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে উৎকণ্ঠিত। ছাত্ররা নিজেদের মাতাপিতার অন্তরে ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যজনিত বিরক্তিকর তৃপ্তির পাশাপাশি অনুভব করে উদ্বেগ ও অশান্তি। রেডিও-টেলিভিশনের দৌলতে অতি অল্প বয়সেই এরা অনেক খবর জানিতে পারে; কল্পনা, আশা, ভয়, আনন্দ, দুঃখ—ইত্যাদির অস্বাভাবিক উদ্রেক কৈশোরেই ঘটিতে থাকে। নয়াবামপন্থীরা সাধারণত 'হিউমানিটিজ্'-এর ছাত্র। বিরুদ্ধবাদীরা এদের সম্বন্ধে বলেন—"anxious, angry, humourless, suspicious of his own society, apprehensive in relation to his own future"। সহৃদয় সহানুভূতির দৃষ্টিতে যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা অবশ্যই মনে করেন, এই সব 'এ্যাকৃটিভিষ্টদের' অল্প কয়েকজনের এই ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাপীড়িত চেহারা থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে ইহারা আত্মপ্রত্যয়শীল ও সুস্থশ্রী। আসলে ইহাদের বিক্ষোভের মূলে থাকে "incongruities between the values represented by the authority and occupational structure of the larger society and values inculcated by their families"। যে-মূল্যবোধ নীতি-বোধের আবহাওয়ায় এদের শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সেই মূল্যবোধ নীতিবোধের অবমূল্যায়ন ইহাদের ক্রোধের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা হইয়াছে। আইনের বয়ান একরকম, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মনোভাব অন্যরকম। গণতন্ত্রে সমানাধিকারের কথা ধোঁকাবাজি, একশত বছরেও নিগ্রোদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নাই। ভিয়েতনামের যুদ্ধ অর্থহীন, অন্যায়, নীতিহীন; এই যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই। কাজেই যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ। কেন এইরূপ হইল? আগেও তো অন্যায়-অবিচার ঘটিয়াছে; অন্যায় যুদ্ধ কি আমেরিকা নূতন করিতেছে? নিগ্রোপীড়ন তো হালের

কোনো ঘটনা নয়। জ্যেষ্ঠদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ, কাজে-কথায় গরমিল—একি এই দশকের আকস্মিকতা? পণ্যের বাজারে সততা, ন্যায়পরায়ণতা তো চিরকালই বিক্রীত হইয়া আসিতেছে। অনুন্নত দেশে বা উপনিবেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, শ্রমের বাজারে যাহাদের চাহিদা নাই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা আন্দোলন করিলে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে, ট্রাম-বাস পোড়াইলে—বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু প্রাচুর্যের দেশে, ধনীর সন্তানদের মধ্যে এই ক্রোধ, এই বিক্ষোভপ্রবণতার কারণ কি? এর উত্তর সমীক্ষকরা দিয়াছেন। "Gentility, Laissez Faire, naive optimism, naive rationalism—seemed increasingly inappropriate due to the impact of large scale industrial organisations, intensifying class conflict, economic crisis and total war." একচ্ছত্র শিল্পপতিদের রাঘববোয়ালী উদরে সর্বপ্রকার নীতিবোধ মূল্যবোধের পূর্ণ মহাপ্রয়াণের ইতিহাস একান্ত হালের ঘটনা: দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের তাপপারমাণবিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতির বিশেষ সংকটের বহিঃপ্রকাশ। ইহা দ্বারাও সব কথা বলা হইয়াছে মনে হয় না। 'Laissez Faire,' 'Gentility'—এই সব শব্দের অপমৃত্যু বহু পূর্বেই ঘটিয়াছে, এই দশকের ছাত্রমনোভাব বিশ্লেষণে এই শব্দের প্রয়োগ অনর্থক। তবে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি ও নূতন-নূতন অর্থনীতিক সংকট সৃষ্টি এই দশকের বিশেষ তাৎপর্যবহ ঘটনা: ছাত্রমনস্তত্ত্বকে সন্দেহাতীতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। এই স্বীকৃতির পর একথা বলা চলে না যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের নয়াবাম-মানসে ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাবের প্রতিফলন-দরুন আতংক বা ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে না বা শ্রমের বাজারে বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের অঢেল চাহিদা আছে। একজন সমীক্ষকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: "The great majority of students particularly those in the applied fields"—এই সব নয়াবাম আন্দোলনে উৎসাহী নন। আমেরিকায় বেকার সংখ্যা কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে। এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে।

সমীক্ষকদের অধিকাংশের মতে, আগেই বলা হইয়াছে, এই নয়াবাম আন্দোলন প্রধানত সামাজিক ও নৈতিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

এঁরা বলেন :—ব্যক্তিগত সমস্যা যাহাদের অপেক্ষাকৃত কম, অভাব-অনটন হইতে যাহারা অনেকখানি মুক্ত, ভবিষ্যতের চিন্তা, নিরাপত্তার ভাবনা যাহাদের পীড়িত করে না, তাহারাই ন্যায়-নীতির কথা ভাবিতে পারে, যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ, সুস্থ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে পারে। এই সব ছাত্ররাই রাজনীতিতে বামপন্থা ধরিয়া চলে, নিপীড়িত-নিগৃহীতদের পক্ষ লইয়া মালিক কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অন্যায়ের সঙ্গে মানাইয়া চলার তাগিদে আপোষ প্রবৃত্তি জ্যেষ্ঠদের মত তাহাদের অনুভূতির প্রক্ষোভের তীব্রতাকে ভোঁতা করিয়া ফেলে নাই। তাহাদের "senese of elementary morality and justice" সজাগ ও সক্রিয়। কাজেই তাহারা সংগ্রামের পথে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, সবরকমের সংস্কারকে (reforms) তাহারা ঘৃণা করে। তাহারা বামহস্তে বিদ্রোহকেতন তুলিয়া দক্ষিণমুষ্ঠি শূন্যে আন্দোলিত করিয়া চক্ষুতে ঘৃণা, কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটাইয়া প্রতিবাদে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলে।

[লক্ষণীয় এই যে, উপরোক্ত অভিমত এবং নয়াবাম-সমর্থিত মারকিউসতত্ত্ব যথা—"এই যুগের শ্রমিক ও তাহাদের পার্টি আর বিপ্লব আনয়নে সমর্থ নয়, কেননা তাহারা অভাব-অনটনে কষ্ট পাইতেছে না, নিরাপত্তার ভাবনায় ক্লিষ্ট হইতেছে না; তাহারা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে"....ইত্যাদি—পরস্পরবিরোধী।]

দুই বক্তব্যের মধ্যেই গলদ আছে। দুই-ই একদেশদর্শিতায় দুষ্ট। আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিকরা আজ স্কেলে ফেলিয়া প্রগতিশীলতার পরিমাপ বাহির করিতেছেন, তা সত্ত্বেও বলিব, বিপ্লবীর পরিবারকে স্বচ্ছল হইতে হইবে, বিপ্লবীকে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইতে হইবে, বিপ্লবীর অন্য কোনো সমস্যা বা নিরাপত্তার ভাবনা থাকিবে না—এই ধরনের সামান্যীকরণ ঠিক নহে। আবার উগ্রমতাবলম্বীদের বলিব, শুধু ক্ষুধিত 'হ্যাভ-নট্'রাই বিপ্লব করে, চাষীরা আর ছাত্ররাই শুধু বিপ্লবী, আর কেহ নহে, এ-ধারণা অপরিণত। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতা না-বুঝিতে পারিলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়। এসট্যাবলিশমেণ্ট ব্যুরোক্রেসীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবাদী পার্টিকে পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লব করার চেষ্টা অনেকটা চোরের উপর রাগ করিয়া শালপাতায় ভাত খাইবার মত ব্যাপার। ফরাসী বিপ্লবের আগে ফরাসী দেশের চাষীদের অবস্থার বেশ উন্নতি

হইয়াছিল। শুধু দারিদ্র্যই বিপ্লব আনে না। অসংগঠিত কৃষক ক্ষুধার তাড়নায় ধান লুঠ করিতে, দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে পারে, কিন্তু বিপ্লব করিতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা কয়েকদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাস দখল করিতে পারে, রাষ্ট্রযন্ত্র চালানো তো দূরের কথা, দখল করিতেও পারে না। সংগঠন ছাড়া বিপ্লব বা কোনরকম কাজই অসম্ভব। স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের আশা মরীচিকা। সংগ্রামী নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক বিপ্লব করিবে। আবার বিপ্লবী সংগঠনে নেতৃত্ব কিছুদিন পরে ক্ষমতালিপ্সু এসট্যাবলিশমেণ্টে পরিণত হইতে পারে—এ-আশংকাও অমূলক নয়। ইয়োরোপ-আমেরিকার নয়াবামদের শ্রেণীচরিত্র, পারিবারিক অবস্থা লইয়া অনেক সমীক্ষা হইয়াছে। অনুন্নত দেশে এই ধরনের সমীক্ষা খুব বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতার একটি সমীক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "সমীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির পর্যালোচনাশেষে মোটামুটি এ-সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বৃহৎ পারিবারিক পরিবেশে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, পিতার সদাজাগ্রত সতর্ক কিন্তু সস্নেহদৃষ্টির অভাবে মাতৃস্নেহবুভুক্ষু কিশোর যখন বিপুল এ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার ঘায়ে দীর্ণ হতে থাকে,…বিদ্যালয়ের পরিবেশ যখন আরও অসহ্য, আরও নীরস হয়ে উঠতে থাকে, নিরাপত্তাবোধের অভাবে, ব্যর্থতায়,… প্রাত্যহিক জীবন যখন টুঁটি টিপে ধরতে চায়, তখনই সমকালীন সমাজব্যবস্থায় স্বীকৃত ও গৃহীত রীতি-নীতি ও আচরণবিধির বিচ্যুতি ঘটিয়ে জন্ম নেয় 'বিশৃঙ্খল' বিক্ষুব্ধ অপচিত প্রাণপুরুষ। উত্তেজনার আগুনে সে সর্বক্ষণ ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে আর মুহূর্তের উসকানিতে সমগোত্রীয় সকলকে নিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ে চারিদিক কাঁপিয়ে।" ডঃ দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে কলিকাতার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পারিবারিক পরিবেশের ও চরিত্রের যে-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, শিকাগো, প্যারীর নয়াবামদের চিত্রের সঙ্গে তাহার মিল নাই। ওয়ারশ, বুদাপেস্ট, প্রাগের সঠিক চিত্র আমাদের জানা নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে নয়াবাম চরিত্র বিভিন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্নতার মধ্যেও যে-সাধারণ ধর্ম এই বিক্ষোভকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, সেটি হইতেছে, গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা। সর্বস্তরে 'অথরিটি' ও 'কনফরমিটি'-বিরোধিতা সমকালীন ছাত্রবিদ্রোহের প্রধান প্রলক্ষণ। ছাত্রদের যে-'militant minority' আমাদের আলোচ্য, তাহাদের সকলের চরিত্রেই এই দুই

বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কথা উঠিবে, বিদ্রোহ মানেই তো অথরিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; বিপ্লব, সংস্কার ইত্যাদি সব আন্দোলনই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধতাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়া থাকে। কথাটা আংশিক সত্য। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়ক শুধু নহে, সর্বপ্রকার establishment, সব রকমের নেতাদের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিক্ষোভ। এইখানেই বিশেষত্ব। আমেরিকা, পশ্চিম ইয়োরোপ, পূর্ব ইয়োরোপ, এশিয়া—সর্বত্রই ছাত্রবিক্ষোভ authoritarianism ও conformismকে কেন্দ্র করিয়া। উপরওয়ালা বা অথরিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পর্যবসিত নহে। এই সেদিন সান্‌ফ্রান্সিসকো শান্তিমিছিলে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় যোগদানের জন্য বিমানবাহিনীর মাইকেল নক্‌স-এর শাস্তি হইয়াছে। সাদা পোষাকে ভিয়েতনামযুদ্ধবিরোধী মিছিলে যোগদানকারী সৈনিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে। আমেরিকার সৈনিকের পক্ষে উপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করা আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবারপ্রধানকে ও কৌমসমাজে কৌমপ্রধানকে অমান্য করা একই ধরনের দুঃসাহসিকতার নিদর্শন। কিছুদিন আগেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যের পক্ষে প্রকাশ্যে পার্টি-বিরোধী বিবৃতি দেওয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রনায়কদের সমালোচনা করা। ভিয়েতনামের ব্যাপারে যেমন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবাহিনীর সচিবপুত্র বিদ্রোহ করিতেছেন, চেকোশ্লাভাকিয়ার ব্যাপারে তেমনি মস্কোতেও কোনো প্রাক্তন সচিবের নিকট-আত্মীয় প্রতিবাদে মুখর হইতেছেন। উপরওয়ালার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের, এই অননুগামিতার সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক দিকটির একটি সূত্র লইয়া কিছু আলোচনা করিতে চাই। তাহার পূর্বে বলা দরকার, সোভিয়েত দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই প্রাচুর্যের দেশ বা শিল্পোন্নত দেশ, অতএব তাহাদের সমস্যাগুলি সমপর্যায়ভুক্ত, এই ধরনের যুক্তি সরল ও আপাতগ্রাহ্য হইলেও উদ্ভট কল্পনা। ভিয়েতনাম ও চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্যের সমীকরণ সুনিশ্চিতভাবে অভিসন্ধিমূলক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, বিশেষ করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ায় যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বা বুর্জোয়া সমাজের সমস্যাগুলি গুণগত ও রাজনৈতিক তাৎপর্যে সম্পূর্ণ পৃথক। শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পথে ভুল-ত্রুটি ঘটিতেছে এবং হয়ত আরো ঘটিবে। নেতাদের ক্ষমতাপ্রিয়তা, সাধারণের চেতনাস্বল্পতা, পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন

যেসব সমস্যার উদয় হইতেছে, সেসব সমস্যার সমাধানের সূত্র মার্কসবাদীরাই সংগ্রাম-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া উদ্ভাবন করিবেন। বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদীর আগ্রাসী ক্ষুধার দরুন সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র শ্রেণীসমাজের বিলুপ্তি, সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তি দ্বারাই সম্ভব। এখন অনধিকার চর্চা ছাড়িয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরিয়া আসাই সমীচিন।

গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতার সামাজিক পটভূমি ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি

পঞ্চাশের মাঝামাঝি গুরুবিদ্রোহ অননুগামিতার সূত্রপাত দেখা যায় angry young generation-এর সাহিত্যশিল্পে। পঞ্চাশের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন নাটকীয় ক্রোধপ্রকাশের ঘটনা ব্যাপক হইয়াছে ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতেছে ষাটের প্রারম্ভ হইতে। এসট্যাবলিশমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত সমাজতাত্ত্বিকরা এইসব ব্যক্তি-বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সহজাত বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব হাজির করিয়া; existentialism-দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া। আজ সকল বিদ্রোহীদের একই গোত্রীভূত করা যাইতেছে না। হিপী-বিটল্‌দের অননুগামিতা এবং নিউরোটিকের অসামাজিকতার সহিত বর্তমানের সব নয়াবামদের রোষ-ধর্মিতাকে এক করা চলিতেছে না। কাজেই নানা রকমের তত্ত্ব, যথা প্রাচুর্যবাদ (affluent society), সংবাদ বিস্ফোরণ (information explosion); দ্বিতীয় প্রযুক্তিগত বিপ্লব, ছাত্র সংখ্যাধিক্য, সমাজ ও পরিবর্তনের শ্লথতার ও শিল্পায়নের দ্রুততার মধ্যে বিরোধিতা, ধর্ম ও বুর্জোয়া-নীতিবোধের প্রভাবক্ষুণ্নতা, আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা, ধনতান্ত্রিক সংকট ইত্যাদির আমদানী করা হইয়াছে। কিছু তাত্ত্বিক আবার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিবাদ-বিসম্বাদ ও বহুকেন্দ্রিকতার উল্লেখ করিতেছেন। এর কোনটিকেই ঠিক তত্ত্ব বলা চলে না। এগুলি ঘটনাগুলির আংশিক ব্যাখ্যা বা সামাজিক পটভূমির চিত্রের একাংশ। নয়াবাম আন্দোলনের ফলে সকলেই নিজ-নিজ সমাজব্যবস্থার গলদগুলিকে নির্মোহ-দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন ও কিছু-কিছু সংস্কারের পরামর্শ দিতেছেন। গুরুবিদ্রোহ এবং অননুগামিতার সন্তোষজনক ও সঠিক সামাজিক-মানসিক কারণ নির্ণয়ের জন্য আরো আঞ্চলিক সমীক্ষার, আরো নূতন তথ্য সমাবেশের ও তাহা হইতে সামান্যীকরণের প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে

কেবলমাত্র ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করিব। কেননা আমরা দেখিয়াছি নয়াবাম রোষবহ্নি প্রধানত ও প্রথমত এই ন্যায়নীতি মূল্যবোধের প্রশ্নেই প্রজ্বলিত হইয়াছে।

পরিবৃত্তিকালের মনোবৃত্তি

পৃথিবীতে বর্তমানে পাশাপাশি দুই মূল্যবোধ নীতিবোধ চালু রহিয়াছে। একদিকে ধনতান্ত্রিক যুগের ন্যায়নীতি মূল্যবোধ ভাঙিয়া পড়িতেছে; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক যুগের নূতন ন্যায়নীতি মূল্যবোধ উদিত হইতেছে। একজন লেখক এই দুই-এর সংঘর্ষকে এলিজাবেথীয় যুগের উদীয়মান বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের সহিত তদানীন্তন ক্ষীয়মান সামন্ততান্ত্রিক নীতিশাস্ত্রের সংঘর্ষের তুলনা করিয়াছেন। সেই সময়কার মত বর্তমানে ব্যক্তি ও সমাজমানসে বিপরীত মেরু প্রবণতার দরুন দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সাধারণ অদীক্ষিত মানুষের মনে এই অবস্থায় সবকিছু তালগোল পাকাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটিতে থাকে যে, মানুষ দিশেহারা হইয়া পড়ে। কাল যে-নীতিকে মর্যাদা দিয়াছে, আজ তাহা মূল্যহীন। কাল যাহা ন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে আজ তাহা অন্যায়। কিছুদিন আগের মূল্যমণ্ডিত ধর্ম আজকের বিচারে নাকি অধর্ম। এই অবস্থায় দৈহিক আবেগ বিশেষ করিয়া কামেচ্ছাকে শুধু সত্য শাশ্বত মনে হয়। ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যের বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। যুক্তিবুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতার মধ্যে লড়াই বাধে। যে-জগতকে চিনিতাম, বুঝিতাম, তাহার রূপরেখা রঙ সব মুছিয়া যাইতেছে, অন্য এক জগত নূতন রূপে নূতন রঙে নূতন রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাকে জানি না, চিনি না, বুঝি না। কোনটি আমার নিজস্ব? পরিবৃত্তিকালের [transition] মনোবৃত্তি অনেকটা রণাঙ্গনে জীবনমৃত্যু-সন্ধিক্ষণে সৈনিকের মনোবৃত্তির সমান। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যেন এক বিন্দুতে অবস্থিত। মৃত্যু, যন্ত্রণাভোগ, সহজাত আবেগ এবং দৈহিক প্রক্রিয়াই কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয়, কাজেই বাঞ্ছিত বলিয়া মনে হয়—ফ্রয়েডবাদের জন্ম হয়।

কোনোকিছুরই মূল্য নাই, অথবা সব কিছুই ঘনদুর্যোগ রাত্রির পথিকের কাছে বিজলী চমকের মত মূল্যবান। আপাতদৃষ্টিতে একমাত্র সত্য, একমাত্র নিত্য শুধু মুহূর্তের রোমহর্ষকারী আনন্দ। এই অবস্থায় পাশব ও অস্বাভাবিক

যৌনানন্দের অনুভূতিকে প্রেম বলিয়া অভিহিত করা হয়, নরনারীর স্থায়ী প্রেমকে উপহসিত করা হয়, মাদক-প্রভাবিত নিস্তেজনাকে তুরীয় অবস্থা বলিয়া কল্পনা করা হয়, সুস্থ মানবিক সম্পর্ককে লজ্জাকর দুর্বলতা বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থাতেও যাহাদের বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে, তাহারা সুস্থ কল্পনা করিতে পারে, পুরাতনের গর্ভে নূতনের আবির্ভাবকে আবাহন জানাইতে পারে, পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলি বুঝিতে পারে। মানবিকতার অবমূল্যায়নের আরম্ভ হইয়াছে অনেকদিন আগে। কিন্তু তখন ছাত্র-তরুণ আশাবাদী ছিল। তিরিশে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তিমিরান্তক নূতন সূর্যের রশ্মিতে নূতন সমাজের দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। চল্লিশের তরুণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বুকের রক্ত ঢালিয়া উদীয়মান সূর্যকে আরো রক্তবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। পঞ্চাশের ছাত্র-তরুণ আশ্বাসের দৃষ্টি লইয়া পূর্ব ইউরোপ ও চীনদেশের দিকে তাকাইয়াছে; ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানকল্পে বুর্জোয়া ন্যায়নীতি ও মিথ্যা মূল্যবোধকে ক্রোধ ও ব্যঙ্গের শাণিত কষাঘাতে জর্জর করিয়া তুলিয়াছে। কেননা, সে জানিত পৃথিবীর অন্য দিকে নূতন মূল্য গড়িয়া উঠিতেছে। আজ ষাটের ছাত্র-তরুণ নিরুদ্ধ আবেগে, নিষ্ফল আক্রোশে রকেটের মত নিজেকে নিঃশেষ করিয়া সবকিছু ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। তাহার গড়িবার কিছু নাই—সৃজনশক্তি তাহার নষ্ট হইয়াছে, স্বপ্ন দেখিবারও শক্তি নাই। সংখ্যায় ইহারা মুষ্টিমেয় হইতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গী ইহাদের অবজেক্টিভ না-হইতে পারে, ইহাদের সামাজিক চেতনাকে অবৈজ্ঞানিক অর্ধস্ফুট ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের আন্তরিকতায়, সততায়, অন্তর্নিহিত ক্ষমতায়; ইহাদের নির্ভীক সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। স্বভাবত যে-প্রশ্ন আমাদের পীড়িত করিতেছে তাহা এই: পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলি, পিতা-পিতামহেরা যাহার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, —ইহারা বিস্মৃত হইল কি করিয়া? অথবা সেগুলির উপর ইহাদের আস্থা নাই। বুর্জোয়া সমাজের নীতিশাস্ত্রের অবমূল্যায়নের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্রকে অবস্থিত দেখিতেছে না কেন? সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্র কি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করে না? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি যথাযথ নৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হইতেছে না? ঐসব রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্র কি ঠিকমত প্রযুক্ত হইতেছে না? বিপ্লবী অগ্রগতি কি থামিয়া গিয়াছে,—এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না-জানিলে নয়াবামদের গুরুবিদ্রোহ এবং অননুগামিতার কারণ নির্ণয় অসম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধ মূল্যবোধ-বিচারে স্বাভাবিকভাবে শ্রেণী-আনুগত্যের প্রশ্ন আসিবে। বলা যাইতে পারে, নয়াবামদের শ্রেণী-অবস্থান তাহাদের চেতনাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে না। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্পষ্ট করিতেছে, আগামীদিনের বাস্তব চিত্রকে তাহারা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বর্তমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেও অননুগামিতা ও গুরুবিদ্রোহের ঘটনা ঘটিতেছে। কাজেই শুধুমাত্র শ্রেণী-আনুগত্যের দোহাই দিয়া আজ আর সব কিছুর ব্যাখ্যা চলিবে না। অন্য একদিক দিয়া বিষয়টি বিবেচিত হইতে পারে। কিছুলোক প্রাচুর্যের অধিকারী, প্রচুর সংখ্যক অনটন-জর্জর। ধনতান্ত্রিক সমাজের এই অবশ্যম্ভাবিকতাকে মানিয়া লইতে গেলে সংখ্যালঘু প্রাচুর্যের অধিকারীকে হয় নিজেকে সাধারণের তুলনায় উচ্চতর জীব মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকিয়া জনসাধারণের ক্রুদ্ধ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে, অথবা এই প্রাচুর্য বা অতিরিক্ত সুবিধায় তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই মনে করিয়া অপরাধবোধে পীড়িত হইতে হইবে। এই দুই অনভিপ্রেত অবস্থা হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে আক্রমণ করা চলিতে পারে। গুরুবিদ্রোহ ও অননুগামিতার মধ্য দিয়া বিবেককে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে। ভাগ্য বা ঈশ্বরদত্ত এই প্রাচুর্য—অতএব গ্রহণীয়; আজকের কিছু সংখ্যক তরুণ-মানস এই ধরনের আপোষরফায় অক্ষম, বুঝা যাইতেছে। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ববোধকে সঞ্চারিত করিয়াছে। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিবেক অনুমোদিত পথে চলিবার সুযোগ সীমিত। তাই একদিকে ব্যক্তি আজ নিঃসঙ্গ উল্লাসে সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-বিরোধী হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে ব্যক্তিত্বের সামাজিকীকরণও ঘটিতেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতাবিলাসকে উৎসাহিত করা হইতেছে; আবার উৎপাদন ব্যবস্থার বিরাট সামাজিক যজ্ঞে ব্যক্তির তিলাঞ্জলি ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ ঘটিতেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও কমিউনিষ্ট পার্টি-সংগঠনে প্রথমদিকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র ও পার্টির অঙ্গীভূত করিয়া নিরাপত্তাবোধ জাগানো হইয়াছিল; ব্যক্তিত্বস্ফুরণে উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। স্তালিনবাদ-বিরোধিতা ও ব্যক্তি-পূজা অবসানকল্পে কয়েক বৎসর হইল ব্যক্তিসত্তা উন্মেষের সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। প্রথমদিকে উৎসাহদানের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া গেল। 'পারসোনালিটি কাল্ট'-ই সব কিছু গলদের জন্য দায়ী মনে করা

হইল। স্তালিন-বিরোধী প্রচারের আতিশয্য দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল যেন সোভিয়েত পার্টির অন্য সব নিরীহ ভালমানুষদের সংবেশিত করিয়া স্তালিন একক প্রচেষ্টায় সবকিছু নিষ্ঠুরতা, সবকিছু পার্টি-বিরোধী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। স্তালিনকে হিট্‌লারের সমগোত্র করিয়া চিত্রিত করা হইল। পার্টি-সংগঠনের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা সাধারণের নজর এড়াইয়া গেল। উৎসাহের স্রোতে ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে স্তালিনের প্রতি ঘৃণা অন্য পার্টি-নেতাদের প্রতি অশ্রদ্ধায় পরিণত হইল। স্তালিনের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সাচ্চা কমিউনিষ্টের মত কেহ রুখিয়া দাঁড়াইলেন না কেন? দুষ্কর্মগুলি যাহাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইল, তাহাদের কর্মকুশলতার উপর শ্রদ্ধা থাকে কি করিয়া? কিছুদিন আগেও ইহাদের অভ্রান্ত মনে করা হইত। সাধারণভাবে নেতাদের সঙ্গে-সঙ্গে পার্টির ইমেজ ক্ষুণ্ণ হইল। সবদেশের পার্টির মধ্যেই অল্পবিস্তর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গুরুবিদ্রোহ ও অননুগামিতার সামাজিক পটভূমি রচিত হইল। অনেকদেশে ব্যক্তিপূজা ও সহাবস্থান তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা করা হইল। এ-ভুল বিশেষভাবে করিলেন অতিসংবেদনশীল অপরিণত-মানস শিল্পী সাহিত্যিক। ব্যক্তিপূজার অবসানকল্পে আত্মব্যক্তিত্ব বিকাশ-আশায় শিল্পীর স্বাধীনতার উপর অতিগুরুত্ব স্থাপন করিলেন। সহাবস্থান তত্ত্ব 'ইডিওলজির' ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হইল। ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্ব, কিয়ের্কেগার্ড, কামুর অস্তিবাদী দর্শন, ডিউইর প্রশিক্ষণতত্ত্ব মার্কসবাদীর কাছে সচল হইয়া গেল। আর্নষ্ট ফিশারের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক ফ্রয়েডগন্ধী মতামত কমিউনিষ্ট মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। দস্তয়েভস্কির মূল্যায়নে একটু বেশি বাড়াবাড়ি ঘটিল। [বর্তমানে আবার দেখিতেছি ফিশারের সম্পর্কে উষ্মা ও দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা]। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কাফকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লইয়া রীতিমত সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন স্তালিনপন্থী নেতারা এদিকে খুব একটা বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই, রাজনৈতিক লাইনে কট্টর ও শিল্পসাহিত্য লাইনে 'উদার' মনোভাব দেখাইয়া তাঁহারা যে-জটিলতার, যে-বৈপরীত্যের গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিলেন, তাহার জের এখনও চলিতেছে। পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দক্ষিণপন্থী উদারপন্থীদের আক্রমণ ঠেকাইতে তাঁহারা হিমসিম খাইতেছেন।

সব রাষ্ট্রেই ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিত্ববিকাশের যুগপৎ চেষ্টা চলিতেছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমাধান-অসাধ্য বৈপরীত্যের ফলে

সেখানে এই সমীকরণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধনিরসন সম্ভব। পার্টির সংগঠন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের পরিচালনব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তনের ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের উপায় বর্তমান। সব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও কোনো-কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে গুরুবিদ্রোহ ও অননুগামিতার কিন্তু আশু উপশমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, তাছাড়া ক্রমোন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে উৎপাদন-সম্পর্ক, সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তি-রাষ্ট্র ও ব্যক্তি-পার্টি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমশ জটিলতর হওয়ার দরুন নিত্য-নূতন সমস্যা দেখা দিতেছে। অবশ্য সেই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াসও চলিতেছে। নিত্য-নূতন সমস্যার সমাধানের পথে ত্রুটিবিচ্যুতি স্বাভাবিক, কিন্তু অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেছেন না; কিছু সংখ্যক তীব্র সমালোচনা করিয়া ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন (যেমন চেকোস্লোভাক প্রশ্নে)। শেষোক্ত সংখ্যালঘু দলকে শাস্তিবিধান করিলেই রাষ্ট্র বা পার্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ২০তম কংগ্রেসের পর পার্টির সাংগঠনিক ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক বিকাশ ঘটিয়াছে কতখানি—বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সরিষার মধ্যে যদি আমলাতান্ত্রিক ভূতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে, তবে সে-ভূত বাহির হইয়াছে কিনা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং অনুপ্রবিষ্ট থাকিলে দূর করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রের, পার্টির বা অতি-সামাজিকীকরণের চাপে ব্যক্তিত্ব পিষ্ট হইবে না; অসুস্থ গুরুবিদ্রোহ ও অননুগামিতা-প্রবণতা অংকুরেই বিনষ্ট হইবে; সমাজতন্ত্রের মধ্যেই রাষ্ট্রবিলোপের [withering away of state] সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অনেকের ধারণা, রাষ্ট্রের ও পার্টির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ব্যক্তিপূজার কুফল সম্পর্কে যতটা ওয়াকিবহাল, ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে ততটা সচেতন হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। একক শক্তিশালী হইয়া ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার বাসনা নিশ্চয়ই তাঁহাদের নাই। কিন্তু কয়েকজন মিলিয়া ক্ষুদ্র 'জুনটা' গড়িয়া ক্ষমতা সংরক্ষিত করিবার দুর্বলতা হইতে যে রাষ্ট্রনেতা ও পার্টিনেতারা মুক্ত হইয়াছেন—এ-সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে। প্রকৃতির উপর ক্রমাধিপত্যের যুগে মানুষের উপর আধিপত্য করিবার মোহ বাড়িতেছে। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও তীব্র হইতেছে। গুরুবিদ্রোহ ও অননুগামিতা তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। সর্বদেশের সংগঠন ও পার্টির মধ্যে আজ

তাই ভাঙনের প্রবণতা দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহীরা তৎপর হইয়াছে। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকুলতা এই দশকে বেশি সংখ্যকের মধ্যে দেখা দিয়াছে। নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, নূতন ধরনের গুরু সৃষ্টি হইতেছে। নূতন গুরুর বিরুদ্ধে আবার নালিশ জমিতেছে। বিরোধ বাধিতেছে। গুরুবিদ্রোহ ও অনমুগামিতার মূলে কি তবে অন্যের উপর কর্তৃত্বস্পৃহাও কাজ করিতেছে? বুর্জোয়া সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দ্বারা অর্থাগম ঘটিয়া থাকে আমরা জানি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এ-কর্তৃত্বের মোহ কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? উত্তরে বলা যায়, ক্ষমতা নিরাপত্তাবোধের সহায়ক। সমাজতন্ত্রে কোনো-কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা বা নিরাপত্তার অভাবে ভুগিতেছে বলিলে সমাজতন্ত্রকে হেয় করা হয় না। তাঁহারা ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিয়া নিরাপত্তালাভের চেষ্টা করিতে পারেন; অথবা পার্টি-বিরোধী, গুরুদ্রোহী বা অনমুগামী হইয়া আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারেন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেকরকম রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হইতেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মার্কসীয় নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অভাবে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে এবং আরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রেণীসমাজের নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে রটনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের কোনো নীতিজ্ঞান নাই। কমিউনিষ্টরা 'মর‍্যালিটি' প্রচার করে না;—মানে ইহা নহে যে, তাহারা নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত। কেহ এক গালে আঘাত করিলে, অন্য গাল আগাইয়া দিবার উপদেশ, সর্ব অবস্থায় শত্রুকে ক্ষমা করিবার নির্দেশ, সহজিয়া মানবতাবাদের ও নির্বিশেষে সকলকে প্রেম বিলাইবার কথা, মার্কসীয় নীতিশাস্ত্রে নেই। লেনিন বলিয়াছেন, আমাদের নীতিশাস্ত্র সর্বহারাদের শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষক। তাই বলিয়া এই কথাগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রেণীসংগ্রামের নামে সর্বপ্রকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। শ্রেণীস্বার্থে, প্রতিবিপ্লবের আশংকা নিরসনে, অনেক রকমের নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু অমানবিক ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি এইরূপ অন্যায় অনেক সংগঠিত হয় এবং শ্রেণীস্বার্থ হইতে পার্টিস্বার্থ, এবং পার্টিস্বার্থ হইতে পার্টিনেতার স্বার্থে এই অন্যায় ও দুষ্কৃতি পরিচালিত হইতে থাকে, তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে গুরুবিদ্রোহ ও অনমুগামিতা অনুষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নয়।

"Our morality is entirely subordinated to the interests of the class struggle of the proletariat"—এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ কি? শ্রেণীসংগ্রাম বা প্রলেতারিয় বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় এক শ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা অন্য শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিবার জন্য নহে। এ-বিপ্লবের উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া শ্রেণীপ্রাধান্য, শ্রেণীশোষণ, বিচ্ছিন্নতার নিরসন এবং শ্রেণীবিলুপ্তি। বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্র কোনো শ্রেণীবিশেষের স্বার্থবহ নহে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ-ভিত্তিক নীতিবোধের পরিবর্তে সামাজিকীকরণের নীতিবোধ প্রবর্তিত করা শ্রেণীসংগ্রামের উদ্দেশ্য। মনুষ্যজাতির স্বার্থসাপেক্ষ নীতি নিঃসন্দেহে মহত্তর নীতিবোধ, শোষণহীন সমাজের নীতিবোধ। 'উদ্বৃত্ত মূল্যের' উপর অধিষ্ঠিত সমাজের নীতিশাস্ত্র নিশ্চয়ই সেই নীতিশাস্ত্রের সহিত মিলিবে না; দেউলিয়া বুর্জোয়া-সমাজের আত্মরক্ষার দুর্নীতি কখনও প্রলেতারিয় শ্রেণীসংগ্রামে প্রয়োজন হইবে না, প্রযুক্ত হইবে না। বিপক্ষের সহিত সংগ্রামে তাহাদের দুর্নীতির ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করিলে, লক্ষ্য ও উপায়কে এক করিয়া দেখিলে, বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পূর্বে এইরকম ভুলের জন্য উচ্চহারে মাশুল দিতে হইয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে মার্কসবাদীদের শিক্ষালাভও হইয়াছে। সেই শিক্ষা অনুযায়ী নীতিশাস্ত্র পুনর্বিন্যস্ত হইতেছে। মার্কসবাদকে প্রয়োগবাদের সহিত এক করিয়া দেখিবার সুযোগ—মনে হইতেছে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত সমালোচক আর পাইবেন না। তাই বলিয়া, শত্রুকে নির্মম আঘাত বা নিঃশেষ করিবার ব্যাপারে মার্কসবাদীরা চৈতন্য-চরণাশ্রিত হইতে পারেন না। কিন্তু ক্রমশ সংগ্রামের নিয়ম-কানুন উচ্চতর সমাজতান্ত্রিক নীতিশাস্ত্র ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে।

লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কিত দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলি সবিশেষ আলোচিত হইতেছে। নূতন সমাজ গড়িতেছেন যাঁহারা, সেই সমাজের উপযুক্ত মানুষ গড়িয়া তুলিবার দায়িত্বও তাঁহাদের। "বিপ্লবের কাজে লাগিবার জন্যই ব্যক্তি,"—বা 'বিপ্লবের জন্য ব্যক্তি'—অমানবিক পন্থা ও লক্ষ্যকে এক করিয়া দেখিবার প্রবণতা হইতে এই অতিবাম একপেশে উক্তির উদ্ভব। "ব্যক্তির জন্য, মানুষের জন্যই বিপ্লব"—এই কথার তাৎপর্যের আরো সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। উচ্চতর মহত্তর সমাজের জন্য উচ্চতর, মহত্তর মানুষ দরকার। তাই বলিয়া বিপ্লবের জন্য 'ময়্যাল আরমামেণ্ট'-ওয়ালাদের দ্বারস্থ হইতে বলিতেছি না। অথবা সাধুসন্তদের উপদেশে 'উদ্বৃত্ত

মূল্যের' শিকারী চিতাবাঘের গায়ের দাগগুলো বদলাইবার সম্ভাবনার কথাও বলিতেছি না। ব্যক্তিত্ব বিকশিত করা মানে সশস্ত্র, নিরস্ত্র কোনো প্রকার সংগ্রামবিমুখ করিয়া তোলা নহে। বিপ্লবের সংগ্রামের সৈনিক হইলেই যুদ্ধকালে বুর্জোয়া সৈনিকসুলভ পশুত্বের স্তরে নামিয়া যাইবার প্রয়োজন আছে মনে করি না। "যে যেরকম তাহার সহিত সেইরকম ব্যবহার করা উচিত," "শঠে শাঠ্যং", "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্";—ইত্যাদি অতি-পুরাতন চাণক্য-নীতি মার্কসীয় নীতিশাস্ত্রে অচল। উন্নততর সংগ্রাম-স্ট্রাটেজীর জন্যই নীতিবান, চরিত্রবান সৈনিকের প্রয়োজন।

কিউবার কথা না-তুলিলে হয়ত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে অতিক্রম করিয়া ক্ষমতা দখল ও বিপ্লব সফল করিয়া কাস্ত্রো নূতন নজির দেখাইয়াছেন; যাহার ফলে বর্তমানে পার্টিকে ছোট করিয়া দেখিবার প্রবণতা দেখা দিয়াছে; এই মতও কেহ-কেহ পোষণ করেন। কিন্তু পার্টির সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্ভব হয় নাই।

বিদ্রোহী ও অননুগামী চিরকাল সব সমাজেই বিদ্যমান। ইহাদের মস্তিষ্কের টাইপে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। মানসিক প্রবণতার জন্যই হয়ত ইহারা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী। ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশ এই বিরুদ্ধাচরণকে ও মানসিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করিয়া বিক্ষোভকে দীর্ঘ বা হ্রস্বস্থায়ী করিয়া তোলে, তীব্রতা বা স্তিমিতত্ব লইয়া আসে।

আজ বিক্ষোভমন্যতা ছাত্রদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নহে। পরিবৃত্তিকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ বর্তমানে সর্বস্তরে অনুভূত ও প্রকাশিত। ছাত্র, শিক্ষক,আইনজীবী, চিকিৎসক, দোকানী, কেরানী, শ্রমিক, চাষী সকলেই বিক্ষুব্ধ। অতিতুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সকল স্থানে থাকিয়া থাকিয়া রোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। সব মানুষই অস্থির চঞ্চল অসহিষ্ণু। মনে হয়, সকলেই যেন অশেষ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লইয়া, আশানিরাশা হর্ষবিষাদে কম্পমান হইয়া কোনো কিছু অভাবনীর ঘটনার জন্য শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিন নহে, প্রহর নহে, মুহূর্ত গণিতেছে। ছাত্রতরুণদের স্পর্শপ্রবণ মনে সেই বিক্ষোভের মাত্রা বিশেষ-ভাবে অনুভূত; তাহারা বিচ্ছিন্নতা-প্রসারক শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চায়।

১৩

নয়াবাম মানসিকতার একদিক

'নয়াবাম'—আজকের দিনের ছাত্র-তরুণদের এক অংশের স্ব-আরোপিত অভিধা।

নয়াবাম-মানসিকতা, নয়াবাম-প্রবণতা, সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিকদের বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নয়াবাম-মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক সমীক্ষা চলেছে, সমীক্ষকদের রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, রিপোর্টের উপর তর্ক-বিতর্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ সমীক্ষাই বুর্জোয়া-সমাজতত্ত্বের ফ্রেমে বাঁধা অথবা ফ্রয়েডীয় ও নিও-ফ্রয়েডীয় প্রত্যয়ভিত্তিক। তা সত্ত্বেও সমীক্ষাগুলি তথ্যবহুল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমীক্ষকদের সিদ্ধান্ত পূর্ব-পরিকল্পিত না-হওয়ায় বিষয়মুখিতা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ। বুর্জোয়া সংবাদপত্র নয়াবামদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। সংবাদপত্রের কৃপায় কয়েকবছর আগেকার নয়াবাম আন্দোলনের নেতারা আজ বিশ্ববিখ্যাত, তাদের সমাজবিমুখ মানসিকতা এ-দেশের এবং অন্যান্য দেশের তরুণদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। শিল্পসাহিত্যের বাজারে হিপি-বিটিদের প্রভাব অটুট, যদিও আজকের নয়াবামদের জঙ্গী মনোভাবের ফলে কিছুটা ম্লান। ষাটের দশকে নয়াবাম আন্দোলনে 'এ্যাক্টিভিষ্ট'দের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, 'রিসেসিভ'রা আরো

পিছু হটে আন্দোলনের বৃত্ত থেকে প্রায় নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। ছাত্র-তরুণরা কয়েকবছর আগে যখন দক্ষিণ-কোরিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়ায় বাম বা দক্ষিণ-রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন আমেরিকা-ইউরোপের নয়াবাম আন্দোলনে এ্যাক্টিভিষ্টদের প্রভাব এত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। আজ নয়াবাম-নেতৃত্বের দাবি অনুসারে প্রায় সর্বত্র নয়াবাম আন্দোলন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত। দু-বছর আগেকার মে-মাসে ফরাসী দেশের ঘটনা (নয়াবাম শিবিরের মতে বিদ্রোহ, যা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধাচরণের ফলে অসমাপ্ত রয়ে গেছে) থেকে আজকের বন, ম্যানিলা প্রভৃতি শহরে যুদ্ধবাজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, সারা আমেরিকা জুড়ে নিক্সন-এর যুদ্ধনীতির প্রতিকূলতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভমিছিল, যার ফলে এই সেদিন কেণ্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন তরুণ-তরুণী জাতীয় প্রহরীবাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন;—এ-সবই বর্তমান নয়াবাম আন্দোলনে জঙ্গীভাবাপন্ন এ্যাক্টিভিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির নির্দেশক। সাম্প্রতিক কালের নয়াবাম আন্দোলনের এই যুদ্ধ ও আগ্রাসন-নীতির বিরোধিতা ইস্রায়েলে গোল্ডামেয়ার-মোশেদায়ান-এর সরকারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। আমেরিকা ও ইস্রায়েলে ছাত্র-তরুণদের এই মনোভাব সরকারী নীতির আশু পরিবর্তন ঘটাতে না-পারলেও, সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে নিশ্চয়ই। এই নয়াবাম আন্দোলনের গুরুত্ব ঐসব দেশের সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট সংবাদপত্র ও তথ্য সরবরাহকারীরাও অস্বীকার করতে পারছেন না।

নয়াবাম মানসিকতা এদের আন্দোলনের রূপ, নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, আবার এদের আন্দোলনের রূপ-রীতি দ্বারা অনেকাংশে এদের মানসিকতা প্রভাবিত হচ্ছে। আন্দোলনের রূপ দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন। কখনও স্তিমিত, কখনও তীব্র; কোথাও সীমিত, কোথাও ব্যাপক, এই মুহূর্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু, পরমুহূর্তে প্রমত্তা পদ্মা। নয়াবামদের মতে, এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'নিউ লেফ্‌ট রিভিউ' পত্রিকার (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৮) সম্পাদকীয় স্তম্ভে[১] বলা হয়েছে,—ফ্রান্সের মে-বিপ্লবের সম্ভাবনা আগে

১ The May Revolution in France was foreseen by nobody. It burst upon the world without warning—

থেকে কেউ বুঝতে পারেন নি। কোনোভাবে সতর্ক না-করে বিপ্লব পৃথিবীর ওপর ফেটে পড়েছিল। পূর্ব-কল্পিত কোনো প্যাটার্নের সঙ্গে এর মিল ছিল না। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শ্রমিকরা মালিকশ্রেণীর স্বার্থের তাঁবেদার, তাদের কোনো অভিযোগ নেই, অসন্তোষ নেই; বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের সমীক্ষার ফলে এই রকমই মনে হয়েছিল। দেখা গেল বিপ্লবের স্রোত শুকিয়ে যায় নি, সহসা সিসমোগ্রাফে কোনো সঙ্কেত না-দিয়েই ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল।[২] প্রশ্ন করেছেন সম্পাদক—কিভাবে এই চৈতন্যের বিস্ফোরণের ব্যাখ্যা করা যায়? ঘুমন্ত, মৃতপ্রায় বলে যাদের মনে হয়েছিল, তারা নয়াবাম আন্দোলনের মৃতসঞ্জীবনী স্রোতের স্পর্শে সহসা চোখ মেলে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে আবার বিপ্লবের শপথ নিল। মানসিকতার পরিবর্তন আকস্মিক-ভাবেই ঘটে। আজ যারা সন্তুষ্ট ও বুর্জোয়া-অনুগামী শান্তশিষ্ট শ্রমিক, কালই তারা অননুগামী বিদ্রোহী হয়ে যেতে পারে। চৈতন্যের অভিব্যক্তি সম্পর্কে এ-যাবৎ যে-ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, সে-তত্ত্বের অসারত্ব মে-বিপ্লব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নয়াবাম মানসিকতায় বিপ্লবের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার চিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট।[৩]

Editorial Introduction ; New Left Review, Nov-Dec 1968, P—1.

২ The whole apparatus of sociology—poll, tests and questionaires—was brought to bear, not only by bourgeois scholars but also by socialists, in order to show that the working class has lost its impulse to challenge the status quo. ....We know now that all this speculation is utterly discredited. Advanced capitalist society does not reduce all its citizens into helpless automata, incapable of exercising free and independent action. The well-spring of revolt has not dried up [Ibid P 2].

৩ How do we explain this sudden switch of consciousness, this abrupt reversal from acceptance to rebellion, from obedience to mutiny? ....We need a theory of dual consciousness, a theory that can take account of

ড্যানিয়েল কোন বেণ্ডিটকে নয়াবামদের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা আজ নিঃশেষিত; রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পরিবর্তনের পুরণো ধাঁচের আন্দোলনের আজ আর কোনো মূল্য নেই। তাই নয়াবামরা শুধু পার্টিবিরোধী নয়, সর্বপ্রকার সংগঠন-বিরোধী। কমিউনিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন বা ঐ জাতীয় গণসংগঠনের প্রতি এদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অতি তীব্র।[৪]

বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়-এর লিখিত পুস্তকটিতে [অবসলিট কমিউনিজম : দি লেফট উইং অল্টারনেটিভ] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, সংগঠন, পরিচালনা-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা আছে। তীব্রতর ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে কমিউনিষ্ট ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের প্রতি। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিফলিত। বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে শিল্পপতিদের অর্ডার মাফিক তাদের মুনাফা অর্জনের সাহায্যকারী হিসেবে তরুণ ছাত্রদের ভেঙে-চুরে আমলাতান্ত্রিক ছাঁচে ফেলে যন্ত্রের দোসর;—এই সমাজব্যবস্থার পরিপোষক ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, ম্যানেজার, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, কেরাণী, দক্ষ শ্রমিক তৈরী করছে; আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে এইসব তরুণ-মানসে মানবতাবাদী দর্শন, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ শিল্পসাহিত্য ও অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলবার চেষ্টাও করছে। এভাবে শোষণব্যবস্থার মূল চরিত্র ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। শোষণযন্ত্রের অঙ্গ বিশেষে পরিণত হতে এসে ছাত্রদের অগ্রগামী অংশ শোষণের স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতার কারণগুলো জানছে। যে-বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যন্ত্রাঙ্গ অটোমেটনে পরিণত করতে চাইছে, সে-ই আবার নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে মুক্তিপ্রয়াসী বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করছে। শোষণযন্ত্র তথা সর্বপ্রকার আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ধ্বংস করবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। এছাড়া এই নয়াবাম নেতার বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, সংগঠন ও পরিচালনাব্যবস্থা—কোনোটাই দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিবর্তিত

---

abrupt and unexpected alternations and switches. Just as history shows uneven and confined development, so too does consciousness.

৪ Obsolete Communism : The Left Wing Alternative ; Daniel Cohn Bendit & Gabriel Cohn Bendit.

হচ্ছে না। অচলায়তন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে। তাই তারা—সংগ্রামী বামরা, শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বিশ্ববিদ্যালয় দখল করবে। তাই তারা কারখানার প্রশাসকপদের জন্য নিজেদের তৈরি রাখবে। কিন্তু কিভাবে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেদিন হঠাৎ রোষের প্রকাশ ঘটবে, সেইদিনে আকস্মিকভাবে ক্ষমতাদখল কি সম্ভব? এই বামরোষ কিন্তু (যাই বলুন না কেন 'নিউ লেফ্‌ট রিভিউ'-এর সম্পাদক) আকস্মিক নয়, একে স্বতঃস্ফূর্ত বলা তো চলেই না। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্ট[৫] পড়ে আমরা জানতে পারি যে, সাত-আট বছর আগে থেকে গ্রেট বৃটেনের মতো সংরক্ষণশীল দেশের ছাত্রদের এক অংশের মনে রোষবহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে। তারও কয়েকবছর আগে থেকেই শিল্পসাহিত্যনাটকে রাগী যুবকদের প্রাধান্য দেখা গেছে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ছাত্রদের ক্রোধপ্রকাশ ও বিশৃঙ্খল আচরণ এক দশকেরও বেশি পুরণো। রোষ স্ফুলিঙ্গ আকারে দেখা দিয়েছে বহুপূর্বে, রোষ সঞ্চিত হচ্ছে

---

৫ The second group, forming a minority of a quarter, responded positively to my question : 'Are you angry about something' ? But the anger was rather concocted and lukewarm. The answers run as follows :

"I am angry about the way Britain is run"

"I am angry about nothing getting done, about our stagnant society"

"I am angry about the commercialism and materialism of our older generation"....

"I am angry about our educational system"

"I am angry about the H. Bomb"

"I am angry about the present society, it is all wrong"

"There is a lot of good in rebellion of youth"

"I am angry at being treated as a child"

"I am angry against thsoe who are telling me what to do."

Ferdy and Zweig: The Student in the Age of Anxiety —A Survey of Oxford and Manchester students: (1963 —P 129).

বহুদিন ধরে। বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে হয়ত দাবানল জ্বলে উঠছে। শুধু ছাত্র নয়, শুধু তরুণ নয়, বয়স-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সকলেই আজ রুষ্ট। রোষপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা ছাত্রদের বেশি, তাই দল বেঁধে তারা পুরণো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করছে, সবকিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে। এই ধরনের কথা আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখে শুনতে পাচ্ছি। কিছু সত্য এই বক্তব্যের মধ্যে আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ছাত্ররোষের ব্যাপকতা ও গভীরতার ব্যাখ্যা এই বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। সমাজবাস্তবের যে-ছবি এঁদের তথ্য থেকে ফুটে ওঠে, তা থেকে অনুমিত হয় যে, আমরা এক পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি। সেই সঙ্কটকালীন অস্থিরতা শুধু ছাত্র-তরুণ নয়, কম-বেশি সব মানুষকেই প্রভাবিত করেছে, এবং এর ফলে বিশেষ এক মানসিকতার উদ্ভব হয়েছে। আগেই বলেছি, অদীক্ষিত মানুষের মনে এই অবস্থায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটতে থাকে যে, মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়ে।...যুক্তি-বুদ্ধি-ভাবপ্রবণতার মধ্যে লড়াই বাধে। যে-জগতকে চিনতাম, বুঝতাম, তার রূপরেখা অস্পষ্ট হচ্ছে, রঙ মুছে যাচ্ছে, অন্য এক জগত নতুন রঙে, নতুন রূপে, নতুন রেখায় ফুটে উঠছে; কিন্তু তাকে জানি না, চিনি না, বুঝি না। কোনটি আমার নিজস্ব? পরিবৃত্তিকালীন মনোবৃত্তি অনেকটা জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে রণাঙ্গনে সৈনিকের মনোবৃত্তির সমান। 'নিউ লেফ্‌ট রিভিউ'-এর সম্পাদক বা বেণ্ডিট-ভ্রাতৃদ্বয়কে জানাতে চাই যে, এই মানসিকতা দ্বারা তাঁরাও আচ্ছন্ন। প্যারীতে মে-মাসের অভ্যুত্থান (?) কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের অভিব্যক্তি এই ঘটনা। তাঁরা যেসব বিপ্লবীতত্ত্ব পরিবেশন করতে চেয়েছেন, সেগুলো ভাববাদী দার্শনিকদের কথা। মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই ধরনের কার্য-কারণ-সম্পর্করহিত অনিশ্চয়তাবাদ, স্বতঃস্ফূর্ততা, আকস্মিকতা-তত্ত্ব বহুবার বহুভাবে প্রচারিত হয়েছে[৬] এবং মার্কসবাদীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকথা যথাযথভাবে খণ্ডিত হয়েছে। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে গিয়ে আমরা

---

৬ সম্পাদক (নিউ লেফ্‌ট রিভিউ) বলছেন :—"This means that we must reject those traditional theories of strategy and tactics which have postulated and emphasised the gradual growth of consciousness. ....It envisages the

যদি অবৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্বকথার উপর আস্থা স্থাপন করে বসি, বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। মার্কসবাদীরা দ্বান্দ্বিক বিচারের সাহায্যে পূর্বাভাষ প্রদানে সক্ষম। পূর্বাভাষ সব সময়ে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাবে, এমন কথা নয়। তা বলে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নেই, সবকিছু ঘটছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, চৈতন্যের ক্রমবিকাশ নয়—আকস্মিক-বিকাশতত্ত্বই একমাত্র সত্য; এই ধরনের একপেশে তত্ত্বকথা সত্য হয়ে উঠবে না। উইলিয়াম এ্যাশ ৭ মার্কসবাদ-বিরোধীদের লক্ষ্য করে যে-কথাগুলো লিখেছিলেন, সে-কথাগুলো এঁদেরও শোনানো যেতে পারে। যদিও এঁরা, এই নয়াবাম প্রবক্তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সরাসরি নিষেধ করছেন না বা মার্কসবাদকে প্রত্যক্ষভাবে নস্যাৎ করছেন না, তবুও তাঁদের বক্তব্য মার্কসবাদ-বিরোধিতারই সামিল। সমাজ-ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আভাষ পাওয়া যায় না বলা আর মার্কস-এর

---

gradual growth of a mass party, directed phase by phase and step by step by an enlightened vanguard until eventully a moment of crisis is reached and the process culminates in revolution" (New Left Review : op cit : pp 2-3)

৭ An empiricism of observation alone, divorced from experimental practice can prove nothing about the future of anything and ascribe its own disability to history's inscrutable nature. Far from being a method for securing tentative social advances, neo-empiricism has become a check on any change at all ; and it betrays its non-materialist character by the utterly sterile and scholastic quality of its formulations by arguing that no prediction can be absolutely correct in every detail and therefore that no major social changes should ever be envisaged ; this so-called empiricism shows itself to be as static an idealism as the philosophical foundations of Plato's frozen Republic. (William Ash : Marxism and Moral Concepts : pp 116-117).

ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা একই কথা। বিপ্লবের সঠিক দিন-ক্ষণ নির্ণয় করা দুরূহ বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুমান করে পার্টির 'স্ট্র্যাটেজী-ট্যাক্‌টিকস্' ঠিক করা মার্কসবাদীদের পক্ষে সম্ভব। রুশিয়া, চীন, কিউবার ইতিহাস নয়াবামতত্ত্বকে সপ্রমাণ করে না। রুশিয়ায় ও চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লবের পরিস্থিতি সঠিক অনুমান করেছিলেন, এবং সুশৃঙ্খলায়িত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। কিউবাতে কাস্ত্রো এবং তাঁর অনুগামীরা বিপ্লবের পূর্বাভাষ বুঝেছিলেন এবং তাই বিপ্লবকে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। রুশিয়ায়, চীনে, কিম্বা কিউবায় কোথাও পার্টি বা বিপ্লবী দল স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব-তরঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করে বিপ্লব সফল করার বাহাদুরি নিতে চাননি। নয়াবামরা যাকে 'স্বতঃস্ফূর্ত' বলে মনে করেছেন, আসলে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ; মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের রূপ। চৈতন্যের বিস্ফোরণ বা আকস্মিক আবির্ভাবতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত নয়। নয়াবামরা যান্ত্রিক এবং ভাববাদী ধারণায় আবিষ্ট। চেতনার আদি রূপেরও ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ আছে। সংবেদন হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে বস্তুর মধ্যে আবির্ভূত হয়নি। বাইরে থেকেও আরোপিত হয়নি। বস্তু লক্ষ-লক্ষ বছরের অভিব্যক্তি (ইভোলিউশন) ও ক্রমবিকাশের ফলে চেতনার প্রথম পর্যায় সেনসেশন বা সংবেদনক্ষমতা লাভ করেছে। অজৈব থেকে জৈব পদার্থে উন্নীত হয়েছে। এককোষ-প্রাণী ক্রমবিবর্তনের ফলে ক্রমশ মানুষ হয়েছে। নয়াবামরা এই ক্রমবিকাশ, এই নিরবচ্ছিন্নতা, এই ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে চান না। এই স্বীকার করতে না-চাওয়ার মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বাইরের সমাজবাস্তবের উদ্দীপনা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করার ফলে ধীরে-ধীরে চেতনার সঞ্চার, বিস্তার ও বিকাশ ঘটে—এই কথা স্বীকার করলে অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে হয়, অগ্রগামীকে শ্রদ্ধা করতে হয়। যুক্তি-বুদ্ধির আধিপত্যকে স্বীকার করলে হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, 'পারমানেণ্ট রেভোলিউশন'কে স্বাগত জানানো যায় না। নয়াবামরা অগ্রগামীদের উপর নানাকারণে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। মার্কসবাদকে অস্বীকার করতে চাইছেন, কেননা অগ্রগামীরা মার্কসবাদকে বিপ্লবের হাতিয়ার মনে করে এসেছেন ও এখনও মনে করছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মপ্রচেষ্টা ও চেতনাশ্রিত উদ্দেশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মার্কস। সজ্ঞানে উদ্দেশ্য ও

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার, এবং পরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনের বিধিনিয়মের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে উপদেশ দিয়েছেন। নয়াবামদের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা-তত্ত্বের মধ্যে আমেরিকার ব্যবহারবাদীদের প্রভাব সুস্পষ্ট।[৮] যুক্তি-বুদ্ধির পরিবর্তে যান্ত্রিকতার জয়গান, অথবা বলা চলে, একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত গেস্টাল্ট মনস্তত্ত্বের প্রচার-বিভাগের ভার নিয়েছেন এই নবীন বিপ্লবীরা। মার্কসবাদের 'কগনিশান' তত্ত্বকে একসময় এই গেস্টাল্ট-তত্ত্ব ভাববাদী দর্শনের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। বিজ্ঞানী পাভলভ এই 'হঠাৎ জ্ঞানোদয়' বা গেস্টাল্ট-তত্ত্বকে পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করেছেন। মার্কসবাদ এর দ্বারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে।[৯]

---

৮ Nominally behaviourism implies the study of the behaviour of animals under the influence of external stimuli. The behaviour of animals and of men too, is said to be the sum-total of the body's responses to external stimuli, under whose influence the animal organism engages in purely mechanical exercise. Hence rejection of the conscious activity of animals and men, which is dissolved in the mechanical responses of the organism. There is no indication whatsoever of any activity of the consciousness, or of man's reason. This behaviourist view of psychical activity oi animals and men is purely mechanical, oversimple and vulgar. (Kursanov G.—Fundamentals of Dialectical Materialiam : Pp 108-109)

৯ "গেস্টাল্টবাদীদের বক্তব্য কি? তাঁরা অখণ্ডতারূপ মতবাদের প্রতিনিধি ও প্রবক্তা। তাঁদের মতানুসারে সমস্ত সংশ্লেষিত রূপই হলো বিবেচ্য বিষয়, কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নয়। গেস্টাল্ট শব্দটির অর্থ হলো নক্সা, বিশিষ্ট নমুনা বা প্রতিমূর্তি। ...গেস্টাল্টবাদের বিদ্রোহ হলো মনস্তত্ত্বের মৌল সমস্যারূপে বিশ্লেষণক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ভারী অদ্ভুত, কারণ বিজ্ঞানের সব বাস্তব ও আধুনিক শাখাই বিশ্লেষণক্রিয়াকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে থাকে এবং প্রারম্ভিক কাজের সূত্রপাত করে এই বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই। উণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অনুষঙ্গবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবেই এই গেস্টাল্টবাদের আত্মপ্রকাশ। সরল পরাবর্ত ও সংবেদন—

মার্কসবাদীরা মনে করেন, চৈতন্য-বিকাশ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। চৈতন্য-বিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে।[১০]

নয়াবামদের বক্তব্য ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণে আমি কি একটু বেশিমাত্রায় মার্কসীয় দর্শন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেলেছি? তাঁরা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে আখ্যাত হতে চান? তাঁদের কাছে এইসব উদ্ধৃতির মূল্য আছে কি? আমার মনে হয়, আছে। নয়াবামদের মধ্যে নানা ধরনের মতবাদের প্রভাব আছে। মার্কস, ট্রটস্কি, মাও, কাস্ত্রো, চে, মারকিউস,—এইসব ব্যক্তিত্ব দ্বারা তারা প্রভাবিত বলে শুনতে পাই। এর মধ্যে এক মারকিউস ছাড়া আর সকলেই মার্কসবাদী বলেই পরিচিত। মারকিউস ফ্রয়েডবাদ দিয়ে মার্কসবাদকে সংশোধিত করেছেন। আমাদের দেশে তো নয়াবামদের এক বৃহৎ গ্রুপ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের প্রচার করেন। সুতরাং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল এবং সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যয়গুলিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সময়োপযোগী করে রণকৌশল, 'স্ট্র্যাটেজি-ট্যাকটিকস' নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে নস্যাৎ করতে পারেন না। তাঁরা যদি ঘোষণা করেন যে, মার্কসবাদ মৃত বা বর্তমান পরিস্থিতিতে অচল, তাহলে অবশ্য

ত্রুটিকেই মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।" উপরের উদ্ধৃতি আই. পি. পাভলভের "বুধবাসরীয় আলোচনাচক্রের" ১৯৩৪ সালের ২৮শে নভেম্বরের আলোচনা থেকে নেওয়া। পাঠকদের মনে রাখা দরকার, সংবেদন ও বিশ্লেষণকে অস্বীকার করার অর্থ বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করা। "হঠাৎ চৈতন্যোদয় তত্ত্ব" মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী।

—লেখক

১০ Human consciousness develops continuously on the basis of the whole of human social development. It rises gradually to the level of abstract theoretical activity when it takes for its object not only the immediately perceived things, but also their relations. By reflecting the relations and ties between objects, man identifies himself in the objective world and unlike the animal, comprehends his relation to it. (Kursanov G: Fundamentals of Dialectical Materealism. P 106).

আমার বলার কিছু থাকবে না। আমার মনে হয়, পুরণো মার্কসবাদী পার্টি-গুলোকে আক্রমণ করার ঝোঁকে তাঁরা মার্কসবাদকেও আক্রমণ করে চলেছেন। এর দ্বারা প্রতিক্রিয়ার শক্তিই বাড়ছে। নয়াবাম আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা, শুধু অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। তাঁরা নিশ্চয়ই গত শতাব্দীর বাকুনিন ও ব্ল্যাংকুই-এর মতো নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিসিজমে ও ইউটোপিয়ান কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন। কেবলমাত্র চাষী ও লুমপেন প্রলেতারিয়েটরাই বিপ্লব আনয়নে সক্ষম, আর কেউ নয়,—এই অবাস্তব ধারণা নয়াবামদের সকলে পোষণ করেন না নিশ্চয়ই। মারকিউস দ্বারা এঁদের সকলেই প্রভাবিত, আমি তা মনে করি না। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি নিঃশেষিত,—১৯৬৮ সালের মে-মাসের পর তাঁরা নিশ্চয়ই এরকমটি আর ভাবছেন না। তাঁদের ভুল করে কেউ পেটি-বুর্জোয়াসুলভ রোমান্টিক বা হঠকারী বলুক—এ তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। আমেরিকান সরকার, ইস্রায়েল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আন্তরিকতায় কেউই সন্দিহান নয়। নবীনের ধর্ম, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে আমরা অভিনন্দন জানাতেই চাই, কিন্তু অতি-উৎসাহের ঝোঁকে বিপ্লবের সর্বাত্মক এবং একমাত্র সত্য দর্শনায়ুধকে, মার্কসবাদকে, তাঁরা যদি বিকৃতির প্রলেপে অকেজো করে তোলেন, তবে প্রতিবিপ্লবকে শক্তিশালী করে মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রকে তাঁরা আরো বেশ কিছুদিনের জন্য জীইয়ে রাখতে সাহায্য করবেন। তাই তাঁদের মানসিকতা আমরা ভালভাবে বুঝতে চাই, আমাদের মন তাঁদের কাছে মেলে ধরতে চাই। আন্তরিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি যদি, নিশ্চয়ই আমরা অনেকখানি কাছাকাছি আসতে সক্ষম হব। "জেনারেশন গ্যাপের" বাধা দুরতিক্রম্য নয়।

এতক্ষণ নয়াবামদের রাজনীতি ও রণকৌশলের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার তাঁদের রোষের মৌলিক কারণগুলো বুঝতে চেষ্টা করব। নয়াবাম-মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য পুরণো সবকিছুর প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা। এই রোষ, ঘৃণা, অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ কখনও প্রতিবাদ-মিছিলে, কখনও বিক্ষোভ-সভায়, কখনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, কখনও বা প্রধানশিক্ষক বা উপাচার্যের কক্ষে। রোষ-বহ্নি হঠাৎ জ্বলে উঠছে, অনেক কিছু ভস্মসাৎ হচ্ছে। কোনো সময় এঁদের দাবি অযৌক্তিক, কোনো সময় দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা নির্ধারণের

চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আমাদের দেশের ছাত্রদের মানসিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের চেষ্টা করব, তাঁদের রোষ ও ঘৃণার সামাজিক, আর্থনীতিক ও পারিবারিক কারণগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করব, সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করব। বলাবাহুল্য, এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। লেখকের সামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে যেসব আঞ্চলিক নিরীক্ষার রিপোর্ট বেরিয়েছে, তার সাহায্য প্রয়োজন মতো আমরা গ্রহণ করব। দুঃখের বিষয়, বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বসম্মত আলোচনা এযাবৎ আমাদের নজরে পড়েনি, তাই আমরা ক্ষমতার স্বল্পতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা সত্ত্বেও, এই দুরূহ কাজে এগিয়ে এসেছি। গবেষক-নিরীক্ষকদের কাছে এযাবৎ অবহেলিত একটি দিক অতি সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

ছাত্র-তরুণরা ঐতিহ্যবিরোধী, সবরকম 'অথরিটি', 'কনফরমিটি'কে আঘাত করতে চায়, সবরকম প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতাই এঁদের মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এঁদের বিদ্রোহের চালিকাশক্তি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এর বিপরীত মনোভাবও এঁদের মধ্যে বিদ্যমান। এঁরা গুরুজনকে অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণ করছেন, তাঁদের মতোই আচরণ করে তাঁদের প্রতি আনুগত্য, অনুগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কর্পোরেশন, বিধানসভা, লোকসভায় ছাত্র-তরুণদের পিতৃ-পিতৃব্যরা যে-ব্যবহার, যে-আচরণের নজির দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন, সেই বিশৃঙ্খলা, সেই নিয়ম-অননুবর্তিতাই তাঁরা তাঁদের রাজ্যে প্রদর্শন করছেন। পিতৃ-পিতৃব্যকে যেসব কাজের জন্য তাঁরা শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, সেইসব কাজ, সেইরকম ব্যবহার করেই তাঁরা তাঁদের রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক বছরের শিক্ষকদের আন্দোলন, ব্যবহার ও আচরণে কি 'ডিসিপ্লিন' প্রদর্শিত হয়েছে? এই অবস্থায় শিক্ষক অভিভাবকরা ছাত্রদের কাছে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য আশা করতে পারেন কি? উত্তরে তাঁরা বলবেন, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের নিম্নতম দাবি-দাওয়ার জন্য তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে এবং হবেই। এর জন্যে যদি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা না-হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, দায়ী সংশ্লিষ্ট অথরিটি। প্রতিবাদ করব না, করবার কারণও দেখি না। রোষ প্রকাশ করে, বিশৃঙ্খল আচরণ করে তাঁরা আংশিক-

ভাবে তাঁদের দাবী-দাওয়া আদায় করেছেন। ছাত্ররাও ঠিক সেই পথই বেছে নিয়েছে।[১১] কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ভাষাই বোঝেন,—রোষের এবং ঘৃণার ভাষা; সেই ভাষাতেই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সংলাপ চলছে। কর্তৃপক্ষ মাত্র এক ধরনের আচরণের কাছেই নতি স্বীকার করেন, কাজেই বিধানসভা-লোকসভার বিরোধী দল সেই আচরণে অভ্যস্ত হয়েছেন; ছাত্ররাও অননুগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। অনুগামিতা, অননুগামিতা, গুরুবশ্যতা, গুরুদ্রোহিতা একই সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে ছাত্রদের মনে। এই দ্বৈত মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই শিক্ষায়তনের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপেও। একদিকে মাও, মারকিউস, অথবা গুয়েভারার বাণী-নির্দেশের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ও বশ্যতা, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত পার্টি, দেশীয় সরকার, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহমন্যতা। সমাজবাস্তবে এই দ্বৈত-মানসিকতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। মার্কসবাদী নিরীক্ষক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোধহয় সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

সমীক্ষক-নিরীক্ষকরা আমাদের দেশের ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সে-গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সমীক্ষকরা অন্য একটি বিষয়েও অনুসন্ধিৎসু। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়। একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিরীক্ষা [ফিল্ড স্টাডিজ ইন দি সোশিওলজি অব এডুকেশন—১৯৬৫-৬৬] থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, শিক্ষকদের কাছে ছাত্রদের প্রত্যাশা পরিপূরিত হচ্ছে না।[১২]

---

১১ ....As students have been succeeding in most of their indisciplined adventures, it has been proved to them that their methods are right. This is heavy wine indeed and they are intoxicated by their power against confused and vacillating authorities. (Cormach Margarett: She Who Rides a Peacock; Indian Students & Social Change—a research analysis, Asia Publishing, 1961-P-210).

১২ According to majority of the students, teachers should behave as second parent. However, it can be easily assumed that this expectation of the students is not to

আর একজন সমীক্ষক আরো স্পষ্ট ভাষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতির কথা বলেছেন।[১৩] এই ক্রমাবনতি ছাত্র-মানসে অসহায়ত্বের ভাব আনয়ন করে। সে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ তাকে হয় বিমর্ষ কিম্বা অস্থির করে তোলে। শিক্ষায়তনের গুরুর উপর স্বাভাবিক নির্ভরতা ভেঙে পড়ার ফলে অতি সহজেই অন্য ক্ষেত্রে অন্য গুরুর উপর নির্ভর করে নিরাপত্তার অভাব দূর করতে চায়। সে-গুরুও হয়ত বেশিদিন তার আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতে পারেন না। গুরুর ইমেজ ক্রমশ মন থেকে লোপ পায়। গুরুদ্রোহিতা এবং ঐতিহ্যের প্রতিমা ভাঙার প্রবণতা তাকে পেয়ে বসে। কর্তৃপক্ষ এমনকি মাতাপিতাও অনেক সময় তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের খবর রাখেন না।

---

be fulfilled as the system goes at present. So this image of the students regarding their teachers is bound to fall to pieces [Field Studies in the Sociology of Studies : R. Mukherjee, S Bandopadhyaya and K. Chattopadhyaya : P 165].

১৩ Indian education has always rested on rote-learning (we have found few instructors who even question this method), but it also had the "guru"—the master-teacher who was a personal mentor and "father" to a small number of students. A student identified with his guru, with his chosen master, in all life values.

The system of higher education in India is basically a "lecture-examination" system....has discarded the tutorial system inherent in both the English and the ancient Hindu system. What is now termed "tutorial" in some institutions is mere token of the principle ...

Any system that is "impersonal," rather than "personal" tends to become mechanized. Few human beings enjoy being united in a sea of anonymity....It is difficult to move from the intimate warmth of the family to a large and cold institution....[Cormach Margarett : She Who Rides a Peacock, P 194].

তাঁরা তার আচরণে বিশৃঙ্খলা-বিক্ষোভের প্রকাশ দেখে নিজেরাও রুষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। উপদেশামৃত বর্ষণে ফল না-পেয়ে তাঁরা হয়ত জোর করে ডিসিপ্লিন আনতে চেষ্টা করেন। ছাত্রের জেদ ও রোষ বাড়তে থাকে। তারপর একদিন ঘটে ট্রায়াল অফ স্ট্রেংথ। পিতা-মাতা-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ সমস্বরে যুগ-প্রবণতা ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর প্রতি দোষারোপ করতে থাকেন; সন্তানরা ছাত্ররা আরো জোর গলায় সবকিছু ভেঙে-চুরে 'জমানা' বদলে দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। শেষপর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর বিশৃঙ্খল আচরণ ও শক্তিমত্ততার কাছে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেন। ছাত্র-তরুণ শক্তিমদে আরো মত্ত হয়ে ওঠে এবং জমানা বদলাবার একটি মাত্র পন্থার উপর তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পায়।[১৪] তাদের কাছে বন্দুকের নল এখন একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার, ট্রাংকুইলাইজার হয়ে উঠেছে। মার্গারেট করম্যাক অন্যান্য সমীক্ষকদের মতো ট্রানজিশনাল বা পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের কথা তুলেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্কটকে ঐতিহ্যিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সমস্যা বলে শুধু মনে করেছেন।[১৫] যৌথ পরিবারের মধ্যে যে-নিরাপত্তাবোধ ও উষ্ণতার অস্তিত্ব ছিল, তার অভাবে আজকের ছাত্র-মানস বিশেষভাবে পীড়িত। তাদের পারিবারিক আনুগত্য ভেঙে গেছে, আবার গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে বিকশিত হবার অবকাশ পায়নি। তাই তারা দোদুল্যমান, অস্থির, অশান্ত। আনুগত্য ও বিদ্রোহের সংঘাতে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত। দায়িত্ববোধ, দায়িত্বপালন, ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা, সববিষয়েই তারা, পিতৃ-পিতৃব্য-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার দরুন, অনভিজ্ঞ রয়ে গেছে। জ্যেষ্ঠরা তাদের বিশ্বাস করেন নি, করছেন না;

---

১৪ It seems clear that the current older generation is not helping youth in their problems of entering a new age. In fact the older generation is baffled by youth and as their voices grow shriller, the eruptions of indiscipline become more serious. (Ibid P 211).

১৫ The psychology of youth should be considered in any analysis of changes from traditional to modern life (Ibid)

কাজেই তারাও জ্যেষ্ঠদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।[১৬] এই প্রসঙ্গে সমীক্ষক "ঈদিপাস কমপ্লেক্সের" কথা টেনে এনে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে তুলেছেন। সমাজবাস্তবের কথা ভুলে গিয়ে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তর্জাত জৈব-প্রবৃত্তির প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। ষোল থেকে উনিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের কিশোর আপনা থেকেই নাকি পিতৃবিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[১৭] কিশোরের অপরিণত মন এই বয়সে পরিণত হয়, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়। ভারতীয় কিশোর আগেকার চেয়ে অনেক অল্পবয়সে মানস-পরিণতি লাভ করে—এই পর্যবেক্ষিত তথ্যকে তিনি 'ঈদিপাস' ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সঙ্কট-কালীন বিশেষ অবস্থার জন্যই যে কিশোর বাস্তবমুখীন হয়ে উঠেছে, এই সহজ সত্যটি তিনি ধরতে পারেননি। কারণ পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অপরিণত ও অস্পষ্ট ধারণা। ঐতিহ্যিক থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সকংটের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, শুধু এইভাবে দেখলে ভারতীয় ছাত্রের মানসিকতা ও ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। আরো বহুতর সমস্যাজর্জরিত সামাজিক উদ্দীপক ব্যক্তিমানসকে প্রভাবিত করছে। সরকারী পরিকল্পনার বহুসাংশিক ব্যর্থতা, তদ্দরুন বেকারী, ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা, অন্যান্য আর্থিক সমস্যা, উন্নয়নের সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা—যথা তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ-ভীতি, যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ায় আগ্রাসন-নীতি, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট শিবিরে বিভেদ-বিরোধ ইত্যাদি নানারকম সমস্যাভারে ছাত্র-মানস পীড়িত ও ক্ষুব্ধ।

---

১৬ Modes of obedience and loyalty to superiors, functional to a vertical hierarchical society, are not acceptable to those moving into a competitive and more horizontal society. But modes of "responsibility" and "trust" necessary to the latter type of society, are as yet neither operative nor understood (Ibid P 210).

১৭ ... Some small pieces of research in India indicate the Oedipus Complex in boys at the age of 12 or 13, the adolescent "declaration of independence" or "anti-authority" period at 16-19. These periods are both manifestations of early concept of self. (Ibid P 206).

অভীপ্সা ও অভীষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়েছে, সেই ব্যবধানকে ছাত্র-তরুণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। আজ মানুষ চাঁদের পিঠে পদার্পণ করেছে, কাজেই বিষম সমাজব্যবস্থার দরুন বিড়ম্বিত প্রত্যাশার বেদনায় সে অধীর হয়ে উঠেছে। এ-পরাজয় সে সহ্য করবে না। তরুণমানস জেটপ্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, আর পার্টি, প্রতিষ্ঠান, সরকার শম্বুকগতি-পরিকল্পনার পাণ্ডুর আলেখ্য তার সামনে তুলে ধরছে। আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, স্থবিরত্ব, দীর্ঘসূত্রতা এবং সর্বোপরি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সে জ্যেষ্ঠদের অভিযুক্ত করতে চাইছে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ছে। তার রোষ অনেকস্থলে হয়ত যুক্তিহীন কিন্তু তরুণমানসে যুক্তির থেকে আবেগের প্রভাব অনেক বেশি, এ-কথা ভুললে চলবে না।

ইয়োরোপ-আমেরিকা দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের সম্মুখীন। বিপ্লবোত্তর ভারতও সেই শিল্পবিপ্লবের শরিক হতে পারে। প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত পৃথিবীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, শিল্পবিপ্লব ঘটতে দিচ্ছে না। এই শিল্পবিপ্লব দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেবে, প্রাচুর্যের পৃথিবী নিয়ে আসবে। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাসী আলিঙ্গন থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নতুন সভ্যতার ভিৎ পত্তন করা যায়—এইসব নানা সমস্যায় আজকের ছাত্রমানস ভারাক্রান্ত। এইসব মিলে আজকের সঙ্কট। এই সঙ্কটে ছাত্র-তরুণ দিশেহারা। কে দেবে সেই সোনার কাঠির বা পরশপাথরের সন্ধান, যার ছোঁয়া লেগে সব সোনা হয়ে যাবে? কে দেবে সব থেকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথের নিশানা? কার কাছে আছে সেই চাবি, যা দিয়ে নতুন সভ্যতার, নতুন সমাজের সিংহ-দরজা একবার চেষ্টা করতেই খুলে যাবে? ছাত্র-মানস এই সব চিন্তাতে অস্থির, কম্পমান। কিশোরমনে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা। তাই তাকে প্রলুব্ধ করা সোজা, তাকে বিভ্রান্ত করা কঠিন নয়।

১৪

মার্কুস, ফ্রয়েড ও বিপ্লব

'হার্বার্ট মার্কুস' নামটি আমেরিকার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও নয়াবামদের একাংশের কাছে মার্কস, লেনিন, মাও, গুয়েভারার মতই বিপ্লবের প্রতীক এবং আধুনিকতার প্রতিশব্দ। পঞ্চাশের দশকে এরিক ফ্রম মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদের সংমিশ্রণের মধ্যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ খুঁজেছিলেন। তাঁর লেখার সঙ্গে মার্কসবাদীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনেক তরুণকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সমাজ-পরিবর্তনের চেয়ে মানসিকতার পরিবর্তনের উপর তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং ব্যক্তিমনের পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন বলে তরুণ-মনের উপর তাঁর প্রভাব স্থায়ী হতে পারেনি। হার্বার্ট মার্কুস এরিক ফ্রমের একজন প্রাক্তন সহকর্মী। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে এঁরা আরো কয়েকজনের সঙ্গে একযোগে ব্রতী হয়েছিলেন। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন পুঁজিবাদের সঙ্কট ছিল এঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু। পুঁজিবাদের সঙ্কটকে এঁরা মানবজাতির সঙ্কট বলে মনে করছেন এবং অনুরূপ প্রচারও চালাচ্ছেন। ব্যক্তিসত্তার অসহায়ত্ব ও ব্যক্তিমানসের বিচ্ছিন্নতার প্রকোপে এঁরা বিচলিত। পুঁজিবাদের নিষ্করুণ পেষণে ব্যক্তির অন্তিম হাহাকার এঁরা শুনছেন। বুঝেছেন যে, মানুষ সমাজের উপর, নিজের ভাগ্যের উপর

নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে উৎপাদক-শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় মানুষের নতুন ভাবমূর্তি গড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল। নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, এবং ফ্রয়েডীয় মনসমীক্ষার দ্বারস্থ হলেন এঁরা সঙ্কটের কারণ ও নিরসনের পন্থা সন্ধানে। সমাজে নয়, ব্যক্তিমানসিকতার গভীরে নিহিত আছে সঙ্কটের মৌল কারণ, সমস্যার সমাধানসূত্র;—এই রকম সিদ্ধান্তেই তাঁরা উপনীত হলেন। অবশ্য অর্থনীতি, রাজনীতিকে তাঁরা পুরোপুরি অবহেলা করেছেন, একথা বলা চলে না। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, পণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতা, প্রাচুর্যের সমাজ, ইত্যাদি নিয়েও তাঁরা গবেষণা করে যচ্ছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ফ্রাঙ্কফোর্ট স্কুলের সব থেকে বেশি পরিচিত ও আমেরিকান ছাত্র-তরুণদের বিপ্লবের আদর্শ তাত্ত্বিক হার্বার্ট মার্কুসের তত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করবার চেষ্টা করছি। এদিকটি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অবদমনভিত্তিক ও যৌনতা সম্পর্কিত। কাম-অবদমনের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক বিশ্লেষণের পূর্বে মার্কুস-পরিচিতির একটি সরল রূপরেখা পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই। 'ইরোস এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন' সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করা, এর ফলে খানিকটা সহজ হতে পারে।

হার্বার্ট মার্কুস জাতিতে জার্মান, দর্শনের ছাত্র। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর তিনি আমেরিকায় আসেন। নাৎসী দর্শনের তীব্র সমালোচনা করার ফলেই তিনি জার্মানী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমরদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ্যাকাডেমিক সার্কেলের বাইরে তাঁকে কেউই চিনত না। এখন নয়াবাম দর্শন ও ছাত্র-বিদ্রোহের প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থের নাম, 'ওয়ান্ ডাইমেন্শনাল ম্যান'।

প্রথমদিকের লেখায় (১৯৩৭-৩৮) মার্কুস নয়া-হেগেলিয়ান ধারণা দ্বারা অনেকাংশে অনুপ্রাণিত। অবশ্য সমালোচকদের মতে সাম্রাজ্যবাদী নয়া-হেগেলিয়ানদের সঙ্গে মার্কুসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও যথেষ্ট। মার্কসবাদকে তিনি হেগেলীয় দর্শনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত রূপে দেখতে চেয়েছেন। মার্কসবাদের অন্যান্য উৎস মার্কুস কর্তৃক অবহেলিত। এঙ্গেলস ও লেনিন মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেন নি, তাঁর মতে মার্কসবাদ-বহির্ভূত উপাদান প্রয়োগে বর্ধিত করেছেন মাত্র। মার্কসীয় অর্থনীতির পণ্যের পরিবেশন পরিক্রমণ তিনি

গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যকে অবহেলা করেছেন। মার্কসকে প্রথম দিকে মার্কুস 'হেগেলাইজ' করেছেন, পরে ফ্রয়েডবাদ দিয়ে শোধন করেছেন। মার্কুসের মতে হেগেলের মধ্যেই দর্শনশাস্ত্রের তুঙ্গীভবন, মার্কস দর্শনের সীমানা অতিক্রম করে সমাজবাস্তবের পরিবর্তনের সূত্র অবিষ্কার করেছেন মাত্র।

মার্কসীয় ডায়েলেকৃটিক হেগেলকে ছাড়িয়ে পুরোপুরি বস্তুবাদী হতে পারেনি, মার্কস বাস্তবকে এবং বিপ্লবকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারেন নি। কাজেই সমস্ত বিপ্লব-প্রচেষ্টা এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিমানসে বশ্যতা স্বীকারের ও অত্যাচারিত হবার যে-প্রবণতা আছে, সেই প্রবণতাকে দূর করা হয়নি বলেই বিপ্লবের মধ্যেই তার 'নেগেশন' থেকে গেছে। পুরণোর সবকিছুর সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক রহিত হবার ইচ্ছা মার্কস-এর ছিল না ; তাই বিপ্লব প্রতিবিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে ; নতুন ধরনের শোষণব্যবস্থা সমাজে জন্ম নিয়েছে। উৎপাদন-যন্ত্রকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কৃৎকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা, শ্রমের শ্রেণীবিভাগ, রাষ্ট্র ; ইত্যাদিকে অটুট রেখে প্রকৃত বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। অতীতের সঙ্গে সমস্ত সংযোগসূত্র ছিঁড়তে না-পারলে মুক্তির আশা বৃথা। মার্কুস মনে করেন না শ্রমিকশ্রেণী এই ভাঙার কাজ, পুরণোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কাজ কোনোদিন সমাধা করতে পারবে। তারা পুরণো উৎপাদন-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রত্যঙ্গ। শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কফোর্টের এই দার্শনিকের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এদের তিনি চেনেন না, জানেন না ; কাজেই বিপ্লবের নাটকে এদের কোনো ভূমিকাও দিতে চান না। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, মার্কুসের ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা অকৃত্রিম, সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজ সম্বন্ধে তাঁর এবং ফ্রমের তীক্ষ্ণ সমালোচনা অনেক বুদ্ধিজীবীকে ও ছাত্র-সমাজের এক অংশকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করেছে। ফলে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হচ্ছে। একথাও ঠিক যে, ব্যক্তিমন সম্পর্কে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা এমন অনেক নতুন কথা বলেছেন, যা-এতদিন মার্কসবাদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আবার অন্যদিকে মার্কুস ও তাঁর সহকর্মীদের বিরূপ মনোভাবের দরুন সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে মার্কুসের

বিপ্লব-দর্শন বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেছে। পুরণোদিনের নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, ফলে অনেক স্থলে বিপ্লবের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

মার্কুস মুক্তি ও আনন্দকে এক করে দেখেছেন। মার্কস মুক্ত মানবীয় সমাজ ব্যক্তির সুপ্ত সকল গুণ ও সম্ভাবনা বিকাশের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র মনে করেছেন। আনন্দবাদকে মার্কস প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে মনে হয় না। স্বাধীনতা ও সুখ সমার্থবাচক বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন না। কিন্তু মার্কুস বলেন,—"Mankind becomes free only when the material perpetuation of life is a function of the abilities and happiness of associated individuals."

সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে, ঈপ্সা ও ঈপ্সিতলাভের মধ্যে চিরদিনই ব্যবধান থাকবে। মানুষের আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তি ও নির্বাণলাভ মার্কসীয় দর্শনের বিবেচ্য নয়। মানুষ এগিয়ে চলবে, সমাজকে পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো সুষম করে গড়ে তুলতে চিরদিন দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবে। চিরদিন মানুষ আত্মত্যাগ করবে, ব্যর্থতা অতৃপ্তিকে আমল দেবে না; সোশ্যালিজ্‌ম থেকে কম্যুনিজ্‌ম-এর পথে এগিয়ে যাবার পথ কম কণ্টকাকীর্ণ হবে—মনে করা ভুল। মানুষ অজ্ঞতার দরুন অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে, স্থূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই সুখী হতে পারে। মার্কুসের আনন্দ-বাদের সঙ্গে মার্কসের সুপ্তসম্ভাবনা-বিকাশের কোনো সম্বন্ধ নেই। শোষণহীন সমাজতন্ত্রী সমাজ আনন্দলাভের জন্য নয়, সত্তার উৎকর্ষতার জন্য, আত্মিক উন্নয়নের জন্য, দুর্লভকে লাভ করার জন্য। একজন শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আকুতি ও বেদনা সাম্যবাদী সমাজেও অব্যাহত থাকবে। মার্কুসের আনন্দবাদ কোনো মার্কসবাদীরই কাম্য নয়।

মার্কুসের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অস্বীকার। মার্কসের মতে, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের অর্থ, প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি (from the realm of necessity to the realm of freedom), মার্কুসও তাই মনে করেন। কিন্তু এই উত্তরণের পদ্ধতি যে নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম-প্রভাবিত, মার্কসের এই বক্তব্য তিনি মানতে রাজী নন। তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজ নিয়মশৃঙ্খলিত কিন্তু সমাজবাদী ব্যবস্থা, যেহেতু মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা; সেখানে তাই কোন নিয়মশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। অন্তত থাকা

উচিত নয়। যদি কোনো ঘটনা বা কার্যের পিছনে কারণ থাকে, যদি কোনো ঘটনা নির্দিষ্ট কারণ-নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সেই ঘটনা বা কাজের আর স্বাধীনতা কোথায়? বাধ্যকারী নিউরোসিসে আক্রান্ত মানুষের কাজকে আমরা অস্বেচ্ছিক বলি, চিন্তা বা কাজ যখন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অতীত, তখনই মাত্র সেই ব্যক্তি বা সেই কাজটি স্বাধীন নয়। কিন্তু মার্কুসের মতে কেবলমাত্র স্বয়ম্ভূত বা স্বতঃস্ফূর্ত কাজই স্বাধীন।

মার্কুস ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অস্বীকার করেন। অবিচ্ছিন্নতাকে ব্যঙ্গ করেন। তাঁর বিপ্লবোত্তর ইউটোপিয়া অতীতের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, সেই সমাজের রূপও অস্পষ্ট। অতীতের সংযোগসেতুগুলো সবই বিচূর্ণ, অতীতকে জানবার প্রয়োজন নেই, অনাগত ভবিষ্যৎও সম্পূর্ণ অজানা। সর্বগ্রাসী টোটালিটেরিয়ানিজম্ অথবা চরম ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বৈরাচার—কে বলতে পারে? আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙার জন্য সংগ্রাম করতেই হবে; কিন্তু সংগ্রামের পরিণতি অনিশ্চিত। অতীত থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে কোনো শিক্ষার প্রয়োজন নেই, শুধু সংগ্রাম ও উল্লম্ফন। সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন নেই, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দরকার নেই; মাত্রাগত পরিবর্তন নয়, একলম্ফে গুণগত পরিবর্তন। এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে হবেই, কিন্তু সমাজতন্ত্রের গ্রহে নয়। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে। অতীত নয় পুঁজিবাদ নয়, সমাজবাদ নয়, সাম্যবাদ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। চরৈবতি, চরৈবতি, চরৈবতি। আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে এগিয়ে চল। এই হল মার্কুসের কথা। এতে মোহমাদকতা যথেষ্ট, রোমান্টিক ভাববিলাসের উপকরণ প্রচুর। অনভিজ্ঞ তরুণমনের কাছে মার্কুসের বিপ্লবদর্শনের আকর্ষণ প্রগাঢ় ও দুর্নিবার। ইউরোপের এক বিশেষ অবস্থায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাকুনিনের বাণীও এইরকম আদৃত হয়েছিল; আজ আর এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে মার্কুস আমেরিকাতে সেইভাবেই সমাদৃত।

এইবার নেতিবাদী বিপ্লব-দর্শনের যৌন-মনস্তাত্ত্বিক দিকটির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে। ফ্রয়েডবাদ দিয়ে মার্কসবাদের সংশোধন-প্রচেষ্টা মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক।

ফ্রয়েডের অবদমন ও উদ্‌গতিতত্ত্ব পাঠকদের কাছে হয়তো অজানা নয়, তবুও সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে।

আদিম যাযাবরগোষ্ঠীর পিতা নিজ গোষ্ঠীর সব নারীকে উপভোগের একমাত্র অধিকারী। পুত্রদের উপরও তার একাধিপত্য, তারা নারীদেহভোগে বঞ্চিত। বিদ্রোহী পুত্রেরা দলবদ্ধ হয়ে পিতাকে হত্যা করে উদরসাৎ করে। পিতৃহত্যার ফলে তাদের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। এই অপরাধতাড়িত হয়ে তারা দলবদ্ধ হল এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অজাচার (incest) নিষিদ্ধ করে 'ট্যাবু'র প্রচলন করে আদিম সমাজের ভিৎ পত্তন করল। আদিম পিতার একাধিপত্যের আসন নিয়ে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করবে না বলে চুক্তিবদ্ধ হল। ভোগ-প্রবৃত্তিকে স্বেচ্ছায় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করল। এইভাবে "Thus there came into being the first form of a social organisation accompanied by a renunciation of instinctual gratification ; recognition of mutual obligations, institutions declared sacred, which could not be broken—in short, the beginnings of morality and law." (S. Freud, Moses & Monotheism, New-York, 1949. p. 129)। বলাবাহুল্য, সভ্যতা স্থাপনের এই ইতিহাস পরবর্তীকালের জাতিতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিকরা সমর্থন করেন নি। রবার্টসন স্মিথের এই তথ্যের অসত্যতা সম্পর্কে ফ্রয়েড সজাগ থেকেও এটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কেন? "I have often been vehemently reproached for not changing my opinions in the later educations of my book (Totem & Taboo), since more recent ethnologists have without exception discarded Robertson Smith's theories and have in part replaced them by others which differ extensively." (S. Freud, Totem & Taboo, 1939, PP 251-58). একথা বলার পরও স্মিথের এই ইতিকথা তিনি বর্জন করেন নি। কারণ, এই ইতিকথা দিয়ে তাঁর লিবিডোতত্ত্ব ব্যাখ্যার সুবিধা হয়েছে। মার্কুসও ফ্রয়েডের এই সভ্যতার গোড়াপত্তনের ইতিবৃত্ত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছেন। জাতিবিজ্ঞান-অসমর্থিত এই কাহিনীটির মধ্যে অসংলগ্নতাও প্রচুর। "Yet Freud's account Is in fact internally incoherent and self-contradictory. As in Hobbe's account of the social contract what has to be

explained is how the transition can have been made from a condition in which the relations between men are purely those of force, in which each seeks to impose his own will on others, to a condition in which there are socially established norms and institutions which regulate human behaviour in an impersonal fashion." (Alasdir Mc Intyre)। পিতৃহত্যার জন্য অপরাধবোধ জন্মাবার কারণ কি? তথাকথিত "প্রাইমাল হোর্ডের" জীবনযাত্রাপ্রণালীর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনোরকম চুক্তি বা বাধানিষেধ ছিল, যার ফলে অপরাধবোধের সৃষ্টি। তা ছাড়া, "A contract cannot be made except when the institution of promising and norms regarding the promise keeping are established. Thus the allegedly primal state is not pre-institutional, pre-legal or pre-moral at all."

এই কাহিনীকে আশ্রয় করে ফ্রয়েড অবদমন ও উদ্‌গমন (Repression and Sublimation) তত্ত্ব গড়ে তুললেন। প্রবৃত্তি, বিশেষ করে যৌনপ্রবৃত্তি নিরোধ করার ফলে সমাজ-সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটল এবং উদ্‌গমনের ফলে উচ্চতর সংস্কৃতির বিকাশ হল। একদিকে 'সুপার ইগোর' (internalised parental authority—আন্তরীকৃত পিতৃকর্তৃত্ব) অনুশাসন, অন্যদিকে 'ইদ'-এর আত্মপ্রকাশের চেষ্টা; এই দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে 'ইগো'। এইভাবে 'ইগোর' অখণ্ডতা রক্ষিত হয়। প্রবৃত্তিপরিতৃপ্তির আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা বহির্বাস্তবের চাপে নিয়ন্ত্রিত ও অবদমিত করতে হয়, সংযত করতে হয়। সভ্যতার ইতিহাসও আদিম প্রবৃত্তির অবদমনের ইতিহাস, আত্মকৃচ্ছ্রতার ইতিহাস। সামাজিক উন্নয়নশক্তির আধার সুপার ইগো। সুপার ইগো আদিম সমাজের পিতৃপুরুষের ধর্মীয়-নৈতিক-সামাজিক বিধিনিষেধেরও আদিম সমাজের ট্যাবুর রূপান্তর। বর্তমান যুগের মানুষ নির্জ্ঞানে অজাচারস্পৃহা আর অজাচারের বিরোধী-ট্যাবু নিয়ে জন্মায়। সর্বযুগের সভ্যতার মধ্যেই এই রিপুর নির্গমন আর অবদমনের ইতিহাস। ফ্রয়েড-প্রভাবিত মার্কুসের এই অভিমত। এ-ছাড়া, ফ্রয়েডের 'hedonism' বা আনন্দবাদকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

মার্কসকে সংস্কৃত ও শোধিত করার জন্য ফ্রয়েডের আশ্রয় নিলেন কেন মার্কুস?

কারণ, তাঁর মতে পুঁজিবাদী সমাজের ভেঙে পড়ার কারণগুলোর নির্দেশ অত্যন্ত সঠিকভাবেই মার্কস দিতে পেরেছেন, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় বিপ্লবী মনোভাবের সঞ্চার কেন ও কিভাবে ঘটবে, তার যথাযথ কারণ তিনি দেখাতে পারেন নি। আগেই বলেছি, এঙ্গেলস ও লেনিনের বক্তব্য মার্কসবাদসম্মত বলে মনে করেন না মার্কুস। মার্কসীয় বিপ্লবদর্শনের এই দৈন্য দূর করতেই মার্কুস ফ্রয়েডের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং ফ্রয়েডবাদকেও নিজের মনোমত রদবদল করে নিয়েছেন।

মার্কস মানবগোষ্ঠী ও মানবসাধারণ নিয়েই কথা বলেছেন, ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে তিনি উদাসীন ও নীরব। ব্যক্তিমানুষ আনন্দ ও তৃপ্তির সন্ধানী, এই তত্ত্বটিও মার্কস অনুধাবন করতে পারেন নি। মার্কসের লেখায় কোনো বিপ্লবী সোশ্যাল সাইকলজির সন্ধান মেলে না, মার্কসবাদীরা ব্যক্তিমানস নিয়ে আলোচনা করেন না। মার্কসের অনুগামীরা মনে করেছেন, যেসব আর্থনীতিক কারণে পুঁজিবাদের পতন ঘটবে, সেইসব কারণেই বিপ্লবী মনোভাব 'অটোমেটিক রিফ্লেক্স'-এর মত গড়ে উঠবে। এই ধারণা অত্যন্ত স্থূল ও যান্ত্রিক। ব্যক্তিচেতনা ও বিপ্লব সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। পুঁজিবাদের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮৪৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের ধারাকে সঠিকভাবে বুঝেছেন ও চিত্রিত করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাসের ধারা তাঁর কল্পনা বা ভবিষ্যদ্বাণীকে অনুসরণ করে চলে নি। ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়নি। বরং নীরব অসহায় দর্শক হয়ে তারা ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব অবলোকন করেছে, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের কাছে ক্লীবের মত আত্মসমর্পণ করেছে।

এই থেকে এরিক ফ্রম ও হার্বার্ট মার্কুস পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালক বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, মার্কসবাদের সংকীর্ণতাও তাঁদের কাছে উদ্‌ঘাটিত।

এঁদের ধারণা—শাসক ও মালিকশ্রেণীর পীড়ন, শোষণ, নিয়ন্ত্রণই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির একমাত্র অন্তরায়-প্রতিবন্ধক নয়। তাদের চেতনার স্তরে, তাদের মানসিকতার বিকারের মধ্যেই রয়েছে তাদের মুক্তির বাধাদানকারী শক্তি। এই বিরোধী শক্তিকে সনাক্তকরণের প্রচেষ্টায় তাঁরা ফ্রয়েডের দ্বারস্থ হলেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের বিপ্লবী ভিয়েনার সংরক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর শরণাপন্ন হলেন। "It has been conjectured that Freud, while a youngman at

Paris acquired the fear of the politics of the masses which he afterwards exhibited. Certainly a contrast between civilisation on the one hand and the masses on the other was part of the ideology of French conservatism, nourished as it was on fear of the Revolution and more of the Commune, which reappears in Freud's writings. (McIntyre)। বিপ্লব ও জনতাকে যিনি সভ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন, তাঁর তত্ত্ব দিয়ে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করলেন। ক্রম বাধ্যকারী প্রবণতার মধ্যে বিরোধী শক্তির সন্ধান পেলেন, আর মার্কুস মানুষের একমাত্রিক বিকারের মধ্যে তার চেতনা ও যুক্তির দৈন্য দেখতে পেলেন।

যৌন অবদমন ও কামনার সংকোচন থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কারুশিল্প, চারুশিল্প, সাহিত্য সবই সৃষ্ট হয়েছে কামপ্রবৃত্তিকে বঞ্চিত করে। এমনকি অদক্ষ কায়িক পরিশ্রমও আত্মকৃচ্ছ্রতার ফলশ্রুতি। সর্বত্রই আত্মদমনের ইতিহাস। এর ফলে যন্ত্রযুগের মানুষের চিন্তাধারা বিকৃত। সাধারণ মানুষ শুধু একমাত্রিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত, কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক বর্তমান আমাদের মানসপটে প্রতিফলিত। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, বিপ্লবের দর্শন ও চৈতন্যের উন্নয়ন ; কোন কিছুরই সঠিক ধারণা একমাত্রিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। "The advancing one-dimensional society alters the relation between the rational and the irrational. Contrasted with the fantastic and insane aspects of its rationality, the realm of the irrational becomes the home of the really rational....(H. Marcuse)। বিপ্লবীদের মনেও একমাত্রিক চিন্তার প্রবণতা। সাধারণ মানুষের মত তাদেরও প্রবৃত্তি-বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন সাধিত না-হলে সব বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ; বিপ্লব সম্পন্ন হলেও প্রতিবিপ্লবের রূপ নেবে।

ফ্রয়েডের সমাজতত্ত্ব যৌনতা ও সভ্যতার বৈপরীত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কুসতত্ত্ব এই বৈপরীত্যের তত্ত্বকে স্বীকার করে না। ফ্রয়েড মনে করেন যে, মুক্তি এবং সুখ পরস্পরের বিরোধী, মার্কুস মনে করেন যে, মুক্তি এবং সুখ সমার্থবাচক এবং একাভিমুখী।

মুক্তি বলতে ফ্রয়েড মনে করেন, প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্তি, আর সভ্যতা মানে যৌনতার উদ্‌গতি (sublimation)।

মার্কুস এই অভিমতকে সরাসরি অগ্রাহ্য না-করে বলেন যে,—মুক্তি ও আত্মতৃপ্তি এবং যৌনতা ও সভ্যতার মধ্যে ফ্রয়েড যে-বৈপরীত্য দেখেছেন, সেটা মানবপ্রজাতির প্রকৃতিগত নয়, বিশেষ সমাজব্যবস্থাজাত।

হ্যাঁ, সভ্যতার প্রথমপর্বে যৌনতার প্রাথমিক অবদমনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কঠোর তপশ্চর্যা ছাড়া প্রথমপর্বের অভাব মেটানোর আর কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু পণ্যের বণ্টনপ্রণালী ও কর্মসংগঠনের বিশেষ প্রণালী সবসময়ে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে, অর্থাৎ এই প্রণালী অব্যাহত রাখার চেষ্টায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দমন অভ্যাস করতে হয়েছে। আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আজ এই ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্যের ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দিনে দমন ও কৃচ্ছ্রসাধন শুধু বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থা ও বিশেষ শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজন। মার্কুসের ভাষায় অতিরিক্ত দমন-পীড়ন (Surplus Supperssion) অপরিহার্য নয়, বিশেষ ধরনের সমাজসভ্যতাও অপরিবর্তনীয় নয়।

ফ্রয়েডের বাস্তবভিত্তিক নিয়মকে (Reality Principle) সংশোধন করেছেন মার্কুস সুসম্পাদন-নিয়ম (Performance Principle) ভিত্তিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। সুখানুভূতিকে (Pleasure) বিসর্জন দেওয়া হয় বাস্তবের নির্দেশে নয়, সমাজপ্রধানদের নির্দেশে। প্রভুত্বপ্রয়াসী শাসকশ্রেণী বাস্তবনিয়ম বলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রণালীকে বিধিবদ্ধ করেছে, আর মানুষ নির্বিচারে সেই নিয়ম-নিগড়ের অনুগত হয়ে চলে আসছে।

যৌনতার অবদমন ও বিধিবদ্ধ প্রণালীতে কৃচ্ছ্রসাধন আজকের সমাজে শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অশুভ ও প্রগতির প্রতিবন্ধক, বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিপন্থী। দাসমনোভাবের পরিচায়ক। মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত যৌনতার মুক্তি ও অবাধ তৃপ্তির পথ অনুসরণ।

ট্রটস্কীর মতো দু'একজন ছাড়া প্রায় সব মার্কসবাদীই ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্বকে অসার, অবাস্তব ও মার্কসবাদ অননুমোদিত বলে মনে করেছেন। শুধু মনে করা নয়, পাভলভের শর্তাধীন রিফ্লেক্স ও লেনিনের প্রতিফলনতত্ত্বের ভিত্তিতে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। আজকের দিনে ফ্রয়েডকে পুনরুজ্জীবিত

করার উদ্দেশ্য কি? সত্যিকারের ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টা, না বিপ্লবকে প্রবৃত্তিবাদের পঙ্কিল পথে পরিচালিত করার অপচেষ্টা?

ফ্রয়েডীয়তত্ত্বের দূরকল্পনাভিত্তিক সবকিছুই মার্কুস মেনে নিয়েছেন। 'মৃত্যুরতিবাদ'কে সমালোচনা করেন নি। 'লিবিডোতত্ত্ব' যে অংশত ত্রুটিপূর্ণ, অবশ্য সেরকম আভাস দিয়েছেন। তবুও বলা চলে, অসামাজিক ধ্বংসাত্মক দিকটিকে সংস্কারের নামে, আরো হৃদয়গ্রাহী করে চিত্রিত করে আধুনিক আমেরিকার তরুণমনকে বিভ্রান্ত করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, শিশুবয়সে যৌনতা সারাদেহে ছড়িয়ে থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়; যৌবনে সুস্থ ব্যক্তি প্রধানত লিঙ্গভিত্তিক কামানুভূতির অধিকারী। ফলে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, প্রেম, বিবাহ, সন্তানউৎপাদন। সন্তান পালনের জন্য পরিবারগঠন ও পারিবারিক শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন। এই বক্তব্য যদিও মার্কসবাদীদের মতে সঠিক নয়, তবুও নর-নারীর প্রেম, মাতৃস্নেহ, ইত্যাদি অনেক মানবীয় গুণের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এই বক্তব্যের মধ্যে। অতিদমনের ফলে লিঙ্গভিত্তিক যৌনতার উদ্রেক ও একগামিতার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাই মার্কুস একগামিতাকে অযৌক্তিক এবং দাম্পত্য ও পরিবারভিত্তিক জীবনকে অসংগত মনে করেছেন। সন্তানপালনে মাতা-পিতা ও পরিবারের ভূমিকাও মনে হয়, তাঁর মতে অবৈপ্লবিক মনোবৃত্তি। সারাদেহে পরিব্যাপ্ত যৌনতার আস্বাদন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে—এ-ধারণা হাস্যকর মনে করে উড়িয়ে দিলে, (যা, ম্যাকইনটয়োর করেছেন) এর ক্ষতিকর দিকটির প্রতি যথেষ্ট নজর পড়বে না। পুঁজিবাদী সমাজের প্রথম পর্বে পুরুষপ্রাধান্য সত্ত্বেও সুস্থ দাম্পত্যজীবনের যে-সূচনা দেখা দিয়েছিল, সমাজবাদী ব্যবস্থায় যে-দাম্পত্যজীবন নরনারীর সমান অধিকারের ফলে আরো সুন্দর আরো সুসংহত হয়েছে, মার্কুস সেই একবিবাহভিত্তিক দাম্পত্যজীবনকে আক্রমণ করে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে আবাহন করতে চেয়েছেন, বিপ্লবকে নয়। পুঁজির রাজ্যে অনেকক্ষেত্রে প্রেম ভালবাসা পণ্যের সামিল, নারীদেহ অর্থভোগ্য, দাম্পত্য-জীবন অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এখনও সেখানে পারিবারিক আবহাওয়া পুরোপুরি বিষাক্ত নয়। মার্কুস কি তাঁর মুক্তপ্রেমের সঙ্গে কৌশলে বিপ্লবকে যুক্ত করে, অবাধ যৌনমিলনকে বিপ্লবের অঙ্গ হিসেবে প্রচার করে আবহাওয়াকে পুরোপুরি বিষাক্ত করতে চান?

অনেক ফ্রয়েড-শিষ্য 'ডেথ-ইন্‌স্টিংটের' অস্তিত্বে যখন সন্দিহান, তখন মার্কুস মানবমনে মৃত্যুপ্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, মানুষ অনেকসময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুর খেলায় মেতে ওঠে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ধ্বংসাত্মক দিকটির মধ্যে তিনি মানুষের মৃত্যু-ইচ্ছার প্রকাশ দেখেছেন। "Beneath the manifold rational and rationalised motives for war against national and group enemies, the deadly partner of Eros (that is, Thanatos, the death-instinct) becomes manifest in the approval and participation of the victims". (Eros & Civilisation, 1955,p. 55)

থানাটস্‌কে কল্পনা না-করে মার্কুস অনায়াসে বলতে পারতেন যে, আজকের মানুষ একমাত্রিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত, তাই মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করছে। বস্তুত, তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "The tolerance of positive thinking is enforced tolerance—enforced not by any terroristic ageney but by the overwhelming anonymous power of efficiency of the technological society. As such it permeates the general consciousness—and the consciousness of the critic. The absorption of the negative by the positive is validated in the daily experience, which defuscates the distinction between the rational appearance and irrational reality" তবে এই মৃত্যুরতিবাদতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কেন ?

এই প্রসঙ্গে মার্কুস-সমালোচক ম্যাক্‌ইনটায়ার যা-বলেছেন তার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

মানুষ এমন অনেক কথা বলে, এমন অনেক কাজ করে, যার ফলাফল সম্বন্ধে বা যার উৎস সম্বন্ধে সে পুরোপুরি অবহিত নয়। ফ্রয়েড এর ব্যাখ্যা দিতে নির্জ্ঞান মনের কল্পনা করেছেন।

প্রাত্যহিক ভুলভ্রান্তি, ঠাট্টা-পরিহাসের মধ্য দিয়ে জ্ঞানত যা-বলতে বা করতে চাই না, এমন অনেককিছু বলি বা করি যা-আমাদের নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রণোদিত। ফ্রয়েডেও মতে আমাদের অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপই নির্জ্ঞানপ্রেষিত

(unconsciously motivated)। মার্কস কাল্পনিক নির্জ্ঞানের আশ্রয় না-নিয়ে আমাদের সামাজিক সংগঠনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে অস্বেচ্ছিক ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান—সবই মানুষের তৈরী ; কিন্তু তাদের নিজস্ব নিয়মে তারা চলে। এই চলার নিয়ম সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। তারা এই নিয়মকে, এই চলাকে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই তাদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল তারা সম্যক বুঝতে পারে না। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তো নয়ই। পুঁজিবাদ ধ্বংসের পথে চলেছে, পুঁজিবাদীদের ক্রিয়াকলাপই এই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। কিন্তু পুঁজিবাদীরা নিঃসন্দেহে এই ধ্বংস চায় না। অর্থনৈতিক জগতের নিয়ম-কানুন না-জানার ফলে আত্মধ্বংসাত্মক কাজে তারা ব্যাপৃত। যারা জানে বা বোঝে তারাও এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। বুদ্ধিজীবী, পুঁজিজীবীরাও শ্রমজীবীদের মতোই বিচ্ছিন্ন। তবে এই পুঁজিবাদী সমাজকে তারা হয়ত শ্রমজীবীদের মতো আমোঘ অচেনা শক্তি মনে করে না, কেননা তাদের শ্রমমূল্য অপহৃত হয় না। কিন্তু তাদের শ্রম বা কাজও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা আত্মনিয়ন্ত্রিত নয়।

ম্যাক্‌ইনটায়ার ফ্রয়েডের যৌনভিত্তিক নির্জ্ঞানতত্ত্ব ও মার্কসের অর্থনীতি-ভিত্তিক 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বকে তুলনামূলক বিচারে প্রায় এক পর্যায়ে ফেলেছেন। নির্জ্ঞানতত্ত্ব পুরোপুরি অনুমাননির্ভর ; বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের—'অ্যালিয়েনেশন'এর এখন সম্পূর্ণ শারীরবৃত্তভিত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া না-গেলেও এর সামাজিক অর্থনীতিক উৎসগুলিকে অনুমাননির্ভর বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেন আমরা যুদ্ধ করি ? ম্যাক্‌ইনটায়ার এই প্রশ্ন তুলে বলেছেন যে, "... If we could explain the occuarence and destructiveness of modern war by referring to the workings of economic system (as in fact we cannot) we should not need to invoke unconscious destructive instinctual drives to explain the same phenomena.....Perhaps both causal agencies are at work". (McIntyre)

'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্ব দিয়ে যুদ্ধকে, হিংসা, পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতাকে সম্যক বোঝা যায় না বলে, মানুষের গোপন মনে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে ; এই তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে কেন ? যে-সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা

বাস করি, সেখানে হিংসার অধিষ্ঠান সর্বজনবিদিত। আত্মরক্ষার শর্তহীন রিফ্লেক্সকে আশ্রয় করে হিংসা ও অপরকে আঘাত করার মনোবৃত্তি আমাদের মনে শর্তাধীন রিফ্লেক্স হিসেবে গড়ে ওঠে—একথা স্বীকার করতে বাধা কোথায়? যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সবাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। মানুষকে হিংস্র করে তোলবার জন্য নিয়ত প্রচারকার্য চলতে থাকে। সকলেই কতকগুলি দিকে কমবেশি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত সহজেই অভিভাবিত হয়, ভয়ের অবসেশনের ফলে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, 'প্যারানয়েডের' মতো ভ্রান্তিগ্রস্ত (delusional) হয়ে পড়ে। শত্রু সম্পর্কে সত্যমিথ্যা সব কথা নির্বিচারে মেনে নিয়ে থাকে। তার আনুমানিক পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত বা লজ্জিতবোধ করে না। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে আক্রমণকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে। এইভাবে কি হিংসার ও পাশবিকতার ব্যাখ্যা চলে না?

যাইহোক শেষপর্যন্ত, 'ইরোজ এণ্ড সিভিলিজেশন'এর সমালোচনায় ম্যাক্ইনটায়ার মার্কুসকে সমর্থন করেননি। মার্কস-এর 'অ্যালিয়েনেশন'এর সঙ্গে ফ্রয়েডের 'লিবিডো'র গাঁটছড়া বেঁধে মার্কুস যে-নতুন বৈপ্লবিকতত্ত্ব তৈরী করেছেন, সে-সম্বন্ধে ম্যাক্ইনটায়ার এইরকম লিখেছেন,—"It is worth finally noting that in Eros and Civilisation too young Hegelian themes recur. The project of explaining human culture as involving the alienation of man from his sexuality, of his seeing Eros at the heart of human things and alienation in the forms under which Eros is apprehended and encountered is essantially Feurbach's."

লিবিডোকে মুক্ত করে, যৌনতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বিলোপ করে যে-সম্পূর্ণ মানুষ বেরিয়ে আসবে, সে-ই হবে খাঁটি বিপ্লবী, সে-ই আনবে প্রজাতির মুক্তি। শিল্পসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানশাসিত সমাজে যারা আছে, তারা সবাই এসটাবলিশমেণ্টের প্রত্যঙ্গ। মুক্তি তারা আনবে না। এই সমাজের নিজস্ব সংকট-দ্বন্দ্বের উপর মার্কুস ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন সমাজের বাইরের শক্তির উপর। Gunther Busch-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, —"These young people (ছাত্র-তরুণ) no longer share the

repressive need for the blessings and security of domination—is in itself incapable of exercising decisive political pressure. Only in alliance with the forces who are resisting the system from without can such an opposition become a new avant-garde."

আমেরিকার ছাত্র-তরুণরা খাঁটি বিপ্লবী নয়। খাঁটি বিপ্লবীরা আছে অন্যত্র। "One Dimensional Man" এর উপসংহারে তিনি লিখছেন, "The totalitarian tendencies of the one-dimensional society render the traditional ways and means of protest ineffective....

"However underneath the conservative popular base is the substratum of the outcasts and outsiders, the exploited and the persecuted of the other races and other colours, the unemployed and the unemployable. They exist outside the democratic process."

কিন্তু এরা বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কি? এরা কি 'surplus suppression' থেকে মুক্ত? বিপ্লবী চেতনা ছাড়া বিপ্লব হতে পারে কি? এরা জিতলে, বর্বর-রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে, মুক্ত-সমাজের সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা সে-বিষয়ে মার্কুস নিশ্চিন্ত নন।

এই সমাজের উন্নত চেতনার মানুষের সঙ্গে যদি এরা মিলিত হতে পারে, তবেই প্রকৃত বিপ্লব সম্ভব। "But the chance is that, in this period, the historical extremes may meet again : the most advanced consciousness of humanity, and its most exploited force. It is nothing but a chance".

এই 'advanced consciousness of humanity' কারা? এই সমাজে বেশির ভাগই অনুগামী জনসাধারণ। তারা জানে না তাদের কি চাই। খুব অল্প কয়েকজনমাত্র (মার্কুস-এর মত?) বুঝতে পারেন, জনসাধারণের কি চাই এবং তাদের মুক্তি কিসে। এরা তাঁরাই, যাঁরা 'যৌন-বিচ্ছিন্নতা' দূর করে মুক্ত পুরুষ ও খাঁটি বিপ্লবী হয়েছেন। আসলে মার্কুস বিশেষ চেতনাসম্পন্ন

"মাইনরিটির ডিক্টেটরশিপে" বিশ্বাসী। মার্কস চেয়েছিলেন মানুষ নিজের মুক্তি নিজে আনুক, আর মার্কুস মানুষকে মুক্তি 'দান' করতে চান। "The philosophy of the young Hegelians, fragments of Marxism and revised chunks of Freud's metapsychology: out of these materials Marcuse has produced a theory that, like so many of its predecessors, invokes the great names of freedom and reason while betraying its substance at every important point."—এই বলে ম্যাকৃইনটায়ার তাঁর মার্কুস-সমালোচনা শেষ করেছেন।

মার্কুসের এই বিপ্লবতত্ত্ব কি সত্যই মৌলিক ও অভিনব? 'ইরোজ এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। তার আগেই বুর্জোয়া চিন্তানায়করা লজিক পরিহার করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা, 'ঠাণ্ডালড়াই' আমেরিকার কোরিয়া আক্রমণ ইত্যাদি ১৯৫০ থেকেই দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিককে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। মূল্যবোধ-নীতিবোধের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এর আগে যন্ত্রযুগের মানুষের অসহায় করুণ বিচ্ছিন্ন ছবি কাফকার মতো শক্তিশালী সাহিত্যিক চিত্রিত করেছেন ও মানবসত্তার আর্তনাদ ও সমাজের "অ্যাবসার্ডিটি" শিল্পসাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত জীবনের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন অনেক চিন্তাবিদ্। আগেই ইতালী ও জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান শিল্পী-সাহিত্যিককে দোলায়মান করে তুলেছিল। মার্কুস যখন নাৎসীদর্শনের বিরোধিতা করে স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হন, তার এক দশকের মধ্যেই প্যারীর রাস্তায় কামু, সার্ত্র, বেকেট হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যারিকেড তৈরী করে লড়েছিলেন। পরে এঁরা সকলেই প্রায় এই সংগ্রামের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন। কারণ বলবার প্রয়োজন দেখছি না। সার্ত্র অবশ্য ব্যতিক্রম। জীবনকে চিরাচরিত প্রথায় দেখবার প্রবণতা ও সমাজকে পুরণো ঢঙে বদলাবার ইচ্ছার পরিবর্তে 'অ্যাবসার্ড' দৃষ্টিভঙ্গী ও রাগী তরুণদের ব্যক্তিগত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল শিল্পসাহিত্য। বহুগামিতা, সমকামিতার নির্ভীক প্রকাশ দেখা গেল সাহিত্যে। বোহেমিয়াভাবে যেন নতুন করে অনুভাবিত হল স্পর্শাতুর তরুণ-মানস। এই বোহেমিয়াভাবেরই দার্শনিক অভিব্যক্তি ও সংগঠিত প্রচার দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে মার্ক্সের মধ্যে। "What traditional Marxism saw as petty bourgeois bohemia closely allied to the Lumpen-proletariat has become in Marcuse's latest theoretical stance the potential catalyst of change" (McIntyre)। 'বোহেমিয়ার' নতুন সংজ্ঞা 'আউট্‌সাইডার' কথাটি দ্রুত পরিচিতি লাভ করল, এবং আউট্‌সাইডারদের নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গেল। সমাজের বাইরে থেকে সমাজকে দেখা ও ভাঙার কাহিনী রচিত হতে লাগল। বিপ্লব ও যৌনতা নিয়ে নাটক লিখে জঁা জেনে রীতিমত আলোড়ন নিয়ে এলেন বুদ্ধিজীবী-মহলে। যে-বছর "Eros and Civilisation" প্রকাশিত হল, তার এক বছরের মধ্যেই আটলান্টিকের এপার মুখর হয়ে উঠল জঁা জেনের 'দি ব্যালকনি' নাটকের আলোচনায়। এই জঁা জেনের যেটুকু জীবনকথা জানি, তাতে মনে হয় ইনি মার্ক্সের আদর্শ বিপ্লবী হবার দাবী রাখেন। ইনি অকপটে আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছেন যে, "For a time I loved stealing, but prostitution appealed more to my easygoing ways. I was twenty.... Abandoned by my family, I found it natural to aggravate this fact by the love of males, and that love by sterling and stealing, by crime, or complicity with crime. Thus I decisively repudiated a world that had repudiated me." নিষ্করুণ সমাজের বিরুদ্ধে জেনের আক্রোশ স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর আক্রোশের অভিব্যক্তি—তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অস্বাভাবিক। অন্তত মার্কসবাদীদের চোখে। 'দি ব্যালকনি'তে জেঁনে বিপ্লবের যে-ছবি এঁকেছেন, মার্ক্সের' আদর্শ বিপ্লবে'র সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিমাণে মিল আছে। মৃত্যুরতিবাদকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন যে, "sex is essensially a matter of domination and submission." সমাজস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই নিবীর্য। বিপ্লব কামেচ্ছা ও আধিপত্য-ইচ্ছা থেকে সঞ্জাত। বিপ্লবের ফলে সমাজ বদলায় না। বাস্তবকে আয়ত্তে আনা যায় না।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগের বুদ্ধিজীবী ও পেটিবুর্জোয়ার অক্ষম ক্রোধ ও বিচ্ছিন্নতা-বোধ নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রতিককালের শিল্পসাহিত্যদর্শনে। মার্ক্সের মধ্যে সেই সবেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর বক্তব্যে যুগোপযোগীভাবে পারমাণবিক

ও অটোমেশনের যুগের বুর্জোয়া মানুষের চিন্তা, ভয়, ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেন নি মার্কুস, বরং বলা চলে বিকৃত করেছেন।

সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে মার্কসবাদীদের নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। ব্যক্তিমনকে সমষ্টির ভগ্নাংশ মনে করার বা 'সাবজেক্টিভ' বলে এড়িয়ে চলার দিন চলে গেছে। ক্ষতি অনেক হয়েছে। কিন্তু সার্ত্র, ফ্রম এবং মার্কুস তিনজনেই ফ্রয়েডীয় রতিতত্ত্ব দিয়ে ব্যক্তিমনকে বুঝতে গিয়ে, মার্কসবাদকে সময়োপযোগী করতে গিয়ে মার্কসবাদের ক্ষতিসাধনই করেছেন। 'কপ্‌রোফিলিয়া' থেকে মার্কসবাদীরা চিরকালই দূরে থাকবে। ময়লা ও নর্দমা ঘাঁটার রুগ্ন মনোবৃত্তি কোনোদিনই তাদের হবে না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমেরিকার 'র‍্যাডিকাল'দের একাংশ, বিশেষ করে নাট্যামোদীরা তাঁদের রাজনীতির সঙ্গে মার্কুসের এই 'কপ্‌রোফিলিয়া'কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। **'Eros and Civilisation'** তাঁদের গীতা ও বাইবেল হয়ে উঠেছে। তাঁদের ধারণা যে, যৌনতার মত শিল্পও এক আদিম আনন্দের অনুভূতি। **"Art is like sexuality—a priaml pleasure".** "যৌন অবদমন হলেই নাকি শিল্পের অবদমন ঘটবে।" **"The reification and repression of sexuality will go hand in hand with reification of art."** উদ্ধৃতি দুটি আমেরিকার এক বিখ্যাত প্রগতিবাদী নাট্য-আন্দোলনের পত্রিকা থেকে নিয়েছি। মার্কুসের আর্টের সংজ্ঞার্থ পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি।

"Art is perhaps the most visible 'return of the repressed' not only on the genetic level, but also on the genetic-historical level. ....Art challenges the prevailing principle of reason : in representing the order of sensuousness, it invokes a tabooed logic—the logic of gratification as against that of reason." একশ্রেণীর র‍্যাডিকালরা এই সংজ্ঞাকে মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয়। **"Smell and taste give, as it were, unsublimated pleasure····"** মার্কুসের এই মতকেও বোধ হয় গ্রাহ্য করেছেন।

একথা ঠিক পুঁজিবাদী দেশে শিল্পসাহিত্য বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে,

যেমন হয়েছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অন্যান্য অনেক কিছু। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আদিম প্রবৃত্তি অবদমিত হওয়ার ফলে এইরকম ঘটেছে। এটা ঘটেছে পুঁজির নিজস্ব নিয়মে। মার্কসবাদীরা শিল্পকে ও যৌনতাকে এক পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না। যৌনতাবিষয়ক আলোচনায় মার্কসবাদীরা হয়ত কিছুটা অবদমিত, কিছুটা সঙ্কুচিত, কিন্তু আদিমপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যে তাঁরা শিল্পসুষমা খুঁজে পাননি বলে তাঁরা লজ্জাবোধ করবেন না। মার্কুস-ভক্তদের মত মানুষের দেহের গন্ধ ও স্বাদ গ্রহণে তাঁদের কোনোদিন প্রবৃত্তি হবে না। আশার কথা, ঐ তরুণদেরই অন্য অংশের মধ্যে মার্কুস-ভক্তি অতটা উগ্র নয়। কোন বেণ্ডিট তো স্পষ্ট বলেছেন, "Some people have tried to force Marcuse on us as a mentor : that is a joke. None of us have read Marcuse."

এই সমাজ, এই পৃথিবী, এই জীবনযাত্রাপ্রণালী, এই মূল্যবোধের আশু আমূল পরিবর্তন দরকার। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে নয়, অবিলম্বে এক আঘাতে বর্তমানকে লুপ্ত করলেই, পুরণোকে ধ্বংস করলেই প্রলয়প্রান্তিক সুবর্ণ-দ্বীপের তটচিহ্ন দেখা যাবে। দুঃখনিশার অন্তে আনন্দ-উষার আবির্ভাব ঘটবে—এই আশ্বাসবাণীতে যুগে যুগে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে, বিশ্বাস করেছে। ঈশ্বরের বাণী, পুরাতত্ত্ব, অতিকথার কাহিনী, এই কারণেই মানুষকে রোমাঞ্চিত করেছে।

মার্কুসতত্ত্ব বা অনুরূপ যেকোনো তত্ত্ব সরলমতি ছাত্র-ছাত্রী এবং সরলবিশ্বাসী নিঃস্ব, বঞ্চিত, দুঃস্থকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবেই। মানুষের দুঃখকষ্ট যত চরমে ওঠে, সমস্যা যত সমাধান-অসাধ্য মনে হয়, অন্যায়-অত্যাচারের ব্যাপকতা-নিষ্ঠুরতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই সে ইউটোপিয়াস্বপ্নে আচ্ছন্ন হতে ভালবাসে। তখন আকাশে বাতাসে 'মিলেনিয়ামে'র—স্বর্গরাজ্যের আগমনীসঙ্গীত শুনতে চায়। সব বিশ্বাস ভেঙে গেছে, কিন্তু সে আবার নতুন করে বিশ্বাস করতে চায় এবং বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে এগিয়ে আসে।

এই স্বর্গরাজ্যের সন্ধানেই হিপীদের মিষ্টিক প্রাচ্য-অভিযান, বেকেটের নাটকে গোডোর জন্য অপেক্ষা, অস্তিত্ববাদের আলোকে সাত্র কর্তৃক মার্কসবাদের সংস্কার-সাধন আর ফ্রয়েডের মেটাসাইকলজির প্রেক্ষিতে মার্কুস কর্তৃক মার্কসীয় তত্ত্বের অতিবিপ্লবীকরণ।

১৫

ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব

আজ ছাত্রমানসকে সমাজের আবহাওয়া-নির্ণায়ক যন্ত্র বলা চলে। সমাজের কোনো অংশে চাপ বা শূন্যতা সৃষ্ট হলে ছাত্রমানসে তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে না। সামান্য কারণেই উদ্বেল হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজ। এ-যুগের বিদ্যার্থীর মন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনেই নিবদ্ধ নয়, দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনা ও সংবাদে সে আগ্রহী, সর্বব্যাপারে সে উৎসাহী। ছাত্রমানসের বৈচিত্র্যগ্রাহিতা ও অনুসন্ধিৎসা সর্বজনবিদিত। অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন হয়েছে সে সাম্প্রতিককালে, তার বিক্ষোভ-প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে, ষাটের দশকে।

বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব আলোচনায় ছাত্রমানসের কতকগুলি সামান্য ধর্মের উল্লেখ প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালীন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য কিশোর ছাত্র স্বভাবত অস্থির ও উল্লসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যৌবনপ্রাপ্তির ফলে নতুন জগতের তোরণপ্রান্তে উপস্থিত, নবারুণ আবাহনে সমুৎসুক। এক জটিল মানসিকতা ও বৈপরীত্যবোধের উন্মেষে কৈশোর-চঞ্চলতা ঈষৎ স্তিমিত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ, সংগ্রাম-মাধ্যমে অতি-পরীক্ষায় উন্মুখ, আবার অনভিজ্ঞতার দরুন রণকৌশল নির্ণয়ে দ্বিধান্বিত, কিঞ্চিৎ বিচলিত, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম-পরিকল্পনায়

অনীহ। নিজেকে সনাক্তীকরণ, নিজের সংজ্ঞানিরূপণ, সমাজে নিজের স্থান অন্বেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তরুণমানস পীড়িত ও চিন্তান্বিত। ছাত্র-তরুণ পরিবার-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, 'ফ্যামিলি-কালচার' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'পীয়ার-কালচার' অর্থাৎ সমবয়সীদের সমাজে প্রবিষ্ট হতে চায়। সমাজ ও পরিবারে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে নানাভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ-সুবিধা পায় ছাত্র-তরুণ, যাচাই করে দেখার প্রয়োজনও ঘটে। এই ধরনের নানা কারণে তার মনে চলে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, সংশয়। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হবার পথ সুগম ও মসৃণ নয়। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবৃত্তিকালীন সংকট বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ যখন সুস্থিত, এই সংকট তখন মৃদু ও অগভীর। গুরু-লঘুবিচার, শ্রেণীসংস্থান, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমকালীন সমাজের সব বিধান প্রায় সর্বজনস্বীকৃত এবং তরুণমানসের দ্বন্দ্ববিরোধ অনেকাংশে সুপ্ত, বিততি বা টেনসন স্তিমিত। বশ্যতা, অনুগামিতা স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রমানসে সঞ্চারিত এবং সমাজে ছাত্র-তরুণের স্থান ও কর্তব্য পূর্বনির্দিষ্ট ও ছাত্রসমাজ কর্তৃক সহজেই গৃহীত। আবার সমাজ যখন অস্থির, ব্যাপক পরিবর্তন যখন সমাসন্ন, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে যখন সমাজজীবন উদ্বেল, ছাত্রমানসের সংকটও তখন তীব্র ও গভীরভাবে অনুভূত। এই সময়ে গুরুলঘু বিন্যাস, পুরণো মূল্যবোধ ও সামাজিক বিধান, বশ্যতা, অনুগামিতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম প্রশ্নাতীত, অবশ্যস্বীকৃত থাকতে পারে না। সামাজিক বিততির ফলে তরুণমানস পীড়িত হয়ে পড়ে। সমাজে পূর্বনির্দিষ্ট স্থান ছাত্র-তরুণকে আর তৃপ্তি দিতে পারে না, তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজ। আবহাওয়ার চাপ বা শূন্যতা ছাত্রমানসেই বোধহয় সর্বপ্রথম অনুভূত হয়ে থাকে। পরিবৃত্তিকালীন সংকট এ-অবস্থায় আর বিরল ব্যতিক্রম থাকে না। অধিকাংশের মধ্যেই আলোড়ন আনয়ন করে। দেশকালের বিশেষ ধর্ম আরোপিত হয়ে এই বিক্ষোভ-আলোড়ন বিশেষ মূর্তি ধারণ করে।

আজ আমরা বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অননুগামিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবিত ও উৎকণ্ঠিত। ছাত্রবিক্ষোভ সমৃদ্ধ, অসমৃদ্ধ, উন্নত, অনুন্নত, ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, সর্বদেশেরই বিশেষ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। রাষ্ট্রনেতা, সমাজবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক, প্রত্যেকে নিজ-নিজ

দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার উপর আলোকপাত ও সমাধানের পন্থানির্ণয়ের চেষ্টা করে চলেছেন। সর্ববাদীসম্মত কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা ছাত্রবিক্ষোভ, আগেই বলেছি, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণ থেকে উদ্ভূত; তাই কোনো সর্বগ্রাহ্য ফর্মুলা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। আবার একই দেশে বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যাখ্যায় সমস্যা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত। তাই সমাধানসূত্রও পরস্পরবিরোধী এবং বিপরীতধর্মী।

রাষ্ট্রের কর্ণধাররা স্বভাবত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান, কাজেই ছাত্র-বিক্ষোভ (যদি রাষ্ট্রনেতার নির্দেশে বা অনুকূলে পরিচালিত না-হয়) তাঁদের মতে নৈরাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। সমৃদ্ধদেশের অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে এই বিক্ষোভ-আন্দোলন টেকনোক্রাট ও মনোপলির নীতিহীন শোষণ-লিপ্সার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। উন্নয়নশীল দেশে মনে করা হয়, এই আন্দোলন উন্নয়ন-পরিকল্পনার ব্যর্থতা বা শ্লথতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি-প্রভাবিত। সদ্যস্বাধীনতালব্ধ দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষকদের অনেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই ঐতিহ্য দু-এক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় (যার ধারা অনুসারে উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠছে) ও বিদ্যায়তন বহুদিন ধরেই অনেকাংশে স্বয়ংশাসিত ও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনমুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের প্রবেশ নিষেধ ছিল প্রায় সর্বত্র। এমনকি জারের রাশিয়াতেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল, তাই মাঝে-মাঝে রাষ্ট্র-অননুমোদিত বিপ্লবীগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নির্ভয়ে মিলিত হতে পারতেন। সাম্প্রতিককালে ভেনেজুয়েলার বিপ্লবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই বুর্জোয়া উদারনীতির উদ্ভব হয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রথম পর্বে; যখন মনে করা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের নব-নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার উপর দেশের উৎপাদন ও উন্নয়ন নির্ভরশীল, এবং আরো মনে করা হত যে, আবিষ্ক্রিয়ার পরিবেশ রাষ্ট্রীয় বাধা-নিষেধের ঊর্ধ্বে অবস্থিত না-থাকলে সৃজনক্রিয়া ও স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হতে বাধ্য। প্রাশিয়ার শিক্ষাসংস্কারকদের এই উদার মতবাদ উনিশ শতকের জাপান পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা হবে ঐতিহ্যসম্মত তত্ত্বনীতিকথার

গলাধঃকরণ, আর বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে শিক্ষা হবে সৃজনমূলক; এই ছিল সেই সময়কার আদর্শ। এইসব কারণে উচ্চবিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল র‍্যাডিক্যাল ও নতুন ভাবধারার আশ্রয়স্থল। উন্নয়নশীল দেশগুলি এই পশ্চিমী আদর্শকে বহুলাংশে মেনে নিয়েছে। কাজেই 'ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস' নিষিদ্ধ স্বাধীনচিন্তার, বিপ্লবীমতবাদের, বিদ্রোহী মানসিকতার লালন ও চারণভূমি হয়ে উঠেছে। রাজনীতি আমাদের বা অন্যদের শিক্ষায়তনে নতুন অনুপ্রবিষ্ট কোনো দুষ্টকীট বা রোগবাহী জীবাণু—এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। বিদ্যার্থীদের বিক্ষোভকে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অজানা কোনো দুষ্ট ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

উনিশশো পাঁচ সালে কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে ছাত্ররা, উনিশশো একুশে স্কুল-কলেজ ছেড়ে গান্ধীর ডাকে বেরিয়ে এসেছে ছাত্ররা, বিয়াল্লিশের ধ্বংসাত্মক কাজে ও বিক্ষোভপ্রদর্শনে তারা বয়স্কদের বিশেষ পিছনে থাকে নি। আজ ছাত্রবিক্ষোভে যে-বৈশিষ্ট্য, ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখা দিয়েছে, সেটা কালধর্ম-আরোপিত। কালধর্মে ছাত্র-তরুণের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে বিক্ষোভের মাত্রা, ব্যাপকতা, তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশের গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু এ-যাবৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত 'হায়ারার্কি'র ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কিশোর ও তরুণের নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ব্যতিক্রম ঘটলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক, মাতাপিতা এবং সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের ছাত্রবিক্ষোভ প্রধানত বিদেশী শাসক ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে। অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের এইসব বিক্ষোভ-আন্দোলনে প্রায় সবসময়েই প্রত্যক্ষ না-হোক, পরোক্ষ অনুমোদন থাকত। এইসব বিক্ষোভে গুরুদ্রোহিতার প্রকাশ ছিল সাময়িক, বিচ্ছিন্ন ও প্রায়শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিক্ষোভের মূলে প্রায়ই থাকত দেশ বা দেশনেতাদের প্রতি অবমাননা-লাঞ্ছনার কোনো ঘটনা অথবা উক্তি। গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা আজকের ছাত্রবিক্ষোভের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ছাত্রমানসে আজ দেখা যাবে তীব্র ঘৃণা ও দুরন্ত ক্রোধ কিংবা প্রাণহীন নিস্পৃহতা, উদাসীনতা, কর্তব্যবিমুখীনতা। প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি

অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাসপোষণ, বোধহয় আজকের তরুণসমাজের এক সামান্য ধর্ম। অভিভাবক-শিক্ষককে তারা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অনিচ্ছুক।

স্বাধীনতালাভের পর দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার প্রয়াস চলেছে। শহর-নগরের জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ছে। শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার, প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। গ্রাম থেকে নগরী-অভিমুখী হয়েছে ছাত্র-তরুণের এক বড় অংশ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা-সময় অনেকক্ষেত্রেই বিলম্বিত হয়েছে ও উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্ত পরিণত ও বিবাহিত হয়ে সংসারধর্ম নির্বাহ করত যারা, তাদের অধিকাংশ এখন বিদ্যার্থী। একদিকে তারা অভিভাবক-শিক্ষকের উপর নির্ভর করতে চায়, অনুগত থাকতে চায়; অন্যদিকে আবার নিজেদের বয়ঃপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল মনে করে সমাজ-পরিবর্তনে স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণে উৎসুক। এই 'সাইকোলজিক্যাল উইনিং' (psychological weaning)-এর সময় অনেকখানি বেড়েছে এবং এই ব্যাপারে জড়িত কিশোর-তরুণের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বলা চলে, বয়ঃসন্ধিকাল দীর্ঘায়ত হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবৃত্তি-সংকটে জড়িয়ে পড়েছে অনেকে। এই বয়সে সকলেই অল্পবিস্তর আদর্শবাদী হয়ে থাকে। তরুণ মাত্রেই কিছুটা স্পর্শপ্রবণ, ভাবপ্রবণ ও রোমান্টিক। দেশ-বিদেশের খবর, বিশেষ করে অন্যদেশের ছাত্র-আন্দোলনের সংবাদ তাদের কাছে নানাভাবে এসে পৌঁছুচ্ছে। খবরগুলি সবসময়েই শুধু খবর নয়, বিশেষ ধরনের মতবাদের রঙে রঞ্জিত খবর। 'ইলেকট্রনিক' যুগের দ্রুত ও অভাবনীয় পরিবর্তনের নিত্য-নতুন সংবাদে ছাত্রমানস অস্থির চঞ্চল হয়ে আছে। আগেই লিখেছি, তরুণ-মানস জেট-প্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, আর পার্টি-প্রতিষ্ঠান-সরকার যেন শম্বুক-গতির পরিকল্পনার আলেখ্য তার চোখের সামনে তুলে ধরছেন। তাই ছাত্রমানসে দেখা দিয়েছে অসহিষ্ণু মনোভাব। এই অবস্থায় তার মনে হচ্ছে, বড়রা ঠিক পথে চলছে না। তাই সে রুষ্ট, তাই সে বড়দের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে কেন তার দেশের অগ্রগতি ঘটবে না—এই তার জিজ্ঞাসা। সব বিক্ষোভের শেষ-বিশ্লেষণে বোধহয় এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে। যুক্তির থেকে আবেগের আধিক্য হয়ত তাদের বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তরুণ-মানসে আবেগের আধিক্য ও প্রভাব বেশি থাকাই তো স্বাভাবিক।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপর আস্থা হারানোর আরো কারণ আছে। রাজনৈতিক ছাড়া অন্য যেসব কারণে ছাত্রবিক্ষোভ ঘটছে, তার মধ্যে আছে প্রধানত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-পরিচালনা, পরীক্ষা ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারে পিতামাতা-অভিভাবকরা আর তাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছেন না। সমাজের অস্থির অবস্থায় তাঁরা নিজেরাই অস্থিরতা ও মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন। অনেকেই আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সমস্যায় জর্জর। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু তাঁদের অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। এক প্রজন্ম আগেকার এনট্রান্স পাশ পিতা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রের অধিকাংশ পাঠ্যবিষয়ে তাকে সাহায্য করতে পারতেন, আজকের দিনে তা সম্ভব নয়। ফলে আজকের ছাত্র-কিশোর আগের দিনের পুত্রের মতো পিতাকে আর নিজের থেকে জ্ঞানী, কাজেই শ্রদ্ধার্হ মনে করতে পারছে না। শিক্ষা-পরিচালনার ব্যাপারেও শিক্ষক ও অভিভাবকদের কর্তৃত্ব আগের তুলনায় অনেকটা সীমিত। দেশের সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষা-পরিচালনার নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সাহায্যস্রোতের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। তার প্রতিক্রিয়া শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমনির্ধারণের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে। বারবার পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে, কিছু-কিছু পরিবর্তন সাধিতও হচ্ছে। এর ফলে একদিকে ছাত্রমানসেও অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে; অন্যদিকে গুরুজনদের উপর আস্থা আরো কমছে। মনে রাখা দরকার, ছাত্র-সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ও শিক্ষার উপকরণ বাড়ে নি। কাজেই নানা অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা শিক্ষকের উপর, শিক্ষার উপর, এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রনেতা, গুরুজন ও অভিভাবকের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আরুণি-উপমন্যুর উপাখ্যানের চেয়ে বেণ্ডিট-ভ্রাতৃদ্বয়ের বাণী তাই তাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করছে। কাসাবিয়াংকার কথা তাদের মনে দাগ কাটছে না। শিক্ষক ও গুরুজনদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের বিযুক্তি ঘটেছে এবং অননুগামিতা বেড়েই চলেছে। বামপন্থায় দীক্ষিত বেশ কিছু ছাত্র-তরুণ দেশীয় নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে অতি-বামপন্থী হয়ে বিদেশী নেতাকে গুরুপদে বরণ করেছে। দক্ষিণপন্থীরা

নেতা-গুরুদের চেয়ে আরো দক্ষিণে যেতে চাইছে। আর মধ্যপন্থীরা শুধু পরীক্ষা, পাঠ্যক্রম নয়, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যাপারেও নেতাদের নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালিত করতে মনস্থ করেছে। জ্যেষ্ঠদের আধিপত্য আর ছাত্র-তরুণ নির্বিচারে মেনে নিতে পারছে না।

দ্বিতীয়যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর সর্বত্র তরুণমানসে যে-পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে, আমাদের দেশের তরুণরাও সে-পরিবর্তনের শরিক। এইকালের তরুণদের এটি এক বিশেষ ধর্ম। হার্বার্ট মার্কুস মনে করেন, ছাত্ররা morally alienated, নীতির প্রশ্নে তারা সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক অধিকর্তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা বর্তমান সমাজের সবকিছুকে, শিক্ষাব্যবস্থা সমেত সব কিছুকে, প্রত্যাখ্যান করতে চায়। একজন ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক বলেন, জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আগের দিনের মূলধনের মতো দামী। কাজেই আগের দিনের শ্রমিক-অসন্তোষের সঙ্গে আজকের দিনের ছাত্র-অসন্তোষ তুলনীয়। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক মজুর-মালিক সম্পর্ক। মার্কুসের মত ইনিও ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে একই পর্যায়ে ফেলেছেন এবং যন্ত্রতন্ত্রকে অতি-গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁরা কৌশলে তাঁদের তত্ত্বে সমাজতন্ত্রবিরোধিতা প্রচার করতে চেয়েছেন। মনে রাখা দরকার ছাত্ররা শ্রমিকের মতো উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না, উৎপাদনের কাছাকাছি যে-সব ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে বরং অসন্তোষ কম। ছাত্রদের মনোভাব অনেকটা মরশুমি ফুলের মতো। ঋতুর মতোই পরিবেশের বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ওদের মনের রঙে রঙিন হয়ে ফুলের মতো ফুটে ওঠে। আবার একজন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, ছাত্ররা সুবিধাভোগী বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্গত, 'এলিট গ্রুপ'। এদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপথে চালিত করা। এ-তত্ত্বের যথার্থ্য নির্ণীত হয় নি। দেখা গেছে, ছাত্রস্বার্থ ও শ্রমিকস্বার্থ কোনো-কোনো সময়ে এক হয়ে গেছে, শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে ছাত্ররা অনেক সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছাত্রদের বুর্জোয়া বা শ্রমিক কোনো শ্রেণী-পর্যায়ভুক্তই করা চলে না।

কালধর্ম ছাত্রবিক্ষোভকে ব্যাপক ও তীব্র করেছে, ছাত্রমানসিকতায় রূপান্তর ঘটেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও উচ্চশিক্ষাভিত্তিক শ্রমের চাহিদা বেড়েছে। টেকনিশিয়ানরা আজ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মার্কেটিং-এর সঙ্গে জড়িত, বুদ্ধিজীবীরা আজ

সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা-না-রাখার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কাজেই ছাত্ররা আজ উৎপাদনব্যবস্থায় অপরিহার্য, রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে আগের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যমণ্ডিত। উচ্চশিক্ষা শুধু উৎপাদনের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। উৎপাদন-সম্পর্ক বজায় রাখা ও পরিবর্তিত করার সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিপ্লব সংঘটিত করা বা প্রতিহত করার ব্যাপারে ছাত্রদের ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ছাত্রদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে চেতনাও তেমনি বাড়ছে। সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধ ও নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা ক্রমশ সজাগ হচ্ছে। এদের মধ্যে যারা র‍্যাডিক্যাল, তারা পুরনো ধারায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্পর্ক বজায় রাখার একটা যন্ত্রপ্রতিষ্ঠান মনে করছে। কর্তৃপক্ষ চাইছেন, ছাত্রদের জ্ঞান বাড়ুক বিদ্যা বাড়ুক, কিন্তু চিন্তা করার ক্ষমতা যেন না-বাড়ে। আর ছাত্ররা চাইছে, তাদের 'রবোট' করে রাখার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের আয়ত্তে আনতে হবে, না-পারলে ভেঙে ফেলতে হবে।

বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে সমকালীন নানা বিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত থাকা দরকার। সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন যতদিন প্রভাবশালী ছিল—আনুগত্য, অনুগামিতা ইত্যাদি ধর্মাচরণ করে তরুণমন সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরোধিতা 'পরধর্ম ভয়াবহ' বলে এড়িয়ে যেতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে স্বাধিকারচেতনা ও গণতন্ত্রের ধারণা তাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি—যথা পরমত-সহিষ্ণুতা, আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। বুর্জোয়া 'sense of independence' এবং ফিউডাল 'sense of dependency' একই সঙ্গে বসবাস করছে অনেক ছাত্রমানসে—বিশেষ করে তাদের মধ্যে, যারা গ্রামীণ পরিবেশ থেকে সদ্য শহরে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। এর ফলে নানারকম বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভ হয়ত এই কারণেই বিপথগামী হচ্ছে। সবকিছু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা, পুরনো সবকিছুকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির মধ্যে আমি দেখতে পাই সামন্তধর্মী 'sense of dependency'কে জোর করে অস্বীকারের, হীনমন্যতা বিলোপের, এক ব্যর্থ করুণ হাস্যকর প্রচেষ্টা। অন্যদিকে ছাত্রমানসে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও সাম্যবাদের চেতনা। তরুণমন ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের প্রতি

বেশি আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। আশু ও সর্বাত্মক পরিবর্তন চাওয়া তারুণ্যধর্ম। সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, এটা তারা বুঝতে পারছে। উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক চেতনালাভের জন্য সময় ও শ্রম ব্যয়ে তারা কিন্তু রাজী নয়। যে-যুগে পরীক্ষা-পাশের সহজ উপায় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে 'short cut', 'guide' ইত্যাদি পড়লেই চলে, সে-যুগে কে পড়তে চায় সাম্যবাদী সাধনার জন্য কঠিনবোধ্য বিপুলায়তন মার্কস-এঙ্গেলসের ক্লাসিক? পার্টি-লিটারেচারে সহজতম উপায় নির্ধারিত করার দাবি তারা অনায়াসে করতে পারে এবং কিছু কৌশলী পার্টিনেতা অনায়াসে তাদের এই দুর্বলতার ও অসহিষ্ণুতার সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়েও আসতে পারেন। যন্ত্রে একটি মুদ্রা ফেলে যদি তৈরি গরম একপাত্র কফি পাওয়া যায়, কে আর পারকোলেটর, দুধ, কফি, চিনির ঝামেলা পোয়াতে চায়? সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকদের চিনে নিয়ে খতম করতে পারলেই যদি সহজে দ্রুত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কেন মিথ্যা শাস্ত্রচর্চা ও ধাপে-ধাপে অগ্রসর হবার কৃচ্ছ্রতা? আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ও লালফিতার জটিল গ্রন্থিতে গণতন্ত্র আটকে পড়েছে, কলুষিত হচ্ছে, এটা সর্বজনবিদিত সত্য। এরই জের টেনে সবরকমের 'এসটাবলিশমেণ্ট'-বিরোধিতা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে হেয় করা চলে। অভিভাবনপ্রবণ ছাত্র-তরুণকে সহজেই 'স্কেপগোট' দেখিয়ে উত্তেজিত করা যায়, তার ফলে সৃষ্ট হতে পারে ছাত্রবিক্ষোভ, অতিবাম-প্রবণতা ও ধ্বংসকামিতা। এর জন্য শুধু ছাত্রদের দায়ী করা চলে না। বয়স্কদের, জ্যেষ্ঠদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

ছাত্র-তরুণ আজ তার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ। তার বিশেষ সুবিধাগুলোও তার অজনা নয়। দায়দায়িত্ব তার খুবই কম, কাজেই আপস-রফার প্রয়োজন নেই। তারা জানে, রাষ্ট্রনেতারা খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত না-হলে পুলিশি জুলুম চালাতে চায় না ছাত্রদের উপর। এর ফলে ছাত্রমনে, বিশেষ করে কিছু-কিছু নেতৃস্থানীয়র মনে, নিজেদের জাহির করার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের কিছু সুবিধাসন্ধানী নেতার মত তাদের একাংশও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছে। অন্যের ক্রিয়াকর্মের উপর আধিপত্য চালানোর ইচ্ছা থেকে সকলে না-হোক কিছু লোক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে থাকেন। ছাত্র-তরুণের মনে প্রায়ই অন্যের উপর আধিপত্য করা, অন্যের চিন্তাকে প্রভাবিত করা এবং অন্যের প্রক্ষোভকে

অভিভাবিত করার ইচ্ছা থাকে। বর্তমানে সেই ইচ্ছাগুলো কালধর্মে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। ছাত্র-তরুণ একটু বেশিমাত্রায় আত্মপ্রচারে উন্মুখ হয়েছে। আত্মপ্রচারে বাধা পেলে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এক ধরনের ছাত্র, যাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনার ভাব বেশি, নিস্তেজনাক্ষমতা কম, তারা এই কারণেই বোধহয় অত্যধিক কোপণস্বভাব ও মারমুখী।

পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতার ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে গত তিরিশ বছরের সামাজিক ইতিহাস উল্লেখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ক্ষত এই কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ বহন করছে। দূর-প্রাচ্যে নিয়োজিত মিত্রসেনাদের উদর ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির রসদ সরবরাহ করতে গিয়ে সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরে। কালোবাজারী টাকার খেলায় সেই ফাটল প্রসারিত হতে থাকে। নীতিবোধ, মূল্যবোধে ভাঙন ধরে। নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যেও যথেচ্ছাচারের স্পৃহা ও বোহেমিয়ান ভাব সংক্রামিত হয়। তার আগেই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক শাসন শিথিল হয়েছিল, যৌথপরিবারের নিয়মশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছিল। এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তু প্রবাহ। নিরাপত্তার অভাবে পীড়িত হয়ে উদ্বিগ্ন অশান্ত অস্থির হয়ে উঠল দেশের সাধারণ মানুষ। ঐতিহ্যিক থেকে আধুনিক শিল্পসমাজে উত্তরণের চেষ্টা তরুণ-তরুণীর একাংশকে উৎসাহী সংগ্রামী বামপন্থী করে তুলল। যৌথ-পরিবারের উষ্ণতার অভাব মেটাতে তারা বামপন্থী পার্টির ছাত্রদলে মিলিত হয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নিরাপত্তার অভাব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা দূর করতে চাইল। যে-পার্টি যত উচ্চকণ্ঠে নতুন সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলো, সেই পার্টি তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বামপন্থী আন্দোলন ও বিক্ষোভের ভয়ে রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যে দেশের গঠনমূলক কাজের চেয়ে আত্মরক্ষমূলক, পার্টিরক্ষামূলক কাজের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা গেল। রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু তা-সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে বোধ হয় অপরাধপ্রবণতা খুব বেশি (সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায়) বাড়ল না। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ছাত্র-তরুণ নিজেদের প্রকাশ করতে চাইল, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, সমাজে নিজেদের স্থান খুঁজতে লাগল। চলল রাজ্যব্যাপী এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। শাসকপার্টি এ-যাবৎ শুধু নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখে জোড়াতালি দিয়ে আত্মরক্ষা-

মূলক শাসন চালিয়েছেন, গঠনের দিকে খুব কম নজর দিয়েছেন। আর বিরোধী পার্টিগুলি প্রতিবাদবিক্ষোভের মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়েছেন। ছাত্র-তরুণের চোখের সামনে নতুন পৃথিবীর ছবি—ন্যায়ের পৃথিবী, সমানাধিকারের পৃথিবী,— যার দিগন্তে নব সূর্যোদয়। উৎসাহ-উদ্দীপনায় তারা ফেটে পড়ছে। পৃথিবীতে দুটি মাত্র শিবির। একদিকে ন্যায়ের ও সাম্যের, অন্যদিকে অন্যায় ও অসাম্যের। তাদের মনে তখন এক চিন্তা, কণ্ঠে এক গান, প্রাণে এক আশা। ঐ শিবিরকে ভাঙতে পারলেই স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠবে। বোধহয় আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। কাজেই, যে কোনো মূল্যে ভাঙতে হবে। আর ঐ শিবিরের পরিচালকদের একটি মাত্র পরিকল্পনা—যে কোনো ভাবে টিকে থাকতে হবে। ষাটের দশকের প্রথম দিকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রূপান্তর ঘটে। ভাঙন দেখা দিল কমিউনিষ্ট শিবিরে। এ-দেশের তরুণমানসে সেই আঘাত অনুভূত হয় এবং বামপন্থীদের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা ছাত্র-তরুণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মনে রাখা দরকার, ষাট দশকের কিশোর-তরুণের অনেকে বিভক্ত রক্তাক্ত মন্বন্তরপীড়িত অভাব-অনশনক্লিষ্ট শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মিছিল দেখেছে জন্মাবধি। তারা শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি স্বজনপোষণের গল্প শুনেছে জ্ঞান হওয়া অবধি। তারা এতদিন অন্য শিবিরস্থিত সকলকে শত্রু বলে জেনেছে; এখন শুনল নিজের শিবিরেও শত্রু আছে। আরো ভয়ংকর শত্রু—বিপ্লবকে যারা শোধনবাদ দিয়ে প্রতিহত করতে চায়। অথবা শুনল, অতিবামহঠকারিতার শিশুরোগে আক্রান্ত হয়েছে অনেক বন্ধু। তাদের বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছুল। দলের মধ্যে উপদল গড়ে উঠতে লাগল। দল ভেঙে নতুন দল তৈরী হল, তার মধ্যেও দলাদলি দেখা দিল। প্রথমে "সোশ্যাল ও ফ্যামিলি কালচার" পার্টিকালচারে পরিণত হয়েছিল; এখন পার্টিকালচার "পীয়ার কালচার"-এর রূপ নিলো। অব্যবস্থিত অপরিণত ছাত্র-মানসে ভাঙার ডাক, আঘাত করার ডাক, বিশেষ হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হল। অনেকেই এই ডাকে সাড়া দিল, ছাত্রবিক্ষোভ তীব্র ব্যাপক ও ধ্বংসকামী হয়ে উঠল।

কেনেথ কেনিস্টন (The Uncommitted 1965) হার্ভার্ডের ছাত্রদের মধ্যে সমাজবিচ্ছিন্নতার প্রসার দেখেছেন, ফার্ডিনাণ্ড জোয়াইগ (The Student In The Age Of Anxiety '63) অক্সফোর্ড ও ম্যাঞ্চেস্টারের ছাত্রদের মধ্যে

বালপ্রৌঢ়ির লক্ষণ দেখেছেন। আমাদের ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসকামিতা ও গুরুদ্রোহিতার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এ-সবের পেছনে কি কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত নেই ?

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গত কুড়ি বছরে আমাদের অধিকাংশ প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলোচ্ছেদ করেছে। স্থানকালের ধারণা পালটেছে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব এনেছে। আণবিক জীববিজ্ঞানের বৈপ্লবিক আবিষ্ক্রিয়া : যথা—ডি-এন-এ, আর-এন-এ. সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান, ল্যাবরেটরিতে প্রাণকোষ তৈরীর সম্ভাবনা ইত্যাদি ভ্রূণের পরিবর্তনসম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। মহাশূন্যে ও সমুদ্রতলে অভিযান জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব-সমস্যার সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে পারবে, অনেকে মনে করছেন। আমরা বয়স্করা আজ ধ্বংসায়ুধ বাড়িয়ে চলেছি, উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ-সমুদ্রকে কলুষিত করছি, যে-পরিমাণে উর্বর জমির প্রাণরস নিঙড়ে নিচ্ছি, সেই পরিমাণ নতুন অনুর্বর জমিকে প্রাণ দিতে পারছি না, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর মীমাংসার আন্তরিক চেষ্টা করছি না। ছাত্র-তরুণের বিক্ষোভ কি এই ইঙ্গিত বহন করছে যে, আমরা নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যা সমাধানে অক্ষম ? বহুমাত্রিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের, জ্যেষ্ঠদের, জানা প্রচলিত পথে পাওয়া যাবে না। ছাত্র-তরুণ কি সমাজরথের রশি ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, ওদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে, আমাদের সসম্মানে বাণপ্রস্থে যাবার নির্দেশ জানাচ্ছে ? আগামী দিনের ছবি হয়ত আমাদের দূরকল্পনারও বাইরে।

১৬

বিচ্ছিন্নতা বিপ্লব উন্মত্ততা

ব্যক্তি নানাকারণে সমাজবিরোধিতায় লিপ্ত হতে পারে। সমাজের কাছে প্রত্যাশা পরিপূর্ণ না-হলে, সমাজের অত্যধিক দাবী মেটাতে না-পারলে, সমাজ কোনো কিছু দাবী না-করলে, মানুষ সমাজকে অবহেলা করতে শেখে। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিতে সামাজিক পরিমণ্ডল যখন বিষাক্ত হয়ে যায়, সমাজের প্রতি মানুষ স্বভাবতই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। পুরণো সমাজব্যবস্থা যখন অনঢ় অচল হয়ে নতুনের আগমন-পথ রোধ করে তখন কিছুসংখ্যক মানুষ পুরণো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পুরণো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ কোনো সময় মৃদু, কোনো সময় তীব্র ; কখনও নীরব, কখনও সোচ্চার ; কোথাও সংস্কারকামী, কোথাও ধ্বংসাত্মক। যখন উৎপাদন কিম্বা বণ্টন ব্যবস্থার, অথবা দুয়েরই আশু আমূল পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে, তখন অনেক সংখ্যক লোক সমাজকে পরিত্যাগ করে। এদের মধ্যে থাকে আগামী দিনের আদর্শ-সমাজের আবাহক, অতীতের রামরাজ্যের সমর্থক এবং অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধানী। প্রথম দল বিপ্লবের সমর্থক, এই সমাজকে ভেঙে নতুন উন্নততর সমাজ গঠনের প্রয়াসী। দ্বিতীয় দল প্রতিবিপ্লবী, কাল্পনিক অতীতের নামে বিপ্লব-প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; এদের রোমান্টিক আবেদন অনেক তরুণকে আকৃষ্ট

করে, সংগ্রামী করে, বিপ্লবপ্রচেষ্টাকে অনেক সময় এরা সাময়িকভাবে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয় এবং নতুন লেবেলে পুরণো সমাজকে এরা কিছুকাল জীইয়ে রাখে। তৃতীয় দল পার্থিব সবকিছুকে নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর মনে না-করেও সংগ্রামে অংশগ্রহণে পরাঙ্মুখ। জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান গঠন, মিশন স্থাপন, শিল্পে-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচার, অথবা উদ্ভটতত্ত্বের আমদানী ইত্যাদি কাজের মধ্যে এরা নিজেদের নিয়োজিত রাখে। পরোক্ষভাবে এদের কার্যকলাপ প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করে। এরা সকলেই বিচ্ছিন্ন। কোনো-না-কোনো আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ। আবার আদর্শহীন সমাজবিরোধীর সংখ্যাও কম নয়। জীবিকার তাগিদে ও অন্যান্য কারণে অসামাজিক বেআইনী ক্রিয়াকলাপে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, অথবা সেইসব রাগী-তরুণের দল, বিনা কারণে যারা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মে আনন্দিত, তারাও সমাজের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে; তারাও বিচ্ছিন্ন। প্রথমোক্তরা, আদর্শবাদীরা হয়ত স্বেচ্ছায় সমাজবিরোধী, আর এরা আদর্শহীনরা হয়ত সমাজবিরোধী হতে বাধ্য হয়েছে। সমাজকে রুগ্ন মনে করে সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করার আর সমাজ কর্তৃক আশ্রয়চ্যুত হওয়ায় ফল প্রায় একই দাঁড়ায়। একই ধরনের বিচ্ছিন্নতার মানসিকতায় এরা সবাই প্রভাবিত। নিউরোটিকরাও সমাজ থেকে অল্পবিস্তর বিচ্ছিন্ন, স্কিজোফ্রেনিকরা পুরোমাত্রায় বিচ্ছিন্ন; এমনকি সত্তা থেকেও বিযুক্ত।

বিচ্ছিন্নতা কি? বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ব্যাধি, না ব্যধিগ্রস্ত সমাজের বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী তরুণের স্বাভাবিক প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া? আমাদের দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিচারে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা কি অপরিহার্য?

এই প্রশ্ন দুটির যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা আছে এই প্রবন্ধে।

বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা নির্ণয় দুরূহ। নানা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংরেজিতে এ্যালিয়েনেশন, এসট্রেঞ্জমেন্ট, এ্যাপাথি, নন-ইনভলভ্‌মেণ্ট, ইনডিফারেন্স ইত্যাদি নানারকমের বিচ্ছিন্নতা-সূচক শব্দ প্রচলিত। লেখকরা[১] অনেকে এই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেও, এগুলো দিয়ে বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন রূপকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বাংলায় অত শব্দ-সম্ভার না-থাকা সত্ত্বেও আমরা বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তি, বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ বিচ্ছিন্নতার

---

১ Keniston Kenneth: The Uncommitted: Harcourt Brace (1965) pp.

আলোচনায় ও বিচারে ব্যবহৃত দেখতে পাই। এই শব্দগুলি প্রায়শ একই অর্থে বা আলগাভাবে ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত। শব্দগুলির সীমানির্ধারণের কোনো চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না, অথবা বিচ্ছিন্নতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞানিরূপণেরও প্রয়াস দেখি না। ফলে, বিচ্ছিন্নতার আলোচনা ও বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যহীন, কোনো-কোনো সময় অর্থহীন। কয়েকবছর আগে কলকাতার পাভলভ ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিচ্ছিন্নতা-বিষয়ক আলোচনা-সভাগুলিতে এই প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অসংবদ্ধ, অবিন্যস্ত আলোচনাস্রোত বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, আমার মনে হয়, শ্রোতাদের মনে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। বিপ্লবের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা নির্ধারণ করতে হলে বিচ্ছিন্নতার বিবিধ ধারার সঙ্গে পরিচিতি দরকার।

বিচ্ছিন্নতার কারণ নির্ণয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা শৈশব-কৈশোরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করেন। অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক অবস্থান, সমাধান-অতীত ঈদিপাস গূঢ়ৈষা, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, লিবিডোসংকট ইত্যাদির দরুন শিশু পরিবার তথা শৈশবের সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত বোধ করতে না-পারার ফলে পরবর্তী জীবনে বিচ্ছিন্নতা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অতীত বা শৈশব আমাদের পরিণত বয়সের মানসিকতা, আচার-ব্যবহারের নিয়ামক নির্দেশক। আমেরিকার ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিকরা প্রধানত এই মতের ও পথের সমর্থক। অন্যদিকে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, বিচ্ছিন্নতা এই টেকনোলজিক্যাল যন্ত্রসর্বস্ব সমাজের আর্তি ও বিততির (stress and strain) প্রতিক্রিয়া। বিচ্ছিন্নতা এই শোষণভিত্তিক সমাজের অভিশাপ। ব্যক্তি অসহায় নিষ্ক্রিয়, বিচ্ছিন্নতার শিকার। শিল্পপতিরা তার শ্রম অপহরণ করেছে, রাষ্ট্রের পরিচালকরা তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, দলপতিরা সমাজপতিরা কৌশলী প্রচারের সাহায্যে তার স্বতঃস্ফূর্ততা ও বিচারশক্তি থেকে বঞ্চিত করে তাকে অটোমেটনে পরিণত করেছে। সমাজতাত্ত্বিকদের বিচারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিকারপ্রবণতা উপেক্ষিত। এই মতের প্রচার ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রমশ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধোত্তর আর্থনীতিক অব্যবস্থায় ইয়োরোপের দেশগুলিতে যতটা অস্থিরতা শৃঙ্খলাহীনতা ঘটে, আমেরিকায় প্রথমদিকে ততটা ঘটেনি। তাই মনে হয়,

সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সবরকম প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের উপর অনাস্থা, পুরণো মূল্য-বোধের উপর অবিশ্বাস, আমেরিকাতে প্রথমদিকে ততটা প্রকাশ পায়নি, যতটা পেয়েছিল ইয়োরোপে। কিছুদিন পরে, বিশেষ করে ভিয়েতনাম-যুদ্ধে আমেরিকার আকণ্ঠ নিমজ্জনের ফলে, সেখানেও সংকট দেখা দেয় এবং সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার আলোচনায় সামাজিক অব্যবস্থা, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি সমালোচিত হতে থাকে। সহজাত জৈব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-অচরিতার্থতার চেয়ে সোশ্যাল ট্রমার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। উৎপাদনব্যবস্থায় যন্ত্রপ্রাধান্য ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতার তথা সর্বপ্রকার দুর্গতির মূল—বিবেচিত হতে থাকে। সমাজের পণ্যপ্রাচুর্য ও পণ্যপূজা বিচ্ছিন্নতার ও সমাজবিমুখীনতার প্রধান কারণ; এই প্রচার প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়। বলাবাহুল্য, এই দুই মতই একদেশদর্শী, কাজেই বিচ্ছিন্নতার সঠিক সংজ্ঞানির্ণয়ে এই মতের প্রবক্তারা অপারগ। প্রথমোক্তরা ব্যক্তিকে সমাজসম্পর্করহিত প্রবৃত্তিতাড়িত জীব মনে করেছেন আর দ্বিতীয় দল সমাজকে ব্যক্তিপ্রভাবরহিত, ব্যক্তিনিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন কল্পনা করেছেন। মনস্তাত্ত্বিকরা মানসিকতা গঠনে সামাজিক প্রভাবকে অকিঞ্চিৎকর মূল্য দিয়েছেন আর সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজপরিবর্তনে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকাকে নগণ্য মনে করেছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেছেন।

সীম্যান[২] বিচ্ছিন্নতার ফলে সৃষ্ট মানসিকতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিচ্ছিন্ন মানুষ মনে করে, সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে তার কোনো ভূমিকা নেই, সে শক্তিহীন; তার বিশ্বাসের মূল বিনষ্ট, সে আস্থাহীন; সমাজ-অনুমোদিত পথে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুনো যাবে না, আদর্শের ছাঁচে কোনোকিছু গড়া যাবে না, সে আদর্শভ্রষ্ট; সামাজিক মূল্যমান অর্থহীন, সে তাই সমাজ ও সমাজের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সে নিঃসঙ্গ; অন্তর্সত্তার প্রেরণা দ্বারা মানুষ পরিচালিত নয়, বাইরের সামাজিক ও রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ব্যক্তিমাত্রেই নিয়ন্ত্রিত, তাই সে সত্তা থেকে বিযুক্ত, সত্তাহীন।

একজন গবেষক[৩] বিচ্ছিন্ন তরুণের মধ্যে দেখেছেন তিন ধরনের মনোভাবের

২ Seeman Melvin: On the meaning of Alienation. American Sociological Review, December, 1959.
৩ Gold Martin: Juvenile Delinquency: Social Issues: Spring 1969.

সমাবেশ। প্রথমত, এরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, দ্বিতীয়ত, এরা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না, তৃতীয়ত, এরা আত্মসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্য একজন এইকালের পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মধ্যে একটি বিশেষ ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। এইকালের তরুণরা জ্যেষ্ঠদের সমাজকে নতুন করে বা আরো সুন্দর করে গড়তে চায় না, তারা এই সমাজ থেকে পুরোপুরি বাইরে থাকতে চায়। তারা পূর্বসূরীদের অনুগামিতার কথা ভাবে না, পূর্বসূরীদের অস্বীকার করার ও সমাজসংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায়। নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে এরা, একটা নতুন সাবকালচার। এরা জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং ভাববিনিময়ের প্রয়োজনও অনুভব করে না।

অন্যজন[৪] বিচ্ছিন্ন তরুণদের মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রকাশ দেখেছেন। অহিংস হিপী মনোভাব ও হিংসাশ্রিত ধ্বংসকামী মনোভাব। প্রথমোক্তরা নিষ্ক্রিয়, কোনোকিছু ভাঙতে চায় না, গড়তে চায় না, একেবারে নবজীবনের স্বাদ চায়; দ্বিতীয় দলভুক্তরা সক্রিয়, তারা পুরণোকে ভেঙে জ্যেষ্ঠদের চেয়ে সুন্দরতর সুসমসমাজ গড়তে চায়, বয়ঃপ্রাপ্তির জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না। হিপীরা বাইরে থাকতে চায়, ভিতরে ঢুকতে চায় না; তাই গবেষক মনে করেন যে, তাদের আচরণ-মনোভাব এই দমবন্ধ-করা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্থ ঠিক প্রতিবাদ। অপরপক্ষে, উগ্রপন্থী হিংসাশ্রয়ী তরুণরা এই পচনশীল সমাজের কর্তৃত্বই শুধু দখল করতে চায়; তারা ক্ষমতালোভী, পরিবর্তন-প্রয়াসী নয়।

আর একজন গবেষক[৫] আমেরিকার দরিদ্র ও কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের বিচ্ছিন্নতা ও ধনীপুত্রদের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। দরিদ্র ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্য প্রাচুর্যের সমাজে প্রবিষ্ট হওয়া, সমাজকর্তৃক অনুমোদিত হওয়া, ধনী-তরুণদের মত সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়া নয়। পূর্বোক্তদের বিচ্ছিন্নতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, সামাজিক অনুশাসন বাইরে থাকতে তাদের বাধ্য করেছে।

---

৪ Friedenberg Edgar. z : Current Patterns of Generation Conflict : Social Issues : Spring 1969.

৫ Gottlieb Daird : Poor youth : A Study in Forced Alienation : Social Issues : Spring 1969.

কেনিস্টন[৬] এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা-নির্ধারণে খুব কম লেখকই উৎসুক। ফ্রম, ক্যাহলার, প্যাপেনহাইম বহুবিধ বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটির গায়ে একই লেবেল এঁটে দিয়েছেন। এর দ্বারা বিভিন্ন উৎসকে তাঁরা সন্নিবদ্ধ করতে পারেন নি, বরং এর ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এইটুকু শুধু গবেষক-আলোচকদের উক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, সমাজের মধ্যে গলদ আছে আর আমরা মূল্যবান কিছু হারিয়েছি। 'য়্যালিয়েনেশন' বা বিচ্ছিন্নতা একটা বড় দরের সামাজিক ক্ষতি; 'ইমানসিপেশন' বা বন্ধনমুক্তির সঙ্গে সমার্থবাচক নয়। একটা-কিছু নেই, পরিবর্তে অন্য-কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

কেনিস্টন তাই বিচ্ছিন্নতার আলোচনায় চারটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন, এই চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত-রূপ বোধগম্য হতে পারে এবং হয়ত সংজ্ঞানির্ণয়ও সম্ভব হতে পারে। কোন বিশেষ সম্পর্ক থেকে, কিসের থেকে বিচ্ছিন্ন? পুরণো সম্পর্কের পরিবর্তে নতুন কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বা উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি? বিচ্ছিন্নতা অভিব্যক্ত হচ্ছে কিভাবে? বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী কি বা কে? তিনি 'য়্যালিয়েনেশন' শব্দটিকে বিশেষ একধরনের বিচ্ছিন্নতা-বোঝাতে ব্যবহারের পক্ষপাতী। বিচ্ছিন্নতার আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি অস্তিবাদী ও বিশ্বনিখিল সংক্রান্ত দার্শনিক নৈরাশ্যবাদীদের কথা তুলেছেন। স্বল্পস্থায়ী এই মানবজীবন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন। সেদিন আর নেই যখন মনে করা যেত যে, এক পরমনিয়ামক পরমেশ্বর এক নিয়মতান্ত্রিক পৃথিবী মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ভাবা চলে না যে, বিষয়মুখীন সত্য বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে, বলা চলে না যে, একজন

---

৬ Keniston Kenneth : The Uncommitted : pp 452.
"Writers like Fromm, Kahler and Pappenheim use "alienation" to describe a variety of conditions ranging from the separation of man from nature to the loss of pre-capitalist relationship, from man's defensive use of language to his estrangement from his own creative potential and from the worker's loss of control over the productive process to the individual's feeling of social or political powerlessness.

৭ Ibid pp 455.

অন্যজনকে নিজের কথা জানাতে বা বোঝাতে পারে। পরমসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এই মনোভাবের মূল নিহিত আছে য়িহুদী খ্রীষ্টানদের স্বর্গোদ্যান থেকে বিচ্ছিন্নতার কাহিনীর মধ্যে ও আদিম পাপ-অনুভূতির মধ্যে। এই অধঃপতন ও আদিম পাপের অংশীদার না-হয়েও আমাদের মধ্যে অস্তিবাদী ভাবধারা বিদ্যমান। বোধ হয়, কোনো মানুষই এই চিন্তা থেকে মুক্ত নয়। কেনিস্টন এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার নাম দিয়েছেন 'কসমিক আউটকাষ্টনেস'। এরপর বয়োবৃদ্ধির সংকটের আলোচনা করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি, নতুন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলছি। ভ্রূণ থেকে বিচ্ছিন্ন সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনের মধ্যে লেখক বিচ্ছিন্নতার বিলাপ শুনেছেন, শিশুর বয়োবৃদ্ধির মধ্যে তিনি মাতাপিতার সঙ্গে পুরণো সম্পর্কচ্যুতির বেদনা অনুভব করেছেন। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব, প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য; ব্যক্তির জীবন-ইতিহাস ক্রমবিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। অবশ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নতুন সংযুক্তির ফলে এই করুণ ট্রাজেডী সবসময় অনুভব করে না। তবে মাঝে-মাঝে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, পুরণো সম্পর্কচ্যুতির চেতনা আমাদের উদ্বেল করে বই কি। পরিণত বয়সে রোগশয্যায় আমরা কি হারানো অতীতের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলি না? বর্তমানকে বিস্মৃত হয়ে বিচ্ছিন্ন অতীত, শৈশবের উষ্ণতা, নিরাপত্তা ও দায়িত্বমুক্তির আকাঙ্ক্ষা মনের গোপন কোণে পোষণ করি না? এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের নাম দিয়েছেন লেখক 'ডেভেলপমেণ্টাল এস্ট্রেঞ্জমেণ্ট'। এই প্রসঙ্গে তিনি ঈদিপাস সমস্যারও আমদানী করেছেন। স্কুলজীবনকে তিনি শিশুর যা-খুশি-করার স্বাধীনতাবিচ্যুতি বলে মনে করেছেন। যৌনগ্রন্থির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে আর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন বালক। পারিবারিক সম্পর্কের, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ককে এই সময়ে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, সমাজের অন্যান্য সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারিত করতে হয়। ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক ও সমাজের পুনর্বিন্যাস আলোচিত হয়েছে। শিকারীর সমাজ থেকে পশুপালনের সমাজ, দাসসমাজ থেকে সামন্ত-সমাজ, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র; প্রতিটি পরিবর্তনের অধ্যায়ে বিচ্ছিন্নতাসংকট দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে। একশ্রেণী পুরণো ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখতে চায়, অন্য একশ্রেণী পুরণো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই ব্যবস্থাকে বিলোপ করতে

চায়। এই বিচ্ছিন্নতাকে বলা হয়েছে 'হিষ্টরিক্যালস্'। লেখকের মতে, তরুণ মার্কসের বিচ্ছিন্নতা-বিশ্লেষণ মূলত এই ঐতিহাসিক ক্ষয়ক্ষতির বিশ্লেষণ। শ্রমসম্পর্ক চ্যুতি থেকেই মানুষ অপর থেকে ও নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন। মার্কসের বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতা[৮] আরোপিত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। মানুষ স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্নতা তার উপর চাপানো হয়েছে। প্রলেতারিয়েত জানে না যে তার শ্রম থেকে সে বিযুক্ত, তার শ্রম অপহৃত। এই ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে বড় ও ট্রাজিক শিকার নিঃস্ব শ্রমজীবী। বিচ্ছিন্নতাবোধের চেতনা বিচ্ছিন্নতা-বিলোপের সূচনা[৯]।

মার্কস-এর মতে শ্রমবিচ্ছিন্নতার ফল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। অপরপক্ষে নিওফ্রয়েডিয়ানদের ধারণা, সত্তাবিযুক্তি প্রাথমিক, বিচ্ছিন্নতার ফল নয়। কারেন হর্নি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্যক্তির সংজ্ঞানসত্তা (কন্শাস্ সেল্ফ) যখন আদিসত্তা বা 'রিয়েল সেল্ফ'-এর সঙ্গে সংযোগ হারায়, তখনই আসে বিচ্ছিন্নতা। শ্রম-বিচ্ছিন্নতা আনুষঙ্গিক। বিচ্ছিন্নতা মূলত মানসিক ব্যাপার, সামাজিক নয়। অবশ্য সমাজ ইন্ধন জুগিয়ে বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাপ্ত ও ত্বরান্বিত করতে পারে। ফ্রমপ্রমুখ নিওফ্রয়েডিয়ানরাও ঐ একই মতের সমর্থক। তাঁরা বলেন, আত্মবিচ্ছিন্নতা[১০] সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে বলেই মানুষ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। সংজ্ঞান সত্তা সৃজনশীল সত্তা থেকে বিযুক্ত হওয়ার ফলেই আত্মশ্রম থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। সে নিজেকে অনেক বস্তুর একটি বস্তু বলে ভাবে ও অন্যকে নিজের মত বাজার-পণ্য মনে করে। কারেন হর্নি, এরিক ফ্রম ভাববাদে বিশ্বাসী। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানকে 'রিয়াল সেল্ফ', 'প্রডাক্টিভ পোটেনশিয়াল'

---

৮ Marx. K : Economic & Philosopical Manuscript, 1844 (1959)

৯ Keniston Kenneth : The Uncommitted : pp 463 "Paradoxically, for Marx as for most neo-Marxists, alienation begins to end with the awareness of alienation : only by awareness of alienation can a worker gain the "class consciousness" which will enable him to struggle to create a classless society when men will no longer be alienated from their labour."

১০ Fromm Eric : Marx, concept of Man (1941)

ইত্যাদি নতুন নামে আমদানী করেছেন, এইমাত্র। ফ্রম মার্কসবাদকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বরস-জারিত ও শোধিত করতে চেয়েছেন, আরও অনেক মার্কসিওলজিষ্টদের মত অনভিজ্ঞ পাঠককে বিভ্রান্তও করেছেন।

কেনিস্টন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছামূলক বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে শুধু 'য়্যালিয়েনেশন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে ব্যক্তি সমাজ থেকে নিজের ইচ্ছায় নির্বাসিত। এ-বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ব্যক্তি পুরোপুরি অবহিত। সে জানে সে সমাজকে পরিত্যাগ করেছে, সমাজ তাকে পরিত্যাগ করেনি। সে আউটসাইডার নয়। সে তার পরিবর্তন চায়; হয় সমাজের, না-হয় নিজের। এখানে সম্পর্কশূন্যতা বড় কথা নয়, সম্পর্করহিত করাটা আসল কথা। সে প্রতিবাদে মুখর। প্রতিবাদ সমাজ-সংস্কৃতির সবকিছু মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। অন্যান্য সবরকমের বিচ্ছিন্নতায় ব্যক্তি এক সম্পর্ক থেকে বিযুক্ত হয়ে অন্য সম্পর্কে সংযুক্ত। এখানে কেনিস্টনের এই ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা অন্য কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠবার সম্ভাবনা-রহিত। এই বিচ্ছিন্নতার মূলে আছে মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা কারণ।

এই বিচ্ছিন্নতা পুরণোর সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ বটে, কিন্তু সত্তার দ্বিখণ্ডিত অবস্থা নয়। সমাজের বাইরে থেকেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কে, সমাজের অন্য মানুষ সম্পর্কে আগ্রহী। সমাজকে আঘাত করবার ইচ্ছা ও প্রবণতা সেই আগ্রহের ফল। স্পষ্ট-মুখর প্রতিবাদের মধ্যেই যেন পূর্বতন সামাজিক সম্পর্ক অধিষ্ঠিত। এই বিরোধিতাকে একধরনের বিদ্রোহী মানসিকতা বলা যায়। ব্যক্তি-বিচ্ছিন্নতা বা সমাজবিরোধিতা একটা প্রতিক্রিয়া, যার মূলে আছে সমজের প্রতি দরদ। এ একটা প্রসারমান ভাবধারা, যার একপ্রান্ত বিরোধিতায়, বিচ্ছিন্নতায়; অন্যপ্রান্ত আত্মসংযুক্তির প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে বাধ্যতামূলক বশ্যতায় সংযুক্ত। এই বিচ্ছিন্নতার চরম প্রান্তিক পরিণতি দেখা যায় উন্মত্ততায়, সমাজবিদ্বেষমূলক নাশকতায় ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে। অননুগামিতা, মনোবিকার, সমাজসংস্কারের ইচ্ছা ও কাজ এই প্রসারমান মনোভাবের মৃদু ও মাঝামাঝি অবস্থা। অপর প্রান্তের পরিণতি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সংরক্ষণশীল মানসিকতায় বিপ্লব ও সর্বপ্রকার পরিবর্তন-বিরোধিতায়। দুই প্রান্তকে যদি বাম ও দক্ষিণ বলে চিহ্নিত করি, তবে মধ্যবিন্দুর দক্ষিণে থাকবে সাধু-সন্ত-ভালোমানুষেরা ও চিরাচরিত সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা।

শুধু বিচ্ছিন্নতার ডিগ্রী বা পরিমাপ দিয়ে বিচ্ছিন্নতার শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিসের থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ কিভাবে হচ্ছে—এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলে তবেই ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ হতে পারে। সমাজ-অনুমোদিত বিধিনিষেধ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আচরণের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে এবং সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সকল সমাজেই মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি থাকে। প্রতিটি নাগরিক সেই বিধি মেনে চলবে, এইটেই আশা করা হয়। এর অন্যথাচরণ অনেক সময়েই আইনভঙ্গ-জনিত অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। পুলিশ ও আইন-আদালতের সাহায্যে আইনভঙ্গকারীকে দমন করার চেষ্টা হয়। বলাবাহুল্য, সমাজের প্রধান শ্রেণীর সুবিধার্থে সামাজিক বিধিনিষেধ আইন-শৃঙ্খলা রচিত। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে অবশ্য অন্যথাচরণ ততটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে না, কেননা সাংস্কৃতিক ব্যাপারের আচরণবিধি ততটা সুনির্দিষ্ট নয়, এবং সাধারণত এই আচরণবিধি ভঙ্গ করা আইন-ঘটিত অপরাধ (ক্রাইম) বলে গণ্য নয়।

এই লেখকের মতে, প্রকাশভেদে বিচ্ছিন্নতা দুই ধরনের। এক এ্যালোপ্লাস্টিক, ব্যক্তি সমাজ পরিবর্তনে অভিনিবিষ্ট ; দুই, অটোপ্লাস্টিক, ব্যক্তি আত্মপরিবর্তনে আবিষ্ট।

বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞানির্ণয় করা না-গেলেও, এই সব তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা বিচ্ছিন্নতার অর্থ ও বিভিন্ন ধারার উপর আলোকপাত করেছে মনে হয়। বিচ্ছিন্নতা সব সময়ে ব্যাধি নয়, বিচ্ছিন্নতা কথাটি সব ক্ষেত্রে কলঙ্কবাচক নয়। বিচ্ছিন্নতার আলোচনা বর্জনীয় তো নয়ই, বরং এ-আলোচনায় উৎসাহ প্রদান উচিত। বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্নতাবোধে উদ্বুদ্ধ, এই সত্যকে স্বীকার করলে বিপ্লবকে হেয় করা হয় না। অনস্বীকার্য যে, বিপ্লবচেতনা ও বিপ্লবীর কর্মধারা অনেকাংশে বিপ্লবীর ব্যক্তি-মানসিকতা-প্রভাবিত। বিপ্লব তা বলে ব্যক্তিবিলাস নয়। আবার এও মনে রাখা দরকার যে, বিপ্লবীচিন্তার মধ্যে সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টর না-থাকলে বিপ্লবীদের মধ্যে মতভেদ, পথভেদ এত তীব্র হয়ে দেখা দিত না ; রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হবার পরও সাংস্কৃতিক বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে উঠত না। ব্যক্তি-মানসিকতার ও সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টরগুলোর উপর অতি গুরুত্ব প্রদান না-করে বিচ্ছিন্নতার বিচার ও আলোচনা, আমাদের মতে, বিপ্লবী-চেতনার তাৎপর্য অনুধাবনের সহায়ক।

ভারতীয় সমাজে বিচ্ছিন্নতা খুব নতুন কিছু নয়।

ভারতীয় সমাজ অচলায়তন বলে আখ্যাত হলেও এখানেও যুগে-যুগে বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটেছে, সমাজের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এসেছে। সংখ্যায় কম হলেও মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রীয় সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখা দিয়েছে। নিউরোটিক, সাইকোটিক, দুষ্ক্রিয়াকারীরা যেমন সমাজ-হিতৈষীদের উদ্বিগ্ন করেছে; তেমনি সনাতনধর্মের বিরুদ্ধে, পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে চার্বাক, মহাবীর, বুদ্ধের আক্রমণ স্থিতাবস্থাকামীদের মাঝে-মাঝে অস্থির করেছে। কুরুক্ষেত্রে মৌষলপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আত্মরক্ষাত্মক ভঙ্গীতে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে সনাতনধর্মকে সংস্কৃত ও পুনরুজ্জীবিত করতে হয়েছে। কর্মফলতত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর বর্ণাশ্রমকে সংস্থাপিত করা সত্ত্বেও, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাব ঘটেছে। আদিম পাপবোধের ধারণা সনাতনধর্মে না-থাকা সত্ত্বেও, আউলবাউলদের ধর্মাচরণ ও সঙ্গীতের মধ্যে[১১] অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটেছে। এই সেদিনও উনিশের দশকে ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা দেখা গেছে।

পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতার নানা চিহ্ন আজ সুস্পষ্ট। অবশ্য তার রূপ ও চরিত্র ভিন্নতর, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অন্যতর। শিল্পোন্নত দেশের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা এক নয়, তাদের বিচ্ছিন্নতার সমস্যাও এক নয়। তবে কতকগুলি সাধারণ-ধর্ম সবদেশের বিচ্ছিন্নতায় বর্তমান। সাহিত্যে নিঃসঙ্গতাবোধ, আদিম রিপুর অভিব্যক্তি; শিল্পে এ্যাবষ্ট্রাক্ট এক্সপ্রেসনিজম; নাটকে অস্তিবাদী নৈরাশ্যবোধ ও এ্যাবসার্ডিটি; গত দশক থেকে অন্য দেশের মত আমাদের এখানেও পরিলক্ষিত। তিন দশকের অধিককাল ধরে ভারতীয় ভাববাদ ও সনাতনী ঐতিহ্য মার্কসবাদী বিপ্লবী ধারণার আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। আক্রমণকারীরা নিঃসন্দেহে মূল ভারতীয় সংস্কৃতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রতি-বিপ্লবী ভাবধারা বর্তমানে তীব্রগতি আক্রমণমুখী। সংস্কৃতি ও রাজনীতি সমাজের এই দুটি রণাঙ্গনে প্রতিবিপ্লবীরা ব্যূহ-নির্মাণে তৎপর। অতীতমুখী জঙ্গী চিন্তা-ধারায় ভারতের তরুণদের একাংশ বেশ কয়েক বছর ধরে বিশেষভাবে প্রভাবিত।

---

১১ Martindale Don : Social Life & cultural change (1962) pp 233.

এই চিন্তাধারার ধারক-বাহকরা এই দক্ষিণী প্রতিক্রিয়াশক্তিধররা অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ও দৃঢ়সংকল্প। তুলনায় বর্তমানে বামপন্থীদের শিবির অবিন্যস্ত ও বহুভাগে বিভক্ত। অতি দ্রুত বিচ্ছিন্ন ও প্রতিবাদমুখর শক্তিদ্বয় দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তে সমাবেশিত। মধ্যবিন্দুতে দূরের কথা, মধ্যবিন্দুর সন্নিহিত দক্ষিণ বামে অবস্থানও আজ প্রায় অসম্ভব। তাই দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটছে, এক দল ভেঙে তিন দল হচ্ছে, নতুন দল সংগঠিত হচ্ছে। সর্বত্র অতিবাম ও অতিদক্ষিণে অপসরণের প্রবণতা অতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজব্যবস্থা কিশোর-তরুণদের কোনোভাবেই আর আকৃষ্ট করতে সক্ষম নয়; তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তাই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইকোটিক, নিউরোটিক ও দুষ্ক্রিয়াকারীর সংখ্যা (অটোপ্ল্যাস্টিক বিচ্ছিন্নতা) যেমন বাড়ছে, অতিবিপ্লবী ও অতি-প্রতিবিপ্লবী ছাত্র-তরুণের সংখ্যাও তেমনি বাড়ছে। অপকেন্দ্র বল তাড়িত হয়ে দেশের যুবশক্তি দুই বিপরীত মেরুতে সমাবিষ্ট হতে চলেছে। এই সমাবেশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এই দুই যুযুধান-শিবির খুব কম ক্ষেত্রেই মুখোমুখি সন্নিবিষ্ট। পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় অতি-বিপ্লবীরা শক্তিশালী, অন্যান্য অংশ অতিদক্ষিণীদের ঘাঁটি। কতকটা এই কারণে ও কতকটা কেন্দ্রাতিগশক্তির টানে, দক্ষিণবামে সংঘর্ষ যত না-হচ্ছে, তার থেকে বেশি সংঘর্ষ ঘটছে বাম ও দক্ষিণীদের নিজেদের মধ্যে। দিনে-দিনে প্রত্যাশিত ক্লাস-ওয়ারের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ইনট্রাক্লাস সিভিল ওয়ারের সম্ভাবনা অধিক হয়ে উঠেছে। অতিবামে অবস্থানকারীরা মধ্যবিন্দু ঘেঁষা প্রতিটি দল ও ব্যক্তিকে শোধনবাদী, প্রচ্ছন্ন প্রতিবিপ্লবী বলে অভিহিত করছে আর অতিদক্ষিণীরা মধ্য-বিন্দুর সান্নিধ্যকামীদের বামপন্থীদের এজেন্ট মনে করছে। দুই মেরুতে অধিষ্ঠিত দুই বিচ্ছিন্ন অভিযাত্রী ক্রোধান্ধ। নিজের সহযাত্রী তো দূরের কথা নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর নয়। তাই অনেক সময় দুরন্ত ক্রোধের আগুনে নিজেকে দগ্ধ করতে এদের আটকাচ্ছে না। কুরুক্ষেত্র ও মৌষলপর্ব আসন্ন কি? আত্মঘাতী এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে সত্যিকারের বিপ্লবের পথে পরিচালনা কি সম্ভব?

কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের স্কুল-কলেজে সমীক্ষা চালাতে হবে। ছাত্র-তরুণদের শৈশব-কৈশোরের ইতিহাস জানতে হবে। সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক—এই তিন দিক থেকেই গবেষণায় তৎপর হতে হবে। অনেক

সমীক্ষক-গবেষকদের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই গভীর ও সর্বস্তরে ব্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতার কারণ ও তাৎপর্য বোধগম্য হতে পারে।

বিচ্ছিন্নতার সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ বিপ্লবে, আর অসুস্থ প্রকাশ উন্মত্ততায় ধ্বংসকামিতায়। আরও ক্ষতিকর প্রকাশ প্রতিবিপ্লবে। বিপ্লবীও ধ্বংসকামী, তবে সে অর্থহীন ধ্বংস চায় না। নতুন সৃষ্টির জন্য ধ্বংস চায়, অভিজ্ঞ অস্ত্রোপচারে সে সমাজের দুষ্ট ক্ষত বাদ দিতে চায়; যদিও প্রতিবিপ্লবীর সঙ্গে মোকাবিলার মুখে অনেক সময় সৃষ্টির কথা তার মনে থাকে না, সৃষ্টিচিন্তার সুযোগ থাকে না। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ধ্বংস চায় কেন? আগেই বলেছি, সমাজ তার প্রত্যাশা পূরণ করেনি বলেই সে বিচ্ছিন্ন। সমাজ নিরাপত্তাদানে অসমর্থ, সমাজ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ, সমাজ অন্যায়-অবিচারে আচ্ছন্ন। তাই সে সমাজ-বিরোধী, তাই সে বিচ্ছিন্ন। তার মনের গোপন কোণে হয়ত নিহিত আছে বিস্মৃত শৈশবের কোনো ব্যর্থতার করুণ অথবা কোনো বঞ্চনার নিষ্ঠুর ইতিহাস। তাই সে সমাজের প্রতি অপ্রসন্ন। প্রত্যাশা অনেক, তাই ব্যর্থতার জ্বালাও তীব্র। শিশু অনেক সময় ব্যর্থতার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের সব থেকে প্রিয় বস্তুর উপর আঘাত হানে, নিরাপত্তার অভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে দশনাঘাতে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরণ অনেকটা শিশুর মত হতে বাধ্য, যদিনা বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয় বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ-উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী চেতনা। অবশ্য স্বীকার করা উচিত যে, বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লবেও অনেক সময়, সুনিয়ন্ত্রণের অভাবে অবাঞ্ছিত ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ক্রোধ ও ঘৃণার ব্যাখ্যায় অন্তর্নিহিত জন্মগত শাশ্বত রিপুতত্ত্বের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন দেখি না। সমাজে ঘৃণা ও রোষের প্রকাশ শিশু জন্ম থেকেই বয়স্কদের মধ্যে দেখে ও নিজের ব্যর্থতা সেইভাবে প্রকাশ করতে শেখে; এই ব্যাখ্যাই বোধহয় যথেষ্ট। ব্যর্থতা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে ধ্বংস-ইচ্ছা। কিশোরের ক্ষোভ ক্রোধ দুশ্চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে মারওয়েল[১২]

---

১২ Marwell, G : Adolescent powerlessness and Delinquent Behaviour. "Social Problems" 1966, 64, 35-47 (quoted in Social Issues : Spring 1969) "Adolescents are specially powerless, having lost their childhood

বলেছেন, শৈশবান্তে কিশোররা নিজেদের বিশেষ অক্ষম শক্তিহীন মনে করে, তাই নিজেকে জাহির করতে চায় ক্ষোভ ক্রোধ ও দুষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে। বিচ্ছিন্নতার এই ক্রোধ ও ঘৃণা আদর্শ-অনুপ্রাণিত বিপ্লবীর বেলায় নির্দিষ্ট নিশানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। সমাজের কোন স্তম্ভে ফাটল ধরেছে, আগাছা জন্মেছে, কোথায় আঘাত করলে অভীষ্ট লাভ হতে পারে,—সব তার জানা, তার কার্যক্রম পূর্ব-পরিকল্পিত। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করার ইচ্ছা পোষণ সে করে না। বিচ্ছিন্নতার ক্রোধ ঘৃণা সঠিক পথে পরিচালিত না-হলে, কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক কার্যে পর্যবসিত হলে, আর যাই হোক, বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় না। পূর্বপরিকল্পিত আদর্শাশ্রিত সমাজ গড়ে তোলার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। বিপ্লবের বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিপ্লবের আদর্শ অনুধাবন বিপ্লবী মাত্রেরই প্রাথমিক কর্তব্য। না-হলে, ব্যর্থতার সম্ভাবনা সমধিক; ব্যর্থবিপ্লব প্রতিবিপ্লবের সহায়ক।

বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেয় যারা, তাদের মধ্যে সকলের বিজ্ঞানচেতনা ও আদর্শনিষ্ঠা থাকে না। সংখ্যায় অধিক হলে, বিপ্লবকে তারা বিপথগামী করতে পারে। বিপ্লবেচ্ছার মধ্যে নিজের স্যাডিজম্ বা ধ্বংসকামিতা পরিপূর্ণ করার অভিলাষ লুক্কায়িত থাকতে পারে। কিছুসংখ্যক জায়মান উন্মাদরোগগ্রস্ত বিপ্লবের পথে এসে নেতৃত্বের সুযোগ পায় যদি, বিপ্লব শুধু হত্যা ও রক্তপাতের ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। ধ্বংস, হিংসা, রক্তপাত বিপ্লবে অপরিহার্য হলেও, কোনো প্রকৃত বিপ্লবী অযথা হিংসা বা ধ্বংসে বিশ্বাসী নয়। বিপ্লবের অতি-উত্তেজনায় অনেক সময় দুর্বলমনা বিপ্লবী হিষ্টিরিয়া এবং প্যারানইয়াগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। ভ্রান্ত পথে পরিচালিত বিপ্লব নেতাদের অযথা নিষ্ঠুর ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত করে তুলতে পারে সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার সুস্থ বলিষ্ঠ প্রকাশ অসুস্থ উন্মত্ততায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

আজকের তরুণ-মানসে প্রজ্বলিত বিপ্লবানল ঠিক মত নিয়ন্ত্রিত হলে সমাজের আবর্জনা ও রোগজীবাণুকে দগ্ধ করে পূত সুস্থ নতুন সমাজের আবির্ভাব ঘটাতে

---

prerogatives of having others to do for them and not yet having gained the adult power to do for themselves.
"Classic delinquent acts are part of active responses to this situation."

পারে, আবার অন্যথায় এই আগুনে সদসৎ সবকিছু ভস্মীভূত হতে পারে। এই যৌবনজলতরঙ্গ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রবাহিত হলে সব ক্লেদমালিন্য দূরীভূত হবে, অন্যথায় এই প্রলয়োচ্ছ্বাসে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বিপ্লবকে সফল করার দায়িত্ব আজ শুধু কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নয়, দায়িত্ব অগণিত জনগণের। বিপ্লবীর বিচ্ছিন্নতা ও উন্মাদের বিচ্ছিন্নতার পার্থক্য তাঁদের জানা দরকার।

১৭

শিক্ষা ও বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে

পশ্চিমী দুনিয়ার শিক্ষাসঙ্কট সংস্কৃতিসঙ্কটের জটিলতা তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে। গত দশবছরে এ-নিয়ে এত লেখা হয়েছে, যা পড়ে শেষ করা একজনের পক্ষে বিশ বছরেও সম্ভব নয়। কিছু-কিছু পড়েছি। যা-পড়েছি তার মধ্যে বিবরণের খুঁটিনাটি যে-পরিমাণে আছে, সে পরিমাণে কারণ নির্ধারণের চেষ্টা নেই। কার্যকারণ অনেক সময় জট পাকিয়ে গেছে। প্রায় সবাই বিশেষ জোর দিয়েছেন একই ধরনের কয়েকটি বিষয়ের ওপর। এ-যুগের ছেলেরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাপদ্ধতিতে আস্থা হারিয়েছে। এবং অতীতের সংস্কৃতিতে বা কোনো কিছুতে তাদের আর তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। সব থেকে বিরূপ তারা ক্রমোচ্চশ্রেণী-বিভাগভিত্তিক কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই 'হায়ারার্কিকাল অথরিটি' স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পার্টি কলকারখানা সরকার ইত্যাদি সবকিছুরই মাথার উপর চেপে বসে আছে। ডেমোক্রেসীর প্রধান অঙ্গ বুরোক্রেসী। গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করার পরিবর্তে জোরদারই করেছে; তাদের মূলমন্ত্র নিয়ম-শৃঙ্খলা, তারা চায় ধাপে-ধাপে পরিবর্তন। আর আজকের নবীনরা চায় আশু ও অবিলম্ব পরিবর্তন। তাদের "রিভোলিউশন অব ইমিডিয়েসী"র সঙ্গে বিরোধ বেধেছে কর্তৃপক্ষের "ইভোলিউশন অব গ্রাজুয়ালিজ্‌ম্‌-এর। এর

সঙ্গে আরো বলা হচ্ছে ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত অবস্থার কথা, সংবাদ-বিস্ফোরণের কথা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিপ্লবের কথা। এছাড়া আমাদের মত দরিদ্র দেশে আছে অর্থাভাব ও অন্যান্য অবস্থার কথা। তাপপারমাণবিক যুদ্ধের গুরুত্ব আগের তুলনায় কম আলোচিত হচ্ছে। বরং বাতিল করা অনিশ্চয়তাবাদ (পরমাণুরাজ্যের অরাজকতা) অসঙ্গতিবাদতত্ত্বের কথা বেশি শোনা যাচ্ছে। বর্তমান পুরুষ এইসব তত্ত্বদ্বারা বিশেষভাবে অভিভাবিত; সেই জন্যে অস্থিরচিত্ত ও অসঙ্গত কাজে লিপ্ত; এই ধরনের লেখা বেশি নজরে পড়ছে। এ-সবই প্রায় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষাসঙ্কটের মৌলিক কোনো কারণ নির্দেশের চেষ্টা ততটা দেখছি না, যতটা দেখছি কমিশন কমিটির রিপোর্টের মধ্যে সঙ্কটত্রাণের আশু উপায়নির্দেশ ও সুপারিশ। এইসব প্রায়োগিক প্রয়াসের প্রয়োজন অস্বীকার করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সঙ্কট অনুধাবনের চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁদের বেশিরভাগ সেই মামুলি ঈদিপাস কমপ্লেক্স, ফ্রাসট্রেশন-অ্যাগ্রেসন, ইরোস্‌-থ্যানাটস্‌ ইত্যাদি আলোচনার গণ্ডীতেই নিবদ্ধ থেকেছেন; অথবা যন্ত্রযুগের অটোমেটন-মানসিকতা দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার মাত্রা দিয়ে শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্কট পরিমাপ করেছেন কিছু দার্শনিক পণ্ডিত। তার মধ্যেও মৌলিকতা বা নতুনত্বের সন্ধান পাইনি। মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের সাহায্যে সঙ্কটের মূলে পৌছুবার চেষ্টা করেছেন একজন, তাঁর লেখা আমাকে বেশ কিছুটা আকৃষ্ট করেছে। তাঁর পন্থা অনুসরণ করে শিক্ষাসঙ্কটের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।*

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা ফর্মাল এডুকেশনের সঙ্কট নিয়েই আমরা ভাবনা-চিন্তা করে থাকি। কিন্তু শিক্ষাকাল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিব্যাপ্ত। প্যারাসেলসাশের মতে সারাজীবনই শিক্ষাজীবন; কিছু না-শিখে আমরা দশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকি না। সঙ্কটের আলোচনা শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে, সঙ্কটের কারণ বা সমাধানের নির্দেশ, কোনো কিছুরই হদিশ মিলবে না। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আমলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা চালু হয়েছে এবং শিক্ষার মধ্যে ব্যবসাদারী মনোভাব আমদানী হয়েছে। আমাদের

* মেসজারোস

দেশে বর্ণাশ্রমের নিগড়ে বাঁধা সমাজব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগী বর্ণেরই সুযোগ ও অধিকার ছিল গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যায়নের বা সাধারণ শিক্ষার। অন্য বর্ণের ছেলেরা শৈশব থেকেই পারিবারিক বৃত্তির শিক্ষা লাভ করত জ্যেষ্ঠদের কাছে। মাঝে-মাঝে নিয়মভঙ্গ বা ব্যতিক্রম যে ঘটত না, এমন নয়। বেদপাঠের স্পর্ধার জন্য শুদ্রকে গর্দান দিতে হয়েছে, গুরুপ্রত্যাখ্যাত হয়েও গুরু-বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য নিজের বুড়ো আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছে অধ্যবসায়ী ছাত্রকে। কিন্তু অচলায়তনে তার জন্যে বিশেষ চিড় ধরেছে বলে শোনা যায় নি। শিক্ষা-ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যখণ্ডে চার্চের বাইরে ইতরসাধারণ জীবিকা অর্জনের যে-শিক্ষালাভ করত, তার সঙ্গে তাদের তাদের জীবনের যোগাযোগ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে যে-শিক্ষা ও সংস্কার আয়ত্ত করত মানুষ, তাই দিয়ে সে প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে আপোষ-রফা করে কোনোমতে চালিয়ে যেত। শিক্ষাব্যাপারে রাজারাজড়াদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ঘটত শুধু কিছুসংখ্যক আমলা কর্মচারী গোমস্তা সংগ্রহের জন্য। শিক্ষা ব্যাপারটা ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ও গুরুকেন্দ্রিক। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা ও আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে ওদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটল। এনিয়ে দস্তুরমত চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল। গির্জা কিম্বা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকলে উৎপাদক ও রাষ্ট্র-নায়কদের চলে না। পণ্যউৎপাদন, হিসাবরাখা, বিক্রয়ব্যবস্থা, ইত্যাদির জন্য নতুন ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর নির্ভর করে যে-শ্রেণীসমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠল, শিক্ষার চাহিদা তার দিন-দিন বেড়ে চলল। প্রকৃতিবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ঘটতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার দর্শন-মনস্তত্ত্বের দরকার হয়ে পড়ল। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে নবজাগরণের চমকলাগা মানুষ ইউটোপিয়া-স্বপ্নে বিভোর হয়ে উদার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিকল্পনা করল, ব্যক্তিমুক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মেতে উঠল। শিল্পসাহিত্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাপ্রসারে আগ্রহী সবাই। রাষ্ট্র ও সমাজ ক্রমশ নিজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শ্রেণীসমাজের নিজস্ব নিয়মে শিক্ষাসংকোচনের দরকার দেখা গেল। 'উদবৃত্ত মূল্যের' সমাজে জমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ শহরে-নগরে জীবিকার্জনের আশায় ভিড় জমাতে লাগল। শ্রমিকের চাহিদার চেয়ে

জোগানের স্রোত বেড়ে চলল। শিশু-শ্রম ও অদক্ষ শ্রমে মুনাফা কম হয় না। কাজেই উদার বুর্জোয়া সমাজে সার্বজনীণ ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। জীবিকার তাগিদে কোনোরকম শিক্ষাছাড়াই এরা যন্ত্র-সেবক হয়ে পড়ল। দক্ষ শ্রমিকদের অবস্থাও অনুরূপ। এ-সব ঘটল আঠারো শতকের মাঝামাঝি। এ্যাডাম স্মিথের মত নির্ভেজাল মুনাফা-উৎসাহী লোককেও বলতে হল যে, বুর্জোয়া সমাজের 'ডিভিশন অফ্ লেবার'-এর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। "On the one hand, it impoverishes man to such an extent that one would need a special educational effort to put things right. But no such effort is forthcoming. On the contrary—and this is the second aspect of the negative impact....education—since the division of labour simplifies in an extreme form the work processes, it largely diminishes the need for a proper education, insted of intensifying it." একটা যন্ত্রের অংশবিশেষের সঙ্গে পরিচিতিই শ্রমিকের পক্ষে যথেষ্ট, একটি বিশেষ ধরনের পেশী সঞ্চালন, যন্ত্রটিকে চালু রাখে। কাজের সময় তার সমস্ত মন ঐ বিশেষ অপারেশনটির প্রতি নিবদ্ধ থাকছে, অন্যদিকে তার মন দেবার অবকাশ নেই। সে যখন গ্রামীণ পরিবেশে স্বাধীন কারিগর হিসেবে কাজ করত, তাকে অনেক কিছু ভাবতে হত, সমস্যার সম্মুখীন হলে নিজেকেই সমাধান করতে হত, কাজেই তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ঘটত। কারখানার দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকের সেই প্রসার ঘটার সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গেছে। মালিকের প্রয়োজন মত ন্যূনতম শিক্ষা নিয়েই তাকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে। একটা আলপিনের সাতভাগের একভাগ বা একটা বোতামের দশভাগেরও কমের দিকে যার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকছে দিনের পর দিন, তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কুচিত, চিন্তাভাবনা সংকীর্ণ হতে বাধ্য। শিক্ষা সম্পর্কে তার অনীহা স্বাভাবিক। জীবন সম্পর্কে তার কৌতূহল অনাবশ্যক। এইভাবে মার্কস-বর্ণিত বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হতে থাকে। শ্রম থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রথম পর্বেই শিক্ষা সম্পর্কে নিস্পৃহতা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল। এ্যাডাম স্মিথের কথাতেই বলি : "The minds of men are contracted, and rendered incapable of elevation. Education is despised, or at least neglected,

and heroic spirit is almost utterly extinguished." এইসব কিশোর শ্রমিক শুধু যে শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাই নয়, তারা পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অল্পবয়সে রোজগার করতে পারার ফলে অনায়াসে পিতার কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল এবং অবসর বিনোদনের জন্য সুরাসক্ত হয়ে পড়েছিল। এ্যাডাম স্মিথ অবশ্য ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ববিরোধ যে এইসবের জন্য দায়ী, সে-রকম কিছু মনে করেন নি। সমসাময়িক অন্যান্য নীতিবাগীশদের মত এইসব ব্যাপারকে ব্যক্তিগত চরিত্র-স্খলন বলে মনে করেছিলেন। রবার্ট ওএনের মত ইউটোপিয়ান প্রগতিবাদীও ভেবেছিলেন শ্রমিকদের ও মালিকদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আবেদন জানালেই বুঝি শিক্ষা-সমস্যার সমাধান ঘটবে। "It is confidently expected that the period is at hand when man through ignorance, shall not much longer inflict unnecessary misery on man; because the mass of mankind will become enlightened, and will clearly discern that by so acting they will inevitably create misery to themselves." পুঁজির নিজস্ব নিয়ম যে মানুষকে মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে, অমানুষ করছে, মার্কসই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এ্যাডাম স্মিথ ও রবার্ট ওএন অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন, নীতিশিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা না-পেলে সমাজের শোষিত মানুষ একদিন হিংস্র আক্রমণে সমাজের ভিৎ টলিয়ে দেবে। কিন্তু তাঁদের উদারনীতিক আবেদন-নিবেদন, শিক্ষাসংস্কারের সব চেষ্টা বিচ্ছিন্নতাপ্রবণতাকে আঠারো শতক উনিশ শতকেই রোধ করতে সক্ষম হয় নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শিক্ষা আরো 'কমার্শিয়াল' হয়ে উঠতে থাকে। তবু সে-সময় বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের উচ্চশিক্ষার মধ্যে অনেকখানি সর্বাঙ্গীণতার সম্ভাবনা ছিল। 'হারমোনিয়াস', 'মেনিসাইডেড্ ডেভলপমেণ্টের' কথা শোনা যেত সেই 'লেইসে ফেয়ার' যুগে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ তৈরীর কাজে প্রধানত নিযুক্ত। আঠারো শতকে কারখানার শ্রমিক যে-একমাত্রিক শিক্ষা পেয়েছে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেরা অনেকটা সেই ধরনের শিক্ষাই পাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগীয় অধ্যক্ষদের (ডীন) ভাণ্ডারে জ্ঞানের পাত্র আলাদা-আলাদা করে রাখা আছে। এক ডীন অন্য ডীনের জমানো জ্ঞানের

খবর রাখেন না। মেট্রোপলিসের অধিবাসীর মত পাশের বাড়ীর লোকদের সম্বন্ধে উদাসীন। প্রত্যেকের ভাষা, সঙ্কেত, প্রতীক আলাদা। "We are all aware of the disintegration of thought and knowledge into an increasing number of separate systems, each more or less self-contained with its own language, and recognising no responsibility for knowing or caring about what is going on across its frontiers....The story of the Tower of Babel might have been a prophetic vision of the modern university; and the fragmentation which is spotlighted there affects the whole of society." আজকের উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সীমিত, সঙ্কুচিত ও ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করছে। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে বিচ্ছিন্নীকরণের উপাদান। এটা সঙ্কটের একটা দিক। আমার মতে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে অন্য দেশের—বিশেষ করে আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিকরা অনেকেই আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা, আগেই বলেছি, প্রচুর তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথ এবং রবার্ট ওএনের মতই তাঁরা আবেদন-নিবেদনের উপর নির্ভর করেছেন। টুকরো-টুকরো সুপারিশ করেছেন। সর্বাত্মক পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন নি। আবার সবভাঙার দল বা ইকনোক্লাষ্টদের সঙ্গে যাঁরা সুর মিলিয়েছেন, তাঁরা পরোক্ষে সংরক্ষণশীলতাকেই জোরদার করেছেন। অস্তিবাদ অথবা প্রয়োগবাদ, এক্‌জিসটেনশিয়ালিজম বা প্র্যাগম্যাটিজম-এর মধ্যেই সবাই ঘুরপাক খেয়েছেন। কেবল মেসজারোস মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের প্রয়োগে শিক্ষাক্ষেত্রের অরাজকতা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এবং মনে হয়, সক্ষমও হয়েছেন।

কেন প্রাচুর্যের দেশের জুনিয়ার ফ্যাকালটির ছেলেরা—যাদের অবস্থা ভালো, ভবিষ্যৎ নিরাপদ—বাঁয়ে ঝুঁকেছে? এ-নাকি এমন একটা ধাঁধা, যার কোনো উত্তর নেই। কথাটা বলেছেন, আমেরিকার একজন নাম-করা বুদ্ধিজীবী। আর একদল ভাবছেন, ওদেশে এবং এদেশেও কয়েকজন মাত্র দুষ্ক্রিয়কারী, এ্যাকাডেমিক ঠগীরা এইসব অরাজকতার জন্য দায়ী। তাদের শায়েস্তা করতে পারলেই নাকি সংকটের অবসান ঘটবে। একটু-আধটু অব্যবস্থা শিক্ষাব্যাপারে আছে,

তাঁরা স্বীকার করেন। তবে সেটা এমন কিছু নয় যার জন্যে ছাত্ররা, কখনও-কখনও অধ্যাপকরাও, অনাচার-অরাজকতার সৃষ্টি করে নিজেদের হাতে সব কিছুর দায়িত্ব নেবার আবদার করবে। হ্যাঁ, ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, গবেষণার সুযোগ কমেছে, কিন্তু তার জন্যে কি বলা চলে শিক্ষাব্যবস্থা অচলঅবস্থায় পৌঁছেছে? মেসজারোস কিন্তু মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশের প্রায় সব বিশ্ব-বিদ্যালয়েই গোলমাল, বিশৃঙ্খলা চলেছে, শিক্ষাসঙ্কট চরমে উঠেছে। তবে এই সঙ্কট এই দেশ বা ঐ দেশ, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ বা কেন্দ্রীভূত নয়। তাঁর মতে, এই সঙ্কট সর্বব্যাপী। সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ এই সঙ্কট। "To day's crisis is not that of some educational institution but the structral crisis of the whole system of capitalist interiorization."

মেসজারোস উল্লিখিত "ইনটেরিয়রিজেশন" কথাটির তাৎপর্য না-বুঝলে, আমরা বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসংকটের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারব না। শুধু উৎপাদন বণ্টন প্রণালীর কথা জানলেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থার স্বরূপ জানা যায় না। উৎপাদন বণ্টনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, এমন অনেক লোকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোনো সমাজ ব্যবস্থা টিঁকে থাকতে পারে না। সমাজের সুস্থিতির জন্য এই ধরনের সক্রিয় সহযোগী তৈরী করার কাজ অতি-আবশ্যক। নিজের জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় যাদের সব শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হয় না, তারাই শুধু এমনি কাজে এগিয়ে আসতে পারে। অথবা ভেতর থেকে সমাজকে টিঁকিয়ে রাখার কাজই তাদের জীবিকা হতে পারে। শিল্পী, সাহিত্যিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, শিক্ষক সাধারণ ভাষায় যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলি—তারা সকলেই সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে কমবেশি জড়িত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও এরা জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, মানে স্কুল-কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় একইরকম শিক্ষা লাভ করেও এরা বিভিন্ন ধরনের মত ও পথের সমর্থক হতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পণ্যপূজা, শোষণভিত্তিক সামাজিক সম্পর্ক, এদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আপনা থেকে টিঁকে থাকতে পারে না। একদিকে শোষক শাসক এবং অন্যদিকে শোষিত শাসিত, বাইরের জগতের এই দুই বিপরীত স্বার্থের সংঘাত সব সময়ে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ

করতে পারে না বা করে না, আমরা জানি। যতদিন বেশিরভাগ সাহিত্যিক দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, ন্যায়-অন্যায়ের বিশ্লেষণ, নীতিনির্ধারণ ও মূল্যায়ন পুঁজিবাদের সপক্ষে থাকে, ততদিন বাইরের চাপ সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় থাকে। মেসজারোসের ভাষায়—"They succeed in this only because the particular individuals "interiorize" the outside pressure." যতদিন আনুষ্ঠানিক এবং বাইরের শিক্ষার মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত, যতদিন প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত। সমাজে অনুশীলিত (practised), মূল্যবোধ নীতিবোধের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ধরা না-পড়ে, যতদিন বহুসংখ্যক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীকে সমাজব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে কোনোরকমে সংযুক্ত রাখা যায়, ততদিন সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে না, সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভাব্যের পর্যায়ে থাকে। মেসজারোসের মতে আজকের বুদ্ধিজীবী এবং হবু বুদ্ধিজীবীর অধিকাংশই পুঁজিবাদী আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারছে না। বিচ্ছিন্নতার কেন্দ্রাতিগ শক্তির চাপে সমাজের অভ্যন্তর থেকে বাইরে চলে আসছে। প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত নীতির পার্থক্য ধরা পড়েছে, আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাচ্ছে না। মিলিটারী-ইনডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ বলে চালানো যাচ্ছে না। শিক্ষার সব বিভাগেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাসঙ্কটকে বৃহদায়তন পটভূমির মধ্যে না-আনলে সঙ্কট-সমীক্ষা সম্ভব নয়। "Formal education is closely integrated in the totality on the social process, and even as regards the particular individual's consciousness, its functions are judged in accordance with its identifiable *raison d'etre* in society as a whole." আমরা 'আইস-বার্গের' জেগে-থাকা দশভাগের একভাগ চূড়াটুকুই দেখতে পাচ্ছি, ডুবে-থাকা নয়ভাগ চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। সামগ্রিক সঙ্কটের অংশবিশেষ থেকে অনুমিত হচ্ছে যে, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর উৎপাদন সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা বিলোপে আগের মত আগ্রহী নয়; অথবা বলা চলে যে, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা আর 'সোশ্যাল এনজিনীয়ারিং' 'মরাল রিঅ্যারমামেণ্ট' ইত্যাদি প্রক্রিয়া দিয়ে মেরামত করা চলছে না। মেসজারোস মনে করেছেন, "Thus the "contestation"

of education in this wider sense, is the greatest challenge to capitalism in general, for it directly affects the very process of "interiorization" through which alienation and reification could so far prevail over the consciousness of the individuals."

একসময় শিক্ষা এবং বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির যে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল, আজ সে-প্রয়োজন আর নেই। 'ইনটেরিওরিজেশনের' কাজে আর তাদের সার্থকভাবে লাগানো যাচ্ছে না। এখন অর্থনৈতিক কারণে বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করা হচ্ছে। মেসজারোসের ভাষায়ঃ বুদ্ধিজীবীর উৎপাদন প্রয়োজনাতিরিক্ত হবার ফলে সঙ্কটের তীব্রতা বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার চেতনা ও সেই চেতনার প্রসার উপলব্ধি। শিক্ষাক্ষেত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে গবেষণা বিভাগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবপ্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে। তাছাড়া অর্থনীতির সম্প্রসারণ স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিজীবির সংখ্যা বাড়াচ্ছে। পুঁজি-বাদে এই অর্থনীতি বনাম রাজনীতির দ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। আশু ও তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জনের স্বার্থে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের কার্যক্রম স্থির করে; আর রাষ্ট্র বা রাজনীতি ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুঁজিবাদী সমাজের সাধারণ স্বার্থে অবাধ ব্যক্তিগত মুনাফা-অর্জন-প্রবণতাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। প্রায়ই আর্থনীতিক স্বার্থের কাছে রাজনীতিক স্বার্থের পরাভব ঘটে, বিচ্ছিন্নতা ও পণ্যপূজা-প্রবণতার ব্যাপকতা পুঁজিবাদের পক্ষে মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও, বুদ্ধিজীবির অতি-উৎপাদন ক্ষতিকারক জেনেও আমেরিকার ধনকুবেররা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছে না। মেসজারোসের মতে আমেরিকার একচ্ছত্র পুঁজিবাদ অজস্র সমস্যাপীড়িত এবং জাতিক ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ঠিকমত পারছে না। শিক্ষাসংকট দূর করার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা অরাজকতা অব্যবস্থার অন্ত নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে পুরণো দিনের শিক্ষা-কঠোমোর অসঙ্গতির ফলশ্রুতি। এ-যাবৎকালের শিক্ষা-সংস্কার পুরণো কাঠামোকে কোনোরকমে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে দু'একটা কড়ি-বরগা পাল্টে, দু-এক পোঁচ কলি ফিরিয়ে। সর্বাঙ্গীণ সুপরিকল্পিত

পরিবর্তনের চেষ্টা কোনোদিনই হয়নি। ছ'বছরের আগে কোঠারী কমিশনের রায়ে যে-সুপারিশ ছিল,—যাকে কোনোমতেই বৈপ্লবিক বলা চলে না—সে-সুপারিশগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারেও সরকারী আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব রয়েছে। বিরোধী বামপন্থীরা গত পঁচিশ বছর ধরে সমালোচনা যতটা করেছেন, তার সবটাই প্রায় নেতিবাচক। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে ৬৭-৭১ সালের মধ্যে স্কুল-কলেজ আক্রান্ত হয়েছে, পরীক্ষা স্থগিত থেকেছে, পঠনপাঠন বন্ধ থেকেছে। কয়েকজন মাত্র ছেলে পাঁচ-সাতশো ছেলে-ভর্তি স্কুল-কলেজ-গুলোতে ঢুকে দুটো বোমা ছুঁড়ে অথবা পিস্তল দেখিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছিল। কি করে এটা সম্ভব হল? মাও-গুয়েভারা-মরিঘেলার মন্ত্র-শিষ্য হবার জন্যেই কি পাঁচজন পাঁচশোর সমান হয়ে উঠেছিল? কেন নেতৃ-স্থানীয়রা শিক্ষা সম্বন্ধে গঠনাত্মক কোনো পরিকল্পনা বা কাজকর্মে এগিয়ে আসেন নি বা সহযোগিতা করেন নি? সমাজের নেতারা, শিক্ষকরা, অন্য ছেলেদের দলবদ্ধ করে ধ্বংসের কাজে, মূর্তি ভাঙা, স্কুল পোড়ানোর কাজে বাধা সৃষ্টির কোনো আন্তরিক চেষ্টা করেছেন কি? কিছু শিল্পী-সাহিত্যিক বরং বাঙালী ছেলেদের ক্লীবত্ব দিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভরা রসালো গল্প লিখে বাহবা কুড়িয়েছেন। বলা হয়েছে, এসব সমাজবিরোধী স্বল্পসংখ্যক আরবান গেরিলার কাজ। জন-সাধারণ নিষ্ক্রিয় এবং ভীরু, তারা সরকারকে ও সরকারী রাইফেলধারী পুলিশকে সাহায্য করছে না। এই ধরনের অভিযোগ আমরা শুনেছি ও পড়েছি। এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা কেউ করেছেন বলে শুনি নি। য়্যান্টি-সোশ্যাল সমাজদ্রোহীরা নক্শালদের ছত্রছায়ায় স্থান পেয়ে রাতারাতি অপ্রতিরোধ্য দুর্মদ হয়ে উঠল কি করে? এর ব্যাখ্যা দিতেও কেও এগিয়ে আসেন নি।

আমাদের দেশের শিক্ষাসঙ্কটের বিচারে আমেরিকার বা অন্য কোনো দেশের তুলনা টেনে আনার উদ্দেশ্যে আমি মেসঙ্গারোসের বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই নি। কোনোদিক দিয়েই আমেরিকার সমস্যা আমাদের সমস্যা নয়। তবে আমার ধারণা, আমাদের শিক্ষাসঙ্কটের আলোচনায় বিচ্ছিন্নতা-সমস্যা অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এই কলকাতা শহরে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করা হয়। বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, জমিদারের শহরবাসী নন্দনরা, যাঁরা দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তাঁরাই ইংরাজী শিক্ষার দৌলতে দেশজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশের মানুষ থেকে আরো দূরে সরে

গেলেন। তার ফলে আমরা নাকি পেলাম বঙ্গীয় রেনেসান্স। উনিশ শতকের ইয়ং বেঙ্গলের মানসিকতা আজকের 'হাংরী এ্যাংরী জেনারেশনের' মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সময়ের ব্যবধানের দরুন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পার্থক্য এসেছে, এই যা। 'বায়ুভূতোনিরাশ্রয়' সেই বিচ্ছিন্ন পূর্বসূরীদের থেকে আজকের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অনেকেই আরো বেশি বিচ্ছিন্ন। জনসংযোগহীন ইংরাজীনবীস বুদ্ধিজীবীদের ক্লৈব্য কদাচার নৈতিক অধঃপতন তাদের সন্তানদের মধ্যে শুধু অশ্রদ্ধা নয়, ক্রোধেরও সঞ্চার করছে। তারা বুঝতে পারছে, তাদের সঙ্গে দেশের আশীজন ইংরাজী না-জানা গ্রামীণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, আবার এও বুঝতে পারছে শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষাচক্রে যুক্ত থেকেও তাদের শতকরা নব্বই জন কোনো-দিনই শোষণ-শাসনের ভাগীদার হতে পারবে না। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার কি, তারা জানে না। তাই কোনোসময় শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে তছনছ করতে চাইছে, কখনও বা এই অবস্থার মধ্যে থেকেই লেখাপড়া পরীক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই একটা হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার করে তুলছে। মোট কথা, শিক্ষাযন্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়,—আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতিটাকেই তারা নিজের বলে মনে করতে পারছে না। আর জীবন থেকে, সমাজ থেকে শেখবার সব উপায় সব পথ, পিতাপিতামহদের কৃপায় অনেকদিন আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার মনে হয়, 'ইয়ং বেঙ্গলের' ইংরাজী শিক্ষিত উত্তর-পুরুষরা শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা নয়, সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, সমাজ থেকে, জীবনস্রোত থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শিক্ষায়তনের উপর তাদের কোনো দরদ নেই, শিক্ষার উপর তাদের আস্থা নেই, কোনো কিছুতেই মূল্য আরোপ করার প্রবৃত্তি নেই। মূল্যমণ্ডিত বা আদর্শান্বিত কোনো কিছুর জন্যে প্রাণ দেবার মত ছেলেমেয়ের অভাব এদেশে এখনো ঘটে নি। অভাব ঘটেছে মূল্যবোধের, ভেঙে পড়েছে ভাবাদর্শ, লুপ্ত হয়েছে ভাবকল্প, ইমেজ। বেড়েছে শুধু বস্তির সংখ্যা, উদ্বাস্তুর সংখ্যা, নিরক্ষরের সংখ্যা, নিরন্নের সংখ্যা। দাঙ্গা মন্বন্তর দেশ-বিভাগের ফলে বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়াই বেড়েই চলেছে। দেশব্যাপী যে-অনন্বয় দেখা দিয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে তারই ভগ্নাংশের মাত্র প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাব্যবসায়ী ও শিক্ষাপরিচালকরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরবিদ্বিষ্ট এবং দেশের মানস ও মর্মবাণীর সঙ্গে এদের কারুরই কোনো

হার্দিক যোগাযোগ নেই। আর যাদের আমরা য়্যান্টি-সোশ্যাল, সমাজদ্রোহী, ডেলিংকুয়েন্ট, পারভার্ট ইত্যাদি নামে অভিহিত করি, তারা তো গোটা সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন—তাদের পক্ষে নিজেদের মানিয়ে নেবার কথাই ওঠে না। নক্সাল আন্দোলন থেমে গেলে, সুযোগ পেলে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সুসংস্কৃত হলেই এরা সমাজের সঙ্গে মিশে যাবে, এ-ধরনের আশাবাদ ও বিশ্বাস আমার নেই। যে কোনো দেশের শিক্ষাসঙ্কটের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্কটের কথা মনে রাখতেই হবে।

গ্রামচি, মেসজারোসের লেখা থেকে আমাদের শিক্ষাসঙ্কটের কারণ নির্ণয়ের দু'একটা সঙ্কেত মিললেও মিলতে পারে।*

---

* এই প্রবন্ধের সবকটি উদ্ধৃতিই Me´saza´ros রচিত Marx's Theory of Alienation থেকে নেওয়া (পৃঃ ২৮৯-৩১১)।

১৮

তরুণ বিপ্লবীর পত্র

[এই লেখাটিতে অতি-আধুনিক তরুণের মনের কথা তাদের জবানিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। তাদের ভাব বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গী যতটা সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। তা বলে নেহাৎ অব্যবস্থিতচিত্ত তরুণের ব্যক্তিমনের অসুস্থ উচ্ছ্বাস ভেবে লেখাটিকে গুরুত্ব কম দিলে চলবে না। গত কয়েক বছরে ঐ রকম একাধিক যুবকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে। গুয়েভারা, দেব্রে, গরিঘেলাপন্থী উগ্র সক্রিয় বিপ্লবীর মনের খবর বড়-বড় দৈনিকের নিজস্ব সংবাদদাতা এবং গোয়েন্দাবিভাগের কর্তারা হয়ত বলতে পারেন। তারা লোকচক্ষুর সামনে আসে না, চরম কার্যকলাপের মাধ্যমে ছাড়া অন্যভাবে নিজেদের জাহির করে না। তাদের মানসিকতার খবর আমরা কম জানি। তবে সর্বাত্মক না-হোক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে যে বেড়ে চলেছে, এবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। হয়ত এখনো আমেরিকার মত Womens Liberation Front, Gay Liberation Front, Marizuana Club প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তরুণ বিদ্রোহীদের উদ্ধৃতি—"Sexual

liberty pop music, marizuana have become as much a part of politics as politics has become a part of morality"—হয়ত এদেশের পক্ষে এখনও অতিরঞ্জিত ; তবে তরুণ-তরুণীদের ড্রাগ-এ্যালকোহল-পর্ণোগ্রাফির আসক্তি যে-হারে বেড়ে চলেছে তা থেকে অনুমান করা চলে অদূর ভবিষ্যতে এ্যান্টি-এসট্যাবলিশমেণ্ট আন্দোলনের সঙ্গে 'এ্যান্টি-ম্যারেজ', এ্যান্টি-ফ্যামিলি' আন্দোলনও শুরু হয়ে যেতে পারে। সর্বাত্মক ত্রিপাদ বিপ্লবের দুই পাদ পূর্ণ হবার মত পরিস্থিতি তৈরীর অনুকূল অবস্থা বর্তমান। শক্তিশালী বেশ কিছু সংখ্যক কবি-ঔপন্যাসিক মুক্ত-সমাজ সৃষ্টি ও অবাধ বাসনাতৃপ্তির ইস্তেহার রচনায় কিছুদিন ধরে হাত পাকিয়েছেন। বাজারে ঐসবের চাহিদা আছে। প্রকাশকরা ও আধুনিক পত্রপত্রিকার মালিকরা নিজেদের স্বার্থে সাহিত্যের লেবেল লাগিয়ে এইসবের চাহিদা বাড়িয়েই চলেছেন। পুঁজির নিয়ম-নিগড়ে দুপক্ষই বাঁধা পড়েছেন। এই শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসার সাধ্য কোনো পক্ষেরই নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ-তরুণী ছাত্রছাত্রী এই রসামৃত পান করে নৈতিক ও যৌনভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা বিলোপের স্বপ্ন দেখছেন। আধুনিক সভ্যতার ক্রমোন্নতি সংস্কৃতির অবনতি ঘটাচ্ছে। তবে অবস্থা আয়ত্তাতীত মনে করে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। এই সমাজগর্ভেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিরসনের অবস্থা সৃষ্ট হচ্ছে। 'নেগেশন অফ্ নেগেশন'-এর দিন প্রত্যাসন্ন।

তরুণবিদ্রোহী যে পুরুষ-আধিপত্যের ও প্রাধান্যের কথা তুলেছেন, সে-বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। জানি বুর্জোয়া সমাজে বাস্তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই। জন্মনিরোধের, বিবাহ বিচ্ছেদের ও স্বেচ্ছিক গর্ভপাতের সরকারী অনুমোদন, আমেরিকার ১৯৬৪ সালের সিভিলরাইট্স এ্যাক্টের মতই সংবিধানের পাতাতেই আবদ্ধ থাকতে পারে। নির্বিত্ত শ্রেণীর ভোটাধিকারের স্বাধীনতার চেয়ে বেশী মূল্য হয়ত এতে আরোপ করা চলে না। দৈহিক বলপ্রয়োগ, বর্বর অত্যাচার নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে ; কিন্তু স্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারের সূক্ষ্ম ও কৌশলী উপায় বুর্জোয়া সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে এও ঠিক। তরুণবিদ্রোহী হয়ত জানেন না যে,

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁর অনেক আগে, এবিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। মনোগ্যামী (Monogamy) চালু হয়েছে দাসপ্রথা ও ব্যক্তিসম্পত্তির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে, একথা মার্কসবাদীরা জানেন। কিন্তু বিবাহপ্রথা ও পরিবার প্রথার বিলোপের মানে পুরুষ-প্রাধান্য চলে যাওয়া নয়, যেমন ব্যক্তিসম্পত্তি বিলোপ মানেই কমিউনিজ্‌ম নয়। প্রাথমিক শর্ত হিসেবে চাই প্রযুক্তিবিপ্লব এবং উৎপাদনের সর্বস্তরে যন্ত্রের প্রয়োগ। আমরা ব্ল্যাংকুইজমে বিশ্বাসী নই। নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দিলে প্রতিবিপ্লবকে ডেকে আনা হবে, বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে না। —লেখক]

প্রথমেই জানাতে চাই বাংলা অভিধানের মধ্যমপুরুষের শ্রেণী বিভাগ আমার কাছে অগ্রাহ্য। গুরু (আপনি), সামান্য (তুমি) ও তুচ্ছ (তুই) এই তিনরূপ শ্রেণীভেদের প্রতিরূপ এবং সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের নিদর্শন। সমানাধিকার আমাদের ঘোষিত নীতি ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমরা সমর্পিত-সত্তা। গুরু-লঘুবিচার অন্যায় ও অনৈতিক। তুমি এবং আমার পিতা পিতৃব্য পিতামহ আমারই মত সামান্য পদাভিষিক্ত। কাজেই অনেকটা গণতান্ত্রিক ইংরাজী ভাষার দ্বিতীয় পুরুষ রূপেই তোমাকে সম্বোধন করব। তবে প্রথম পুরুষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করব, কেননা প্রথম পুরুষ নেপথ্যে অধিষ্ঠিত ও প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধবাদী নন।

তোমাকে প্রথম দেখি গত মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায়। বাবার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুমি আমার মাকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলে সেদিন। মাকে পাগল প্রতিপন্ন করার জন্য বাবা তোমার শরণাপন্ন হয়েছিল। কয়েক মাস আগে আমার এক বন্ধুকে তুমি উন্মাদ-আশ্রমে চালান করেছিলে। তার একমাত্র অপরাধ, সে তোমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। মায়ের মধ্যে তুমি উন্মত্ততার কোন লক্ষণ আবিষ্কার করেছিলে? বাবাকে কয়লা ভাঙার হাতুড়ি দিয়ে মা আঘাত করেছিল; এটাকে তুমি উন্মাদ রোগের উপসর্গ ধরে নিয়েছিলে। বিয়ের পর থেকে আজ তিরিশবছর ধরে বাবা মায়ের উপর পুরুষালী দম্ভে যেসব অনাচার-অত্যাচার চালিয়ে এসেছে, যেসব মর্মান্তিক আঘাত করেছে, তার কতটুকু তুমি জান? তোমাদের পুরুষ-প্রধান সমাজে

নারী নির্যাতন অপরাধ নয়, উন্মাদ রোগের উপসর্গ নয়, অথচ নারীর আত্মরক্ষার চেষ্টা অথবা অজস্র আঘাতে ধৈর্য হারিয়ে প্রত্যাঘাতের চেষ্টাকে তোমরা একটা গুরুতর অপরাধ, অথবা উন্মত্ততার প্রকাশ বলে মনে করতে অভ্যস্ত। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা এই দুটি ঘটনায় বদলে গেছে।

বাবার মত কথায় ও কাজে তোমারও মিল নেই। তোমার লেখায় পুরুষ-প্রাধান্যের অনেক কথা থাকলেও, আসলে তুমি আমার বিপ্লবী (?) পিতার মতই ঐতিহ্যবাদী সনাতনপন্থী স্থবির। অথবা আমার বন্ধুর কথাই ঠিক। তোমরা তোমাদের মনের দ্বন্দ্ববিরোধ সম্বন্ধে সজাগ নও, তোমাদের অজান্তে তোমরা অসুস্থ সমাজকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছ। তোমরাই মনের অসুখে ভুগছ। তোমাদেরই চিকিৎসা দরকার। তবে শুনেছি, পঞ্চাশ পেরুলে মস্তিষ্ককোষের 'টোন ও ইলাসটিসিটি' নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। তোমরা অসুস্থই থাকবে।

তোমরা সমাজের উপর আধিপত্য করছ। তোমাদের লেখা কাগজে ছাপা হয়, ছেলেরা পড়ে। সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক সমালোচনার জন্য তোমরা একাংশ তরুণের কাছে আধুনিক, আবার কর্তৃপক্ষের কাছেও সম্ভ্রমের পাত্র। তোমাদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেওয়া আমার আশু কর্তব্য বলে মনে করি। তোমরা সমাজের এক নম্বর শত্রু। কারণ আগেই বলেছি, সমাজের একাংশের কাছে তোমরা প্রগতিবাদী বলে পরিচিত। তোমাদের আমি ঘৃণা করি। ভয়ও করি।

তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়। তুমি আমায় আকর্ষণ কর। তাই সে-দিনের পর আরো কয়েকবার তোমার আড্ডায় ঢুঁ মেরেছি। ভালো মানুষের মত তোমার দিকে তাকিয়ে মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করেছি। ভয়ের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে, এক বাধ্যকারী নির্জ্ঞান-শক্তি আমাকে ভয়ের জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। ভয়ের অনুভূতি আমার সর্বদেহে রোমাঞ্চ আনে। মনে হয়, কতকগুলো অদৃশ্য পোকা যেন আমার শরীরের উপর দিয়ে কিলবিল করে হেঁটে চলেছে। পেটের মধ্যে নাড়ীগুলোয় পাক দিয়ে ওঠে। খালি পেটে গাঁজার বিড়ি টানলে যেমন হয়। বমি-বমি ভাব। মনের মধ্যে যা-হয়, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। ইয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরস' পড়লেও আমার অমনি অনুভূতি জাগে।

তুমি সেদিন আমার চোখে চোখ রেখে কি যেন জিজ্ঞেস করলে। আমি শুনতে পাইনি। বেশির ভাগ কথাই আমি শুনতে পাই না, বুঝতে পারি না। সারাক্ষণ আমি নিজের সঙ্গে কথা বলে চলি, তাই বোধ হয় অন্যের কথা আমার কানে ঢোকে না। আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম? ঠিক মনে নেই। আমার মনে হয়, তুমি বোধ হয় আমাকেও তোমার ডাক্তার বন্ধুদের কোনো নার্সিং-হোমে চালান করে দেবার সুযোগ খুঁজছ। তাই আমি তোমাকে ভয় পাই।

তুমিও আমাকে ঘৃণা কর। তুমিও আমাদের ভয় পাও। তোমার সংরক্ষণশীল বিপ্লবী মতবাদ আমাদের কাছে অগ্রাহ্য, তাই তোমার ঘৃণা। আমরা ছাত্র-তরুণদের কাছে তোমাদের হেয় করে তুলেছি, তাই তোমাদের ঘৃণা। তোমাদের শিথিল শিরা-ওঠা হাত থেকে আমরা নিভু-নিভু বিপ্লবের মশাল কেড়ে নিতে চাই, তাই তোমাদের ভয়। বাবার মত তুমি আমাকে ভয় পাও, ঘৃণা কর। বাবা আমাকে যেকোনোদিন পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে, তুমি আমাকে পাগলা-গারদে চালান দিতে পার। আসলে তোমরা যৌবনকে হিংসা কর। তোমাদের সম্ভোগশক্তি নিঃশেষিত, অথচ সম্ভোগলিপ্সা অব্যাহত। তাই তোমরা যৌবনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে যৌবনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছ। তোমরা জরাকে অস্বাভাবিক উপায়ে হরমোন ভিটামিনের সাহায্যে ঠেকিয়ে রেখে এই গ্রহের স্থবিরশাসন অব্যাহত রাখতে চাও। আমরা মূর্খ পুরুর মত পিতা যযাতির লালসাপূরণের জন্য যৌবনদান করতে চাই না। তাই আমাদের নাম দিয়েছ হঠকারী, দুষ্ক্রিয়কারী। আমাদের নয়াবামদর্শনের নাম দিয়েছ 'ইনফ্যানটাইল ডিসঅর্ডার'। যৌবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তোমাদের কাছে 'মরবিডিটি', আর তোমাদের বৃদ্ধ বয়সের 'পারভারসান' তোমাদের কাছে 'নোবিলিটি'।

তোমরা নারীজাতির মুক্তি চাও না, কেননা তাহলে তোমাদের সম্ভোগমন্দিরে সেবাদাসীর অভাব ঘটবে। যৌবনকে মুক্ত দেখতে চাও না, কেননা তাহলে জলতরঙ্গের মুক্তধারায় তোমাদের আবিল মনের সংস্কার-আবর্জনা (যাকে তোমরা ধ্রুপদী নীতি আর মূল্যবোধ বলে সযত্নে লালন করেছ) ভেসে চলে যাবে। তাই তোমাদের কাছে বিপ্লবের অর্থ বাড়তি ইতরজনের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা আর কোনোরকমে টিঁকে থাকা। তোমাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান বেড়েই

চলেছে। তোমরা আমাদের ভাষা বুঝতে পারছ না, আমরা তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা অভিযোগ তুলেছ, আমরা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-পুরাণ পড়ি না, আমাদের অভিযোগ, তোমরা পর্ণোগ্রাফির স্বাদ জান না, অথবা সুস্বাদু বলে জানলেও স্বীকার কর না। বিপ্লবের ক্লাসিক পড়ি না বলে তোমাদের কাছে আমরা হেয়, আর বিপ্লবের হাতিয়ার বোমা-বন্দুকের শব্দে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত, তাই আমাদের কাছে অনুকম্পার, অবজ্ঞার পাত্র। তোমরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আরামকক্ষে বসে বিপ্লবের স্তবগান কর, পরিকল্পনার খসড়া তৈরী কর; আর আমরা অপরিকল্পিত স্বতঃউৎসারিত বিপ্লবের আগুনে আত্মাহুতি দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তোমরা ঈপ্সিত দিনের জন্য, কাঙ্ক্ষিত দেবতার ঘুম ভাঙার জন্য সারাজীবন অপেক্ষমান থাকতে রাজী, আর আমরা সেই দিনটিকে এগিয়ে আনবার জন্য, বিপ্লব-দেবতাকে বজ্রনিঃস্বনে জাগিয়ে তোলবার জন্য আগ্রহী। তোমরা মনে কর সমাজ, রাষ্ট্র, বিপ্লব, সবকিছু ছকে বাঁধা, পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলার অধীন, আর আমরা মনে করি, তোমাদের গুরুদেবদের আবিষ্কৃত পুঁজির নিয়ম, রাষ্ট্রের তত্ত্ব, বিপ্লবের পূর্বাভাস, সবই বিশ শতকের স্পেন মেক্সিকোর ব্যর্থতায়, চীন কিউবার সাফল্যে মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। ঝানভ ভার্গার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমেরিকার 'ইকনমি' এখনও টিকে আছে। তোমাদের গর্ব তোমরা যুক্তিবাদী, 'র‍্যাশনাল'; আর আমরা জানি মানুষ মাত্রেই 'ইর‍্যাশনাল'। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান হার মেনেছে, সে-খবর জেনেও তোমরা মানতে চাও না। উনিশ শতকের বিজ্ঞান আর অর্থনীতির অচল তত্ত্ব তোমাদের অন্ধ করে রেখেছে। বিশ শতকের বিজ্ঞান নিমিত্তবাদের ধার ধারে না। আমরা অনিশ্চয়তাবাদ-আকস্মিকতাবাদ-স্বতঃস্ফূর্তবাদে বিশ্বাসী। আমরা এ-যুগের তরুণ-তরুণীরা সব্যসাচীর মত নিমিত্তমাত্র হতে চাই না। তোমার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস আমার নেই। আমার মনে হয়, আমার কথা শুনেই তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর দুষমনের মত চেহারার তোমার অনুচররা এসে আমার বাহুমূলে একশো মিলিগ্রাম 'লারগাকটিল' ইনজেকশন দিয়ে আমাকে অভিভূত করে ফেলবে। তারপর তুমি আমাকে চালান করে দেবে কোনো আশ্রমের অন্ধকার ঘরে অথবা পাঠিয়ে দেবে জেল-হাসপাতালে। আমার বন্ধুর মত, আমার মায়ের মত আমি লুপ্ত হয়ে যাব।

তাই ঠিক করেছি, আত্মগোপন করব। সেখান থেকে আমার সমবয়স্কদের কাছে ইস্তেহার পাঠাব। সর্বাত্মক বিপ্লবের ইস্তেহার। আমাদের কালচারে যা-বিপ্লব, তোমাদের কালচারে হয়ত তা পাগলামি। তবু আমাকে লিখে যেতে হবে। আমাদের প্রজন্ম ব্যবধানে যে-'কালচারাল ব্যবধান' সৃষ্ট হয়েছে, সেই ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলবে।

সর্বাত্মক বিপ্লব

বিপ্লবকে আর একমাত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলছে না। মার্কস উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন সমাজ, নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে, কিন্তু নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়ে উঠছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুক্ত সমাজ, মুক্ত মানুষ কোনো দেশেই আবির্ভূত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাসীন চক্র ভুয়ো সমাজ-তন্ত্রের নামে ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করে তাকে যন্ত্রাঙ্গে পরিণত করেছে। ক্ষমতাদখলের পরই বিপ্লবের স্রোত থেমে গেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপসাধন তো দূরের কথা, রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলার নাগপাশ আরো বিস্তারিত হচ্ছে, বন্ধন আরো কঠিন হচ্ছে। আমরা তাই সংগঠনের বিরোধী, পার্টি গঠনে অনিচ্ছুক। আমরা চাই সবরকমের বন্ধনমুক্তি। সবরকম সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন। আমরা য়্যান্টি-ষ্টেট্, য়্যান্টি-অথরিটি, য়্যান্টি-এস্‌টাবলিশমেণ্ট।

তোমরা বিপ্লবের স্বপ্নই দেখেছ, বিপ্লবের অর্থ বুঝতে পার নি। তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজেছ পার্টিনেতার মধ্যে, বর্ণাশ্রমকে পোষণ করেছ পার্টিসংগঠনের মধ্যে, পুরণো ব্যবস্থাকে কায়েম করেছ বিবাহ, পরিবার ইত্যাদির মহিমা কীর্তনে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে সেই সামন্তযুগে আবদ্ধ রেখেছ, অচল নীতিবোধকে আঁকড়ে রয়েছ। মানবসত্তার নবজাগরণকে অস্বীকার করেছ, যৌবনকে অবদমিত করে পুত্র-কন্যাদের মরবিড করেছ। সবদিক দিয়েই তোমরা সনাতনপন্থী, সময়ের চাকাকে তোমাদের যুগে আবদ্ধ রাখতে চাও। প্রযুক্তিবিপ্লবের ফলে কালনেমির গতিতে যে-নতুন বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে তোমরা অবহিত নও; কিম্বা অবহিত হয়েও তোমাদের প্রজন্ম-স্বার্থে স্বীকার করতে নারাজ।

তোমরা জানো না, আজ বহুমাত্রিক বিপ্লবের দাবী আমেরিকা, পশ্চিম

ইয়োরোপেই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের মত অনুন্নত দেশেও তার স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। আজকের তরুণরা বহুমাত্রিক বিপ্লব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এই বিপ্লবই ব্যক্তিমুক্তির বিপ্লব। আজ বিপ্লব কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের সংগ্রাম নয়, সর্বক্ষেত্রে নতুন ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রাম। আমেরিকার তরুণ-তরুণীর মত আমাদের কাছেও 'sexual liberty, pop music, marijuana, have become as much a part of politics, as politics become a part of morality'। উডষ্টকের 'পপ্-মিউজিক ফেষ্টিভালে' যৌনস্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য অপসারণের যে-দাবী উঠেছিল, তার দাপটে হোয়াইট হলের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। তাই ১৯৭০ সালে ফরাসী পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভয়ার্ত কর্তৃপক্ষ 'পপ্-মিউজিক ফেষ্টিভালে'র অনুমতি দিতে চায় নি। মনোরোগ চিকিৎসকদের এক কনভেনশনে ঢুকে যৌনস্বাধীনতার প্রবক্তা তরুণী ও সমকামী (homeo sexual) তরুণের দল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, "Cambodia is obscene, sex is not obscene"। যৌবনের স্বাভাবিক কামেচ্ছার কণ্ঠরোধ করে তোমরা প্রৌঢ় বৃদ্ধেরা তোমাদের রুগ্ন কাম-অভিলাসকে অস্বাভাবিক উপায়ে চরিতার্থ করতে চাও। স্ত্রীজাতির উপর অনাচার-অবিচারকে অব্যাহত রেখে যুবক-যুবতীর অবাধ মিলনকে বাধা দিয়ে, গণিকাবৃত্তিকে চিরস্থায়ী করে অন্তঃপুরকে পবিত্র রাখতে চাও। শক্তিমান শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ত মুক্ত রচনার জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত করে তোমরা সপ্রমাণ করছ যে, তারুণ্যকে তোমরা ভয় পাও, যৌবন-শক্তিকে তোমরা হিংসা কর। মনোরোগ চিকিৎসকদের উপদেশ মত আমাদের যৌবনকে পঙ্গু করে রাখার দিন শেষ হয়েছে। শাসক-শোষক-শিক্ষক-চিকিৎসক সকলেই তোমার স্বশ্রেণীর লোক, আমাদের পিতৃস্থানীয়। আমাদের সঙ্গে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোনোদিনই ঘুচবে না। প্রজন্ম-ব্যবধান দুস্তর। নিক্সন পর্ণোগ্রাফী, বন্ধ করার যে-কমিশন বসিয়েছিলো, সেই কমিশনের প্রতিবেদন নিক্সনের মনঃপূত হয়নি। কমিশন সরাসরি রায় দিয়েছে যে, "there was no foundation for the belief that erotic magazines, books or films give rise to severe crimes or constitute a threat to the morals of young people."। আর তোমরা আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যিকদের সম্মানহানির চেষ্টায় আদালতে মামলার পর মামলা

সাজিয়েই চলেছ! কালোবাজারী, বস্তির মালিক, আর ঘুষখোর মন্ত্রীরা নির্বিবাদে রাজত্ব চালাচ্ছে।

নৈতিক বা যৌনবিপ্লব

আমরা বিপ্লব চাই। আমেরিকা সুইডেন ইত্যাদি দেশে যৌনবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, নাট্যবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সেই সর্বাত্মক বিপ্লবের বাঁশী আমাদেরও মর্মে পৌঁছেছে। আমেরিকার ষ্টেজে অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তবানুগ রতিক্রীড়া প্রদর্শিত হচ্ছে, বাধ্যকারী সমকামিতার ছবি দেখানো হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাকবার্ডের মত নাটক করার দুঃসাহসও দেখিয়েছে ঐ দেশের তরুণ-তরুণী। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কেনেডি-হত্যার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে এই নাটকে। এদেশে বহুমাত্রিক এই ধরনের বিপ্লবস্রোতের ভগীরথ হতে চাই আমরা।

এযাবৎ রাজনীতি-অর্থনীতির সীমিত পরিধির মধ্যে বিপ্লবকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, তাই মানুষের মুক্তির পরিবেশ পৃথিবীর কোথাও এখনো সৃষ্টি হয়নি। মানুষ কর্তৃক মানুষের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিবৃত্তের মধ্যেই তোমরা বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছ; মানুষ কর্তৃক নারীজাতির অবমাননাকে বিপ্লবের বিষয়বস্তু করনি কোনোদিন। চিরায়ত শিল্প, ধ্রুপদী নাটক বলে তোমরা অভিনন্দিত করেছ সেইসব সৃষ্টিকে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষপ্রাধান্য অব্যাহত রাখা আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া বিপ্লবের কোনো মূল্যই থাকে না। মানুষের স্বাধীনতাই বিপ্লবের লক্ষ্য। নর-নারীর মিলনের স্বাধীনতা ও শিল্পীর স্বাধীনতা ছাড়া বিপ্লব অসম্পূর্ণ। লেনিন-প্রদর্শিত পথে আমরা আজকের ছাত্র-তরুণরা কোনোদিন চলব না। কৃচ্ছ্রসাধন অবদমন আমাদের ধর্ম নয়। ক্লারা জেটকিনকে লেখা লেনিনের চিঠিগুলোতে পাদ্রীসুলভ মনোভাব ফুটে উঠেছে, আমরা তার তীব্র বিরোধী। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষা পৃথিবীতে নৈতিক বিপ্লব নিয়ে এসেছে কিন্তু লেনিন সেই ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষাকে হেয় করেছেন। লিবিডোকেন্দ্রিক চিন্তাকে তিনি হিন্দু সাধুর নাভিকেন্দ্রিক চিন্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌনতার সমস্যাকে তিনি সামাজিক সমস্যার অঙ্গীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা ট্রটস্কি, গুয়েভারা, মার্কসকে খানিকটা শ্রদ্ধা করি; আমরা মনে করি আগামী বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো ভূমিকা

নেই। তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত জনতা, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ আর লুম্পেনরাই শুধু বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

আমরা বিপরীত সমাজ, বিপরীত সংস্কৃতি গড়তে চাই। পিতাপিতৃব্যদের কর্তৃত্বঅভিলাসকে খর্ব করতে চাই। যৌন-অবদমনের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য মুক্তমেলার অনুষ্ঠান চাই। তুমি হয়ত জাননা যে, ইয়োরোপের অনেক দেশেই বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত নয়। এ-যাবৎ ইতালীতে তথাকথিত বামপন্থীরা চার্চের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। সোভিয়েতে বহুদিন বিবাহবিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। জন্ম-নিরোধকেও ব্যঙ্গ করেছে কমিউনিষ্টরা এতকাল। মালথুস-তত্ত্বের মধ্যে তারা বিপ্লববিরোধী অভিসন্ধি খুঁজেছে। বিবাহবিচ্ছেদ, জন্মনিরোধ ও স্বৈচ্ছিক গর্ভপাতের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি না-দেওয়া সমাজে পুরুষ-আধিপত্য বজায় রাখার ঘৃণ্যতম উপায়। আজ আমাদের মত অনেক রাষ্ট্রের সরকার পারিপার্শ্বিকের চাপে স্ত্রীস্বাধীনতার এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত মেনে নিলেও, তোমাদের মত 'সনাতনী বিপ্লবীরা' সরকারী প্রচেষ্টাকে নানাভাবে বাধা দিয়ে চলেছ।

আমেরিকার বিপ্লব

তুমি বলবে ফরাসী লেখক Jean Francois Revel-এর 'Without Marx or Jesus'-এর বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর কথাগুলোই আমি পুনরাবৃত্তি করছি। আমি বলব, আমার মত অতি আধুনিক তরুণদের মনের কথা চুরি করে ভদ্রলোক তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে যেটুকু লিখেছেন বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। তাঁর বই আমাদের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে খানিকটা সাহায্য করেছে। ঐ বই থেকে শুধু সেই বক্তব্যগুলোরই আমি প্রতিধ্বনি করছি, যেগুলোর সঙ্গে আমি একমত। তবে আমরা তোমাদের মত গুরুবাদী নই। রেভেলকে কেন, কোনো তাত্ত্বিককেই আমরা গুরুপদে বরণ করব না। তোমাদের মত মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য সমর্থন করব না। অনেক বিষয়ে মতান্তর থাকলেও রেভেলের প্রধান বক্তব্য বিষয়ে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি না। হ্যাঁ, আমেরিকায় কোনোদিন প্রচলিত অর্থে বিপ্লব হবে না। আমেরিকায় আন্দোলন হবে, সেমিনার হবে, 'টিচ্ ইন' হবে, 'সিট্ইন' হবে, কেনেডি-কিং-ওয়ালেসরা মরবে, ব্ল্যাক প্যান্থার কুক্লুক্স ক্ল্যানরা

পরস্পরের রক্তপান করবে, একদল নাগরিক অন্যদলের উপর গুলি চালাবে, রক্তের নদী বয়ে যাবে, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করতে কোনোদিন কোনোদল এগিয়ে আসবে না। বিপ্লবী পার্টি বলতে কিছু তৈরী হবে না। আমেরিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবে না। তবে কিভাবে বিপ্লব হবে? আমেরিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে সেনেট কংগ্রেসের মাধ্যমে। নতুন বিল আনা হবে। নতুন 'চার্টার অফ্ ডিমাণ্ডস্' পাশ হবে। আর সে-বিপ্লব ঘটাবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিপ্লব। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা হাজার-হাজার কম্পিউটার। তোমরা ভাবছ ফরাসী তাত্ত্বিকের এই ধারণা আঠারো শতকের কোনো তাত্ত্বিকের ইউটোপিয়া কল্পনার সামিল, অলীক-আকাশকুসুম অসম্ভব। পেণ্টাগন, সি আই এ, ওয়াল ষ্ট্রীটের ম্যাগনেটরা ম্যারিজুয়ানা বা এল এস ডি সেবন করে স্বপ্ন দেখবে আর সাম্যবাদের বিল পাশ করিয়ে নেবে নিগ্রো পিউরেটো-রিকান্স্, ইতালীয়ানরা, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের গ্যাংষ্টাররা! বলেছি তো, তোমরা যাকে বিপ্লব বল, আমেরিকায় সে-অর্থে বিপ্লব হবে না। আমেরিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে ভূয়ো আদর্শের বুলি আউড়ে সি আই-এর বদলে হারলেমকে এসে হোয়াইট হলে বসতে দেবে না আমেরিকার মানুষ। রাষ্ট্রের নাগপাশে বাঁধা পড়বে না আমেরিকার নাগরিক। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে বাড়তে দেবে না তারা। এটা তাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আমেরিকা টুকরো-টুকরো, খণ্ড-খণ্ড, স্বয়ংশাসিত কম্পিউটারচালিত অংশে ভাগ হয়ে যাবে। জেফারসনের আমেরিকায় লেনিনের পার্টিএকনায়কত্ব কোনোদিন চালু হবে না। মার্কসবর্ণিত কমিউনিজম-এর মডেল আমেরিকাই প্রথম তুলে ধরবে। যদি মাওবাদী প্রগ্রেসিভ্ লেবার পার্টি মার্কস-এর স্বপ্নকে সফল হতে না-দিতে চায় তবে ওয়ালষ্ট্রীটের কুবেররা তাদের যন্ত্রপাতি সমেত দূরগ্রহে বসতি করবে এবং নিরপেক্ষ কোনো গ্রহের মারফত এই পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য চালাবে। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। তাদের সীমান্ত সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। এতটা তলিয়ে দেখবার মত বুদ্ধি নেই ফরাসী তাত্ত্বিকটির। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, আমেরিকার জনসাধারণ জানে যে, রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের জন্য কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধলে জরুরী ক্ষমতার বলে পারমাণবিক অস্ত্রের তলব করতে পারেন প্রেসিডেণ্ট। কার নির্জ্ঞানে কোন মতলব ওৎ পেতে আছে, কে বলতে পারে? জন, রবার্ট, মার্টিন লুথারের আততায়ীদের মত প্রেসিডেণ্টের যে মস্তিষ্ক-

বিকার ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া পুরণো ধাঁচের বিপ্লব করতে হলে গুপ্তচক্র গড়ে ওঠা দরকার। আমেরিকায় গোপনীয়তা বলে কোনো কিছু আছে কি? তবে আমেরিকায় রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ চলতেই থাকবে, কেননা অন্যসব দেশের চেয়ে আমেরিকানরা বেশী জানে যে, 'violence pays'। রেভেলের থেকে আমাদের দৃষ্টি আরও বেশী অন্তর্ভেদী। তিনি যুক্তির অবতারণা করে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আমরা যুক্তিবিরোধী। আমরা, এযুগের তরুণরা, প্রত্যেকেই এক-একজন স্বাধীন শিল্পী। আমরা স্ব-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। অনিশ্চিত ভবিতব্যকে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ছকে ফেলে নিশ্চিত হতে চাই না, নির্জ্ঞানমানসের অযৌক্তিক আচরণকে অসামাজিক বা নিউরোটিক বলে অভিহিত করি না। শিল্পে-নাটকে-সংগীতে আমরা আমাদের অস্বেচ্ছিক প্রেষণাকে অভিব্যক্ত করার পক্ষপাতী। তা বলে, আমাদের ফ্রয়েড-শিষ্যও বলতে পার না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের চেয়ে মার্কুসের কথাগুলো আমাদের কাছে বরং অধিক গ্রাহ্য। ফ্রয়েড বিপ্লব চাননি। জনতাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। মার্কুস বিপ্লব চান। লুম্পেনদের দিয়ে বিপ্লব ঘটাতে চান। ফ্রয়েড ভেবেছিলেন, কামেচ্ছার অবদমন ব্যক্তির পক্ষে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, শিল্পসাহিত্য, সভ্যতা গঠনের পক্ষে অপরিহার্য। নিজেকে অতৃপ্ত রেখে, বঞ্চিত রেখে, প্রাথমিক পুঁজি সৃষ্টির যুগে হয়ত ফ্রয়েডের বক্তব্যের কিছুটা ব্যবহারিক উপযোগিতা ছিল, কিন্তু বর্তমানকালে ফ্রয়েড-তত্ত্ব অচল। সভ্যতা শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যৌনতার উদ্‌গতির (sex-sublimation) প্রয়োজন, এই ফ্রয়েডীয় অভিমত আমরা সরাসরি অগ্রাহ্য করি। আমরা মনে করি, (মার্কুসের সঙ্গে এখানে আমরা একমত) সভ্যতা ও যৌনতৃপ্তির মধ্যে ফ্রয়েড যে-বৈপরীত্য দেখেছেন, সেটা প্রকৃতিগত নয়, বিশেষ ধরনের সমাজ-ব্যবস্থাজাত। আজ প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের ফলে অবদমন ও কৃচ্ছ্রসাধন অর্থহীন। যৌনতার অবদমন ও বিধিবদ্ধ প্রণালীতে কৃচ্ছ্রসাধন আজকের দিনে শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অশুভ, প্রগতির প্রতিবন্ধক ও বিপ্লবের পরিপন্থী। সুখানুভূতিকে কেন বিসর্জন দেব? সমাজপ্রধানদের নির্দেশ কেন মানব? প্রভুত্বপ্রয়াসী শাসকশ্রেণী বাস্তব নিয়ম বলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নিয়মকে চালাতে চেয়েছে, আর এ-যাবৎ যুবকযুবতী নির্বিচারে সেই নিয়মকে মেনে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ফলে দেহমন বুদ্ধিবৃত্তির অজস্র অপচয় ঘটেছে। মার্কুস এই

একমাত্রিক সভ্যতার একমাত্রিক মানুষের দুরবস্থা খানিকটা উপলব্ধি করেছেন। এই সমাজে যুক্তিহীন যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। পাগলামি ও নির্বুদ্ধিতাকে তোমরা অভিনন্দিত করছ, কেননা পাগলামি-নির্বুদ্ধিতা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুমোদন পেয়ে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। আর আমাদের আচরণকে তোমরা যুক্তিহীন অসামাজিক নিউরোটিক মনে করছ। তোমাদের রাষ্ট্র, সমাজ শতকরা সত্তরজনকে নিরক্ষর রেখেছে, অথচ তাদের কাছ থেকে যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবহার চাও; শতকরা পঞ্চাশজনকে অর্ধাহারী অনাহারী রেখেছ, অথচ তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ চাও, সামাজিক বিধিবদ্ধ আচরণ প্রত্যাশা কর; শতকরা সত্তরজন যুবকযুবতী আর্থিক কারণে উপযুক্ত বয়সে বিবাহবদ্ধ হতে পারছে না, অথচ বিবাহবহির্ভূত যৌনমিলনকে তোমরা নিষিদ্ধ করতে চাও। তোমাদের বিপ্লবীয়ানায় দেশের ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হচ্ছে; উন্নত দেশ আর উন্নয়নকামী দেশের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ আরো দুস্তর হচ্ছে। এ-সবই তোমরা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিচ্ছ এবং তরুণসমাজের বিদ্রোহ-বিরুদ্ধাচরণকে অস্বাভাবিক, অসামাজিক উচ্ছৃংখলা ইত্যাদি আখ্যায় নিন্দিত করে চলেছ। মার্কুস ঠিকই বলেছেন যে, এই one dimensional society-র সবই অদ্ভুত। "Contrasted with the fantastic and insane aspects of its rationality, the realm of the irrational becames the home of the really rational." "আজ সমাজে আমরা যৌনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই সমাজ বিপন্ন।" লিবিডোকে মুক্ত করে, যৌনতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ করে যে-সম্পূর্ণ মানুষ বেরিয়ে আসবে, সেই হবে খাঁটি বিপ্লবী, সেই আনবে প্রজাতির মুক্তি। এই একমাত্রিক সমাজে, তোমরা যারা একমাত্রিক (আর্থনীতিক-রাজনীতিক) বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছ, তাদের সম্বন্ধে মার্কুসের মন্তব্য আমরা সমর্থন করি। "The totalitarian tendencies of the one dimensional society render the traditional ways and means of protest ineffective." । আমরাই মার্কুসের "advanced consciousness of humanity", আমরা "surplus-suppression" থেকে মুক্ত, আমরা নর-নারীর অবাধমিলনকে আগামী সর্বাত্মক বিপ্লবের অপরিহার্য উপাদান মনে করি। অবশ্য ফরাসী তাত্ত্বিকের (Jaen Francois Revel) মত আমরাও মনে করি না যে,

"that the battle against sexual repression is the whole of the revolutionary struggle"; কিন্তু আমরা জানি যে, "it is undoubtedly one of the surest signs of an authentic revolutionary struggle."।

যৌনবিপ্লবের অসীম গুরুত্ব তুমি বুঝবে না জানি, কেননা তোমাদের মস্তিষ্ককোষ অনড় ও নতুন ধারণা গ্রহণে অক্ষম। আমি আমার সমবয়স্কদের জন্য এক মহামূল্য ম্যানিফেস্টো রচনা করছি, একথা আগেই জানিয়েছি। এই পত্রটিকে ম্যানিফেস্টোর মুখবন্ধ বলা চলে। এখানে আমি কেবলমাত্র বিষয়-গুলোকে ছুঁয়ে গেলাম। বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। এল এসডি, ম্যারিজুয়ানা না-হোক, যদি অন্তত উপযুক্ত পরিমাণ ক্যানাবিস সেবনেরও সুযোগ পাই, তাহলেই অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ইস্তেহারটি তোমাদের উপহার দিতে পারব।

জানি, আমার এই চিঠি পড়ে তোমার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দেবে। নাসিকা উন্নত করে তুমি তোমার দরবারের 'জোহুকুম' অকালবৃদ্ধ ছোকরাদের বলবে—ছেলেটা বিপ্লবী নয়, উন্মাদ, অকালবিদ্রোহী। হ্যাঁ, আমরা বিদ্রোহী। তোমরা পরিবার-পার্টি-সমষ্টি-রাষ্ট্রের নামে ব্যষ্টির উপর বিধিনিষেধের পাষাণ চাপিয়ে রেখেছ, পরিবার-পার্টি-সমাজ-রাষ্ট্রের এক বা একাধিক অধিনায়কের স্বার্থের ষ্টীমরোলার চালিয়ে ব্যক্তিত্ববিনাশের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছ; আমরা পরিবার-পার্টি-সমাজ-রাষ্ট্রের নীতি-রীতি গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমাদের বিদ্রোহ এই গ্রহের প্রথম সর্বাত্মক বিপ্লবের সূচনা, আমাদের যৌনবিচ্ছিন্নতা নিরসনের প্রচেষ্টা পৃথিবীর প্রাথমিক স্বার্থকেন্দ্র পরিবার-প্রথার বিলোপ সাধন ঘটাবে এবং রাষ্ট্রবিহীন বিকেন্দ্রিক মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।*

---

* উদ্ধৃতিগুলি রেভেল আর মার্কুসের রচনা থেকে নেওয়া ও বিভ্রান্তিগুলি তরুণ বিপ্লবীর নিজস্ব।

১৯

আক্রামকের মন ও সমাজ

আক্রমণমুখিনতা, হিংস্রতা, স্বজাতিবিরোধিতা কি মানুষের স্বভাবধর্ম ? মানবমস্তিষ্কে কি হিংস্র আক্রমণপ্রবণতাসূচক কোনো কেন্দ্র আছে ? ক্রোমোসোম কি আক্রমণ-ধর্মী কোনো জিনের বাহক ? বিশেষ পরিবেশে আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে মানুষ মানুষকে আক্রমণ করে ? না আক্রমণপ্রবৃত্তি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া মানবমনের এক অনায়াসলব্ধ ধর্ম ?

আজ পারমাণবিক-আয়ুধ সজ্জিত, অশেষ ধ্বংসক্ষমতা সমন্বিত মানবজাতির কাছে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব সবিশেষ। একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন—প্রাগৈতিহাসিক ডায়নোসরদের মত হোমোস্যাপিয়েন্সরা কি নিজের দৈহিক শক্তিবৃদ্ধি ও তদনুপাতে বুদ্ধিবিবেচনাশক্তিবৃদ্ধির অভাবজনিত সঙ্কটের সম্মুখীন ? আমাদেরও পেশী, পরমাণু ও জীবাণুবিদ্যার দৌলতে ঐ বিরাটদেহী প্রাণীটির মত অমিতশক্তির অধিকারী। মস্তিষ্ক সেই অনুপাতে সমৃদ্ধশালী নয়। তিনকোটি বছর ধরাপৃষ্ঠে আধিপত্য করার পর প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না-পেরে ডায়নোসরবংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানবজাতিও কি অবলুপ্তির সম্মুখীন ? এই ভদ্রলোক কিন্তু আশাবাদী। তিনি মনে করেন না যে, মানুষের

ভাগ্য অন্তর্নিহিত আক্রমণ প্রবণতার পথে তাকে আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।[১]

হর্ষ-বেদনা ক্রোধ-দ্বেষ ইত্যাদি সদর্থক-নঙর্থক প্রক্ষোভের উৎস মস্তিষ্ক। এ-বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। মাস্তিষ্কের স্থানবিশেষে তড়িৎবহ শলাকা বা ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করে এইসব প্রক্ষোভ উৎপাদনে সফল হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ইতরপ্রাণীর উপর এই সম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল পরিবেশন করা যাক।

প্রজননবিদ্যা ও আক্রমণপ্রবণতা

ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে একদল পরীক্ষক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আক্রমণপ্রবণতা জন্মগত স্বভাব, পরিবেশ-আয়ত্ত ধর্ম নয়। দুই দল ইঁদুরকে পরীক্ষায় নিয়োজিত করা হয়। বিশেষভাবে মনোনীত এই দুই দলের পার্থক্য তাদের প্রক্ষোভমাত্রার তারতম্য। 'সিলেক্‌টিভ ব্রিডিং' বা পছন্দমত বংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌনমিলন ঘটিয়ে এদের একদলের মধ্যে প্রক্ষোভাধিক্য সংক্রামিত করা হয়, অন্যদলের মধ্যে প্রক্ষোভপ্রবণতা প্রায় শূন্যের কোঠায় আনা হয়। প্রক্ষোভাধীন শ্রেণীর মধ্যে প্রধানত ভয়ের ভাব সঞ্চার করা হয়েছিল। এইবার এদের এক দলের একটি পুং ইঁদুরকে অন্যদলের একটি পুং ইঁদুরের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য এক খাঁচায় রাখা হয়। একবার আবেগপ্রবণের খাঁচায় আবেগহীনকে, দ্বিতীয়বার আবেগহীনের খাঁচায় আবেগপ্রবণকে। এইভাবে প্রতিটি ব্যাচের একটি ইঁদুরের সঙ্গে অপর ব্যাচের অন্য ইঁদুরের দু'বার করে মোলাকাত ঘটে। ক্লাইন-হল স্কেলে এদের আক্রমণমুখীনতার পরিমাপ করা হয়। এই স্কেলটিতে (০) থেকে (৬) পর্যন্ত পরিমাপ সূচক চিহ্ন আছে।

(০) এক-আধবার পরস্পরের ঘ্রাণ নেওয়া ছাড়া একের সম্বন্ধে অন্যের নিস্পৃহতা

---

১ "I don't think, we're condemned by our natural fate to violence and self-destruction. My thesis is that just as we've evolved in our understanding of material forces, so we can—through a combination of new technology and intelligence—evolve in our understanding of the mind".

(১) শ্বাস নেওয়া ঘন-ঘন এবং জোরালো : এছাড়া ব্যবহারে আর কোনোরকম বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

(২) মাঝে-মাঝে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি

(৩) সব সময়ে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি, একে অন্যের পিছু তাড়া করতে থাকে

(৪) লড়াইয়ের ভঙ্গীতে সামনাসামনি, সামান্যরকমের জাপটাজাপটি

(৫) লড়াই তীব্র, অনবরত লাফালাফি গড়াগড়ি মারামারি, খাঁচার মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড

(৬) রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, কামড়াকামড়ি রক্তপাত

এই স্কেল অনুযায়ী নম্বর দিয়ে আক্রমণমুখীনতার পরিমাপ নিরূপিত করে দেখা যায় যে, ১৫টি আবেগহীন ইঁদুর ৩২৬টি আক্রমণ শুরু করে আর সমান সংখ্যার আবেগপ্রধান ইঁদুর নিজের থেকে আক্রমণ করে মাত্র ৬৭টি ক্ষেত্রে। আক্রমণের তীব্রতা আবেগহীনের বেলায় ছিল দ্বিগুণ। এ-থেকে হল ও ক্লাইন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আক্রমণপ্রবণতার মৌলিক উৎস জন্মগত বা জেনেটিক। (Hall C. S,. J Comp Psychology, 1942, 33, 371-383)। স্কট অন্য একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রায় ঐ রকম সিদ্ধান্তেই এসেছেন। তিনি তিনটি অবিমিশ্র জাতির ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা চালান। একটি অচেনা ইঁদুরকে এনে এদের খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে দশ মিনিট ধরে তিনি তাদের ব্যবহার লক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম জাতির C 57 Black ইঁদুর অতিথি ইঁদুরকে স্বাগত জানিয়ে তার গাত্র মার্জনা করে দিতে থাকে। অবাধে তার সঙ্গে মেলামেশা করে, ব্যবহারে আক্রমণ করার কোনো লক্ষণই থাকে না। দ্বিতীয় জাতির A Albino অভ্যর্থনা জানানো তো দূরের কথা, প্রথম থেকেই আক্রমণ চালায়। তৃতীয় জাতির C 3 H Agonti দু'একবার অভ্যাগতের দেহগন্ধ গ্রহণ করেই খাঁচার এক কোণে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করে ঘন-ঘন নিশ্বাস নিতে থাকে (Scott J. P., J. of Heredity, 1942 : 33 : 11-15)। জ্যাকসন ল্যাবরেটরীর এই অবিমিশ্র তিন জাতের ইঁদুর নিয়ে জিনসবার্গ ও এ্যালি পরীক্ষা চালান। তাঁরা আক্রমণ প্রবণতার মাত্রা নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিন দলের ইঁদুরের মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতার পার্থক্য দেখা যায়। অতিথিবৎসল C 57 Black (প্রথম)-রাই সব থেকে বড়দরের লড়ুয়ে বলে পরিগণিত হয়। আর সব থেকে বেশি আক্রমণমুখী C Albino (দ্বিতীয়)

সংগ্রামক্ষমতার দিক থেকে সবচেয়ে নিরেস বলে প্রমাণিত হয়। ঐ ব্ল্যাক-এর বাচ্চাদের যদি জন্ম থেকেই এ্যালবিনো মায়ের কাছে রাখা হয় তা হলেও তাদের সংগ্রামশক্তির হেরফের ঘটে না। অর্থাৎ এর থেকে এঁরা সংশয়াতীত-ভাবে প্রমাণ করেন যে, জন্মগত পার্থক্য আক্রমণমুখীনতা ও সংগ্রামকুশলতার আসল কারণ (Ginsburg & Allee 1942)। আরো একজন গবেষক **Maze Bright** ও **Maze Dull** ইঁদুরদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, **Maze** বা গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার উপায় নির্ধারণ-ক্ষমতাও অনেকখানি নির্ভর করে জন্মদত্ত ক্ষমতার উপর। শিক্ষা বা পরিবেশের প্রভাব এঁদের মতে গৌণ।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারের জন্য দায়ী 'জিন্' আবিষ্কৃত হয় নি। কয়েকটি 'নিউরোমাসকিউলার' (neuromuscullar) বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহারিক বিশৃঙ্খলা বা মানসিক অবস্থার জন্য দায়ী 'জিন'-এর খোঁজ পাওয়া যায় নি। একজন অভিজ্ঞ প্রজনবিদ্ বলেছেন যে, সাইকোজেনেটিক্স বড়জোর বিশেষ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক শারীরিক সংস্থানের বিশেষত্বের জন্য দায়ী 'জিন'-এর অনুসন্ধান করতে পারে। কারণ, মনে হয়, 'জিন্' প্রত্যক্ষভাবে কোনো মানসিক (বা ব্যবহারিক) প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয় : তারা (জিন্) শুধু মানসিকতা ও আচরণ-ব্যবহারের নিয়ামক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।[২]

বস্তুত এখনও পর্যন্ত এ-সম্পর্কিত তথ্যপ্রমাণ এমন যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হয়নি, যার ফলে হিংস্রতা ও আক্রমণমুখীনতাকে জিন-নির্দিষ্ট জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানসিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। নিম্নপ্রাণীর ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। নিম্নপ্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মানুষ সম্পর্কে সরাসরি কোনো সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না। মানুষ সমাজ-পরিবেশের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল ; এবং লক্ষ-লক্ষ বছরের অভিযোজনের ফলে তার মস্তিষ্কে এমন সব

---

২ "For it should be apparent that the genes cannot control directly a psychological trait, e. g. maze-learning ability, they can only exert an influence through the mediation of physical structure" [Calvin : Experimental Psychology : 1963 : pp 325]

পরিবর্তন ঘটেছে, যা তাকে প্রাণীজগতের শীর্ষস্থানে ও বৈশিষ্ট্যে পৌঁছে দিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে চলা, আয়ুধ ও যন্ত্র তৈরী, দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর (বাক্‌শক্তি) ও বাক্‌ভিত্তিক চিন্তাক্ষমতা—ইত্যাদি বিশেষ শক্তির অধিকারী মানুষ নিম্নপ্রাণী থেকে উন্নত বা স্বতন্ত্র। হিংস্রতা ও আক্রমণপ্রবণতা নিম্নপ্রাণীর অন্তর্জাত স্বভাব বলে প্রমাণিত হলেও, এর জন্য দায়ী 'জিন' আবিষ্কার সম্ভব হলেও কিন্তু বলা চলবে না যে, মানুষের হিংস্রতা আক্রমণমুখীনতা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জিননির্দিষ্ট মানসিক বৈশিষ্ট্য। তা বলে একথা অনস্বীকার্য যে, স্নায়ুতন্ত্রের ও উচ্চমস্তিষ্কের ব্যক্তিগত পার্থক্য-বৈশিষ্ট্য আছে; উত্তেজনাপ্রবণতা কারুর মধ্যে বেশি, কারুর মধ্যে কম; কোনো মানুষের প্রথম সাংকেতিক স্তর জোরালো, কারুর বা দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর। এর দরুন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকবেই; তবে সে-পার্থক্য সমাজব্যবস্থার প্রভাব ছাড়া বিকশিত হবে না। সাধারণ মানবিক ক্ষমতা: যথা দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা, দৌড়ানো, কথা বলা, চিন্তা করা ইত্যাদি আয়ত্ত করার মত উচ্চমস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে মানুষ জন্মালেও, এ-গুলিকেও অভ্যাস দ্বারা অনুকূল পরিবেশের অধীনে থেকে শিক্ষা করতে হয়। হাঁটা-চলা-কথা বলা শেখার জন্য মানবশিশুর পক্ষে মানুষের সমাজে অবস্থান অত্যাবশ্যক। কাজেই অনুমান করা চলে যে, আক্রমণমুখী 'জিন্' যদি কোনোদিন মানুষের ক্রোমোসোমে আবিষ্কৃতও হয়, তবুও তাদের বিকাশ ও ক্রিয়াশীলতার জন্য আক্রমণমুখী ও হিংসাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন থাকবেই। সমাজে হিংসা ও আক্রমণ না-থাকলে এইসব 'জিন' কয়েক পুরুষের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়বে ও স্বকীয়তা হারাবে।

আক্রমণপ্রবণতা ও শিক্ষাব্যবস্থা

অন্য দলের মতামত বিধৃত করছি। এঁরা শিক্ষাবিদ্। এঁরা বলেন, শিক্ষা দ্বারা আক্রমণপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এ-নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ব্যর্থতার ফলে আক্রমণপ্রবণতা তখনই দেখা দেয়, যখন আক্রমণের ফলে ব্যর্থতার ব্যথা দূর হবার সম্ভাবনা থাকে।[৩]

---

৩ "There is considerable evidence that the tendency to respond with aggression can be modified by training··· Allee and his collaborators trained meak & submissive

দেখা গেছে, যে, মানবশিশু ও ছাগশিশু ব্যর্থ হলে নিরীহ প্রতিযোগীকে আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতিত্বপূর্ণ প্রভাবশালী প্রতিযোগীর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই এঁদের মতে, আক্রমণাত্মক ব্যবহার পরিবেশ-নির্দিষ্ট ও কতকাংশ আক্রামকের বুদ্ধিবিবেচনা নিয়ন্ত্রিত।

মস্তিষ্কে আক্রমণ-হিংসাত্মক কোনো কেন্দ্র আছে কি ?

মস্তিষ্কের বিশেষ জায়গায় তড়িৎবহ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়ে শিম্পাজীকে আক্রমণাত্মক করে তোলা যায়; এই অভিমত প্রকাশ করেছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ডাঃ ডেলগাডো। মস্তিষ্কের কিছু কোষকে বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে উত্তেজিত করলে প্রাণীর মধ্যে আক্রমণপ্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে। তিনি তাঁর 'ষ্টিমোরিসিভার' (stimo-receiver) যন্ত্রের সাহায্যে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। একযোগে দূর থেকে রেডিও নির্দেশে মস্তিষ্ক উত্তেজিত করা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনার বিদ্যুৎতরঙ্গ-অনুলেখন গ্রহণ করা—এই যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। স্পেনে এক লড়ুয়ে ষাঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি লালটুপি নেড়ে ষাঁড়টিকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। ষাঁড় শিং নীচু করে আক্রমণে উদ্যত হলে তিনি তাঁর যন্ত্রের বোতাম টিপে ষাঁড়টিকে থামিয়ে দিলেন। অবশ্য ষাঁড়টির মাথায় এর আগে তড়িৎবহ শলাকা (ইলেকট্রোড) প্রবিষ্ট করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে জমকালোভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের (temporal lobe) গভীরে কোনো একটি জায়গায় আক্রমণ হিংস্রতার কেন্দ্র আছে, এইরকম অনুমান করেন ডেলগাডো। মস্তিষ্কে এইরকম কেন্দ্র যদি থাকে, তবে শলাকা প্রবিষ্ট করে সেই কেন্দ্র তথা আক্রমণপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটা অবশ্য খুবই আশার কথা। কিন্তু সত্যিই কি মস্তিষ্কে এইরকম কেন্দ্র আছে ? সত্যিই কি আক্রমণপ্রবণতা জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম ?

এই সম্পর্কিত অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি পরীক্ষার ফলাফল বিবৃত করার আগে ক্যারেন হর্নি প্রমুখ নিও-ফ্রয়েডিয়ানদের অভিমত সংক্ষেপে উল্লেখ করা

---

mice to turn exceedingly pugnacious and dominant."
(Muller Neal E, :Experimental Psychology, pp 462)

যেতে পারে। আক্রমণপ্রবণতা এঁদের মতে মানুষের এক ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি বা মানসিক ধর্ম। অবশ্য একথা এঁরা স্বীকার করেন যে, আক্রমণাত্মক ব্যবহার সামাজিক পরিবেশ ও ব্যক্তির পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গেও সম্পর্কিত। পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে হর্নির মতে, সাধারণত তিন ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সব মানুষকে নমনীয়, দুর্দমনীয় ও উদাসীন—এই তিন টাইপে ভাগ করা যায়। 'নমনীয়' টাইপ অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে, তাদের সহযোগিতা-স্নেহ-ভালবাসা-প্রশংসার উপর নির্ভর করে থাকতে চায়। 'দুর্দমনীয়' টাইপ চায় অন্যের উপর আধিপত্য চালিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। এরা মনে করে, সবল দুর্বলকে আক্রমণ করে আয়ত্তে রাখবে—এই হচ্ছে নিয়ম। আর তৃতীয় টাইপ নির্বিরোধী। এদের 'মটো'—'live and let live'। মানুষ থেকে দূরে-দূরে থাকাটাই এদের স্বভাবধর্ম। এই তিন টাইপের সংমিশ্রণে সমাজ। বর্তমানে দ্বিতীয় টাইপ (আক্রমণমুখী) আমাদের আলোচ্য। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক এই আক্রমণপ্রবণতা ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে বানরের উপর পরীক্ষা চালান। কয়েকটি বানর একসঙ্গে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃত্বকামিতা ও সংগঠনক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ ঘটে। আটটি বানরের এমনি একটা দলের শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করলেন গবেষকরা। দলের তিনজনের মধ্যে আক্রমণপ্রবণতা ও কর্তৃত্বলিপ্সা বেশি ছিল। এদের নাম ডেভ, জেক ও রিভা এবং এরাই যথাক্রমে দলপতি, উপদলপতি (১) ও উপদলপতি (২)। ছ'সপ্তাহ দলপতি থাকার পর ডেভের মস্তিষ্কের দুই পাশের টেম্পোরাল লোবের উপর অপারেশন করে দেওয়া হল। ক্ষত সারবার পর তাকে দলে ফিরিয়ে আনা হল। এর ঠিক পরবর্তী আক্রমণমুখী জেক নামের বানরটি [উপদলপতি (১)] ততদিনে দলের কর্তৃত্বভার নিয়েছে। টেম্পোরাল লোবের অপারেশনের পর ডেভ তার ব্যক্তিত্ব ও দলের কর্তৃত্ব দুই-ই হারাল। জেকের দাপটের সামনে সে দাঁড়াতে পারলো না। জেকের কর্তৃত্ব দশ সপ্তাহ চলার পর তার উপরেও চালানো হল ডেভের মত অপারেশন। ইতিমধ্যে উপদলপতি (২) রিভা স্বাভাবিকভাবেই দলপতি হয়েছে। অন্য সবাই তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে। জেক দলে ফিরে আসার পর তার দশা হল ডেভের মত। নেতৃত্ব ফিরে পেল না। ডেভ ও জেকের ব্যবহার ও মানসিকতা অপারেশনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে। দু'জনেরই মারমুখী ভাব ও মাতব্বরী করার

প্রবণতা দূর হয়ে গেছে। তারা এখন শান্তশিষ্ট। বশ্যতা স্বীকার করেছে এক সময়কার অধস্তন উপনেতার কাছে। ডেভ ও জেকের ব্যবহারে একটা তফাৎ দেখা গিয়েছিল। জেক ফিরে এসেই বশ্যতা স্বীকার করে নি ডেভের মতন। চারদিন নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার পর রিভার কাছে হার স্বীকার করে। চললো রিভার রাজত্ব ১৬ সপ্তাহ ধরে। এরপর রিভার উপর অপারেশন চালানো হল। বানরদের নেতৃত্বের 'হায়ারার্কিতে' (hierarchy) রিভা-র তলায় হার্ভি। তার মধ্যে নেতৃত্ববাসনা আদৌ ছিল না। সে ছিল নমনীয় শান্ত টাইপের। রিভা-র নেতৃত্ব সে চ্যালেঞ্জ করল না। অপারেশনের পরও রিভা দলপতি থেকে গেল।

এই পরীক্ষা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এক : টেম্পোরাল লোবে অবস্থিত আক্রমণাত্মক-প্রবৃত্তিকেন্দ্রের শক্তি ও প্রাধান্য অনুযায়ী বানরযূথের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটেছিল। দুই : টেম্পোরাল লোবের সেই কেন্দ্রের উপর অপারেশনের ফলে আক্রমণমুখী ভাব হারিয়ে ডেভ ও জেক নেতৃত্ব হারাল; কিন্তু রিভার অধস্তন বানররা কেউই কর্তৃত্বাভিলাষী বা আক্রমণমুখী না-হবার দরুন, তার নেতৃত্ব বজায় থেকে গেল। তিন : আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি কেবলমাত্র টেম্পোরাল লোবে অবস্থিত কেন্দ্রটির শক্তির উপরই নির্ভরশীল নয়; আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি চরিতার্থতা ও নেতৃত্বের অভ্যাসও এই প্রবৃত্তিকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই ডেভের থেকে জেক, যার প্রাক-অপারেশন নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা বেশি দিনের; অস্ত্রোপচারের পর চারদিন প্রভুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। জেকের থেকে রিভার আক্রমণাত্মক অভ্যাস ও ব্যবহার আরো বেশি দিনের। তাই কি সে অস্ত্রোপচারের পরও নেতৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে? পরীক্ষকদের মতে যেহেতু দলে আর চ্যালেঞ্জ করার মত আক্রমণমুখী কোনো বানর ছিল না, তাই রিভার প্রভুত্ব বজায় ছিল। পূর্বতন দলপতি ডেভ ও উপদলপতি জেক কেন রিভাকে চ্যালেঞ্জ করল না; এ-সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মত স্নায়ুসংস্থা এবং পেশীর বিশেষ সংগঠন ও শক্তি নিয়েই যে ডেভ জেক রিভা জন্মগ্রহণ করেছিল, এমন কোনো প্রমাণ পরীক্ষকরা দাখিল করেন নি।

সমাজ ও আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি

মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের মধ্যে আক্রমণাত্মক হিংসাত্মক ব্যবহার

নিয়ন্ত্রণের যে-কেন্দ্র আছে, সে-কেন্দ্রকে গোটা মস্তিষ্ক থেকে অস্ত্রোপচার করে বিচ্ছিন্ন করলে, মানুষ শান্তিকামী হয়ে উঠবে; অথবা ডেলগাডো নির্দেশিত উপায়ে মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে তড়িৎবহ শলাকা প্রবিষ্ট করিয়ে দিলে চণ্ডাশোক ধর্মাশোক বনে যাবে; এই ধরনের প্রচারের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই ধরনের প্রচারের একটি ক্ষতিকর দিকও আছে। হয়ত প্রচারকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কিম্বা সে-সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। সমাজের, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের, অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতা, আক্রমণপ্রবণতা, হিংস্রতার দিক থেকে ব্যক্তির টেম্পোরাল লোবের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সামাজিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেতে বাধ্য। ফ্রয়েডের মৃত্যুরতিবাদ তত্ত্বে বিশ্বাসী সরল মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করতেন যে, মানুষের নির্জ্ঞানে অবস্থিত ধ্বংসকামিতাই যুদ্ধবিগ্রহ অত্যাচার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মৌলিক কারণ। সমাজ নয়, মানুষকে বদলানো দরকার। নিও-ফ্রয়েডিয়ানরা সাইকো-এ্যানালিসিস করে ব্যক্তিমানসের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

আজকের বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছেন। ধ্বংসপ্রবৃত্তি ও আক্রমণের মনোবৃত্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন মানবমস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। সমাজ সংরক্ষকরা, যাঁরা 'ষ্ট্যাটাস-কো' বজায় রাখতে চান তাঁরা, হিংস্রতা আক্রমণপ্রবণতার এই সমাজ-নিরপেক্ষ তত্ত্বকে স্বভাবতই অভিনন্দন জানাবেন। মানবমনে পাশবপ্রবৃত্তির বিকাশ বিস্তারের মূলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উৎপাদন-বণ্টন প্রণালীর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে অনবহিত রাখাই যাঁদের অভিপ্রায়, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা তা চান না, তাঁরাও সবসময়ে এই সমাজের ব্যক্তির আত্মবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন। কাজেই ধনতন্ত্রের হিংস্রতা নিয়ে অনেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনা যায়, অসম প্রতিযোগিতা ও নির্মম শোষণের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়, কিন্তু সত্তার বিচ্ছিন্নতা কদাচ আলোচিত হয়। শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য আগ্রাসন আক্রমণ ও শোষিতের আত্মরক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ক্ষমাহীন পাশব হিংস্রতার অনুকরণ; এই দিয়েই শ্রেণীসংগ্রামের নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা করা হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানবতাধ্বংসী পাশবতার যে-বীজাণু নিহিত রয়েছে, তার ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে বিপ্লবের সৈনিকদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। যান্ত্রিক ধারণায়

আবিষ্ট অনেক প্রগতিবাদী মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলেই মানবমনে স্বতই পরিবর্তন ঘটবে। পাশবতার পাশ খসে পড়বে, মানবতার উন্মেষ ঘটবে। কেবলমাত্র মগজে ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করিয়ে বা মনের দাওয়াই দিয়ে আক্রমণমন্যতা দূর করার পরিকল্পনার মতই কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে আক্রমণপ্রবণতা নিরসনের আশা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। 'উদ্বৃত্ত মুনাফা'র সমাজের হিংস্রতা আক্রমণতৎপরতা ইত্যাদি পশুধর্ম কিভাবে মানবমনে সংক্রামিত ও বিস্তারিত হয়েছে, তার সম্যক উপলব্ধি ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মানুষকে মানবিক করার প্রচেষ্টার পথে বহু বাধাবিপত্তি দেখা দেবে।

সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক ধর্ম

কয়েক হাজার বছর ধরে মানবধর্মের ব্যাখ্যায় 'নেচার বনাম নারচার'-এর মামুলি তর্কবিতর্ক চলে আসছে। একদিকে ছিল, 'অন্তর্নিহিতবাদ' : মানব-প্রকৃতির মধ্যেই হিংস্রতা আক্রমণমুখিনতা প্রভৃতি অসদ্ধর্ম ও তার বিপরীত সকল সদ্ধর্মও নিহিত। প্লেটো মনে করতেন এ-সবই ঈশ্বরদত্ত ও অপরিবর্তনীয়। এ্যারিষ্টটল মনে করতেন মানসিক ধর্ম জীবের অঙ্গসংস্থান স্নায়ুবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল ; বিধিদত্ত না-হলেও অন্তর্নিহিত ও অপরিবর্তনীয়। প্লেটো এ্যারিষ্টটলের মতবাদ, এই "অন্তর্নিহিত তত্ত্ব" ধর্মযাজকরা গ্রহণ করেন ; ইয়ুং-ফ্রয়েডের সমষ্টি-নির্জ্ঞান-ব্যক্তিনির্জ্ঞান তত্ত্ব এরই হেরফের। ডেলগাডো প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীদের কেবলমাত্র মস্তিষ্কনির্ভর মানসিকতা তত্ত্বও এই ভাববাদী দার্শনিকদের 'অন্তর্নিহিত ধারণা' প্রভাবিত। যদিও তাঁরা একথা মনে করেন না যে অন্তর্নিহিত মানসিকতা অপরিবর্তনীয়, তবুও তাঁদের ধারণা একদেশদর্শী।

এর বিপরীত মেরুতে ছিল 'পরিবেশ নির্ভর' তত্ত্ব। ডেমোক্রিটাস এপিকিউরাস প্রমুখ জড়বাদের প্রবক্তরা মনে করতেন, মানুষের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা সবই তাদের জগৎ বা সামাজিক পরিবেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আক্রমণমুখী হিংস্র মনোভাবের জনক আক্রমণমুখী হিংস্র সামাজিক পরিবেশ। মানুষের মনে এই পরিবেশের প্রভাব।[8] এই মতবাদ সমাজ-

8 "It is not innate human nature which is bad, but rather the organisation of people in a bad social structure which produces bad people" (Wells H. K. : The Failure of Psychoanalysis : 1963 pp 211-12)

বিপ্লবীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে। আজকের ব্যবহারবাদীদের (ওয়াটসন প্রবর্তিত) মধ্যে এই যান্ত্রিক জড়বাদী ধারণা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রথম মতবাদটি প্রতিক্রিয়াকে ও দ্বিতীয়টি প্রগতিকে অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করছে বলে প্রতিবিপ্লবী স্থিতাবস্থারক্ষাকারীরা প্রথমটিকে ও বিপ্লবী পরিবর্তন-কামীরা দ্বিতীয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু কোন মতবাদ প্রতিক্রিয়া কি প্রগতিকে সাহায্য করছে এর উপর নির্ভর করে সে-মতবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা চলে না। বড়জোর স্বার্থসম্পন্ন দল কর্তৃক প্রয়োজনানুযায়ী প্রচারকার্যে নিয়োজিত করা চলতে পারে। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে, এখনও দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাক্‌বিতণ্ডার অবসান ঘটেনি। আজ হিংসাশ্রয়ী আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি অনেকের মধ্যে একযোগে দেখা দিয়েছে; বিশ্বধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র মানুষের ভাণ্ডারে জমা হচ্ছে। 'অন্তর্নিহিত' তত্ত্বের ধারকরা হিংসাশ্রয়ী মনোবৃত্তিকে আর শাশ্বত সনাতন অপরিবর্তনীয় মনে করতে পারছেন না। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোভাব পোষণ করা খুবই বেদনাদায়ক। দুই দলই তাই মানুষকে 'মানবিক' করার সহজ ফর্মুলা নির্ধারণে তৎপর হয়ে উঠেছেন, একদল বলছেন, মগজ ধোলাই বা মস্তিষ্কে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করে মানুষের পাশবিকতা বিনাশ করবেন, অন্য দল ভাবছেন এই আত্মধ্বংসী হিংসাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে মহীয়ান করে তুলবেন। মধ্যপন্থী আর একদল আবার 'নেচার ও নারচারের' মধ্যে একটা আপোষ রফার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন। এঁদের সম্বন্ধে একজন মনস্তাত্ত্বিকের নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য[৫]: শুধু দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে আর বিবেকের তাড়নায় ন্যায়-অন্যায় প্রশ্নের বিচার হয়েছে। *বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে নি। মার্কি মনে*

---

৫ "The issue (heridity-environment) is one of the legacies inherited by psychology for nearly a hundred years. Nativism versus empiricism, McDougall's instinct psychology, Watson's adoption of a strict Lockean viewpoint, the anti-instinct polemics of the 1920's, the 'nature-nurture' controversy of the 1930's....are but a few manifestations of this age-old debate. (Hall: Experimental Psychology : p 327)

করেন[৬] যে, এই বিপরীত মতবাদ একে অপরকে ধীরে-ধীরে অঙ্গীভূত করে ফেলবে ; দুয়ের উপাদান মিলে পূর্ণাঙ্গ মতবাদ গড়ে উঠবে।

দুই বিপরীত মতবাদকে একটা বিন্দুতে এনে সংশ্লেষিত করার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচার ছাড়া মানবমনের জৈবিক বনাম সামাজিক তত্ত্ববিরোধের মীমাংসা হতে পারে না।

দ্বান্দ্বিক বিচার

মনোপ্রজনবিদ্‌দের ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বানরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝতে হলে পরিবেশগত ও অন্তর্নিহিত ধর্মের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অনুধাবন প্রয়োজন। আক্রমণপ্রবণতা হিংস্রতা ইত্যাদি সর্ববিধ মানসিক গুণাগুণের উন্মেষ ও বিকাশের মধ্যে পরিবেশ ও মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত ধর্মের এক অতি জটিল ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বিদ্যমান। মানবমস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও অনুকূল পরিবেশের সমন্বয় ঘটলেই বিশেষ ধরনের মানসিকতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটবে ; এই মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়, কিন্তু এর মধ্যে যথেষ্ট ফ্যালাসি আছে।

হাঁটাচলার মত একটা সামান্য দৈহিক ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। মানবশিশু জন্মের কিছুকালের মধ্যে দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শেখে। নেকড়ের কাছে 'মানুষ' হলে মানুষের মত ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে শেখে না। সামাজিক পরিবেশ, যেখানে অন্য মানুষরা দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে, সেই পরিবেশকে অনুকূল পরিবেশ বলা চলে। যদি হাঁটতে পারাটা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হত, তাহলে নেকড়ের সমাজে 'মানুষ' হয়েও হাঁটতে শিখতো। কাজেই হাঁটতে পারাটাকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলা চলে না। বরং বলা চলে; হাড় পেশী স্নায়ুর ও কানের মধ্যকার ভারসাম্য বজায়

---

৬ "The truth, instead of lying somewhere between these two extremes, seems to lie rather in gradual assimilation of each system by the other ; One may be pretty sure that the social emphasis will in time, make fuller and fuller of the biological individuality, which is socialised in a different way in the case of each individual ; and will conceive of interpersonal relations as expressions of biological as well as social uniqueness in individual life histories" (Murphy : Historical Introduction to Modern Psychology : 1949, pp 443).

রাখার একটা বিশেষ সংস্থান নিয়ে অথবা হাঁটার সম্ভাবনা নিয়ে মানবশিশু জন্মায়। বিশেষ পরিবেশের মধ্যে পড়লে সেই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়। দু'পায়ে দাঁড়াবার ও হাঁটা শেখার 'অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাময় ব্যবস্থা' নিয়ে শিশু জন্মায়, এই কথা বললে বোধ হয় সত্যের কাছাকাছি কিছু বলা হবে। কিন্তু এ-সম্ভাবনা কি অনুকূল পরিবেশে স্বতই বিকাশলাভ করে? না। তাকে দাঁড়ানো ও হাঁটা শিখতে হয় বা বলা উচিত, তাকে শেখানো হয়। শুধু অনুকূল পরিবেশ নয়, এমন সামাজিক পরিবেশ চাই যেখানে অন্যে হাঁটতে পারে ও তাকে হাঁটা শেখানো যেতে পারে। সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ছাড়া, সক্রিয়-ভাবে কেউ 'হাঁটি হাঁটি পা-পা করে' না-শেখালে শিশু সুস্থ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অভ্যস্ত হবে না। নিজে থেকে শিখলে অনেক সময় লাগবে; হয়ত আদৌ শিখতে পারবে না। দাঁড়ানো ও হাঁটার মত ব্যাপারেই যদি এই জটিলতা থাকে, তবে আক্রমণপ্রবণতার মত মানসিক ধর্মে ও হিংস্র আক্রমণে প্রবৃত্ত হবার মত শারীরিক ধর্মে অনেক বেশি জটিলতা থাকাই স্বাভাবিক। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকলেই ইঁদুর বা শিম্পাঞ্জীরা আপনাথেকেই আক্রমণমুখী হয়ে উঠবে না। প্রজনবিদ্‌দের অসম্মান না-জানিয়েও বলা চলে যে, আক্রমণমুখী হবার মত পরিবেশ সৃষ্টি না-হলে তারা আক্রমণ করবে না। এবং আরও বলা চলে যে-pure strain-এর ইঁদুরদের মধ্যে আক্রমণপ্রবণতা দেখা গেছে, তারা কয়েক পুরুষ ধরে নিশ্চয়ই আক্রমণাত্মক হিংস্র পরিবেশে আক্রমণ শিখেছে। তাদের আক্রমণ-মন্যতা আক্রমণক্ষমতা প্রথমে কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে; কয়েক পুরুষ পরে এগুলো আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স বা সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। ইঁদুরদের সব জাতিই যে আক্রমণমুখী নয়, এ-থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশেষ পরিবেশের মধ্যে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিসংরক্ষণের প্রয়োজনে এই স্বভাব গড়ে উঠেছে। বানরদের বেলায়ও বলা চলে যে, টেম্পোরাল লোবের মধ্যে অবস্থিত আক্রমণের কেন্দ্র তিনটি পশুর বেলায় বিশেষভাবে বিকশিত হবার কারণও তাদের পূর্বপুরুষদের অথবা নিজেদের বিশেষ পরিবেশের মধ্যেই নিহিত ছিল। টেম্পোরাল লোবে অস্ত্রোপচারের ফলে সাময়িকভাবে তাদের শান্ত ও বশ্যে পরিণত করা হয়েছে; কিন্তু অস্ত্রোপচারের ফলে তারা মনে হয়, অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণও হারিয়েছে; যার কোনোরূপ উল্লেখ করা গবেষকরা প্রয়োজন মনে করেননি। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের আরো প্রমাণ দেখা গেছে বানরদের উপর

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে। বানরসমাজেও অলিখিত সামাজিক সংবিধান আছে। সেই সংবিধান মেনে চলেছে ডেভ ও তার সহচররা। মানুষের সমাজ আরো অনেক বেশী উন্নত, নিয়মানুগ এবং শ্রেণীবিভাগ ও বিন্যাস অজস্র ও জটিল। ডেলগাডোর তড়িৎবহ শলাকা প্রয়োগ সাময়িকভাবে লড়াইয়ের ষাঁড়কে আক্রমণবিমুখ করেছিল। তার আক্রমণপ্রবণতাকে চিরদিনের মত নষ্ট করে দিয়েছিল কি? তাকে হিংস্র ও আক্রমণমন্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, লাল রং-এর সঙ্গে তার আক্রমণ প্রবৃত্তিকে কণ্ডিশনড় করা হয়েছে, তবেই সে হিংস্র আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছে। বিশেষ পরিবেশ ও বিশেষ শিক্ষা ছাড়া ষাঁড়কেও হিংস্র করা যায় না। মানুষকে অমানুষ করার জন্য এই ধনতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তাই মানুষের মধ্যে আক্রমণপ্রবণতা। দুচারজন মানুষের মস্তিষ্কে তড়িৎবহ শলাকা ঢুকিয়ে মানুষজাতিকে মানবিক করা যাবে না। সমাজ বদলাতে হবে, প্রশিক্ষণ পালটাতে হবে। ডেলগাডোরা যদি এ-বিষয়ে অবহিত না-হন বা নিশ্চুপ থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই স্থিতাবস্থাকামীদের এই আক্রমণমুখী হিংস্র সমাজব্যবস্থা বজায় রাখতে সাহায্যই শুধু করবেন; মানবকল্যাণে তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করতে পারবেন না। আর যান্ত্রিক জড়বাদীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটালেই হিংস্র ও আক্রমণমুখী মনোভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। নতুন পরিবেশের নতুন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও মনোবিজ্ঞানের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া হাজার-হাজার বছরের শ্রেণীসমাজের বৈষম্য, হিংসা, দ্বেষ, প্রতিযোগিতা আক্রমণমন্যতা দুষ্ট মানবমনকে সুসংস্কৃত উন্নত করার কোনো বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবে না।[৭]

আক্রমণমুখী উচ্ছৃঙ্খলা ও পাশবিকতার প্রকাশকে নির্বিচারে প্রাক্‌বিপ্লবকালীন অথবা পরিবৃত্তিকালীন প্রয়োজনীয় মনোবৃত্তি মনে করার অথবা এই মনোবৃত্তিকে

---

৭ "Mankind should have as its over-all aim a double objective: first to construct a society which will allow for the maximum participation of the individual, all individuals, in the human potentiality; and second, to construct a society which will most rapidly and effectively advance the social potentiality of mankind on all fronts." (Wells: The Failure of Psychoanalysis: pp 223)

আশু-স্বার্থে প্রশ্রয় দেওয়ার সুবিধাবাদকে গ্রহণ করার অর্থ বিপ্লবকে পশ্চাদমুখী করা এবং বিপ্লবোত্তর সমাজে মানবিকতার প্রকাশপথকে কণ্টকাকীর্ণ করা; এ কথা নেতৃস্থানীয়দের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

বিচ্ছিন্নতা ও আক্রমণপ্রবণতা

মানুষের প্রতি মানুষের আক্রমণপ্রবণতার আলোচনায় মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের উল্লেখ অনিবার্য। 'Man is alienated from his species being''—নিজের প্রজাতি থেকে ব্যক্তিমানুষ বিচ্ছিন্ন। মার্কসের এই কথাটির তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় একজন ভাষ্যকার যা-বলেছেন[৮] তা উদ্ধৃত করা চলে।

ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্কচ্যুতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পাশবিকতা আক্রমণপ্রবণতার বীজ।[৯]

স্ব-স্বভাবে মানুষ কি? মানুষ পশুর প্রতিরূপ নয়। মানবতা পাশবতার বিপরীতে অবস্থিত কতকগুলি বিমূর্ত নৈতিক আদর্শ নয়। মানবপ্রকৃতির সংজ্ঞা-নির্ণয়ে নীতিবাগীশ দার্শনিক অন্তর্নিহিত কতকগুলি বিপরীত ধর্মের, যথা: অহংমন্যতা-পরার্থপরতা, বদান্যতা-সংকীর্ণতা; ইত্যাদির উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল-মন্দ, পরোপকারী-স্বার্থান্বেষী, প্রেমাবিষ্ট-বিদ্বিষ্ট;

---

৮ "Marx has taken into account the effects of alienation of labour—both as "estrangement of the thing" and "Self encouragement"—with respect of the relation of man to mankind in general (i e the alienation of "humanness" in the course of its debasement through capitalistic processes). (Meszaros : Marx's Theory of Alienation (1970) p 15)

৯. "An immediate consequence of the fact that man is estranged from the product or his labour, from his life activity, from his species being is the estrangement of man from man. If a man is confronted by himself, he is confronted by the other man. What applies to man's relation to his work, to the product of his labour and to himself also holds of man's relation to the other man, and to the other man's labour and objects of labour. In fact, the proposition that man's species nature is estranged frem him means that one man is estranged from the other, as each of them is from man's essential nature" (Ibid pp 15)

—এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে মার্কসের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিছুই নয়।[১০] নিজের মধ্যস্থতায় নিজেকে ভালমন্দ করে তোলার ক্ষমতা আছে মানুষের। স্থানকালের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ নিজেকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে আবার দেবত্বের পর্যায়ে তুলে ধরতে পারে। এইভাবে বিচার করলে অবশ্য মানবমনে বিপরীত ধর্মের সমাবেশের ব্যাপারটা নিছক কল্পনাবিলাস মনে নাও হতে পারে। তবে এ-কথা কখনই বলা চলে না যে, অন্তর্নিহিত পশুত্ব বা মানবত্বের কেন্দ্র আছে মানবমস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।

মানুষ প্রকৃতিজাত, ইতর প্রাণীর মতই শর্তাধীন ও সীমাবদ্ধ। মানবপ্রকৃতির মধ্যে সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য বহির্বাস্তবের সঙ্গে লেনদেন এক আবশ্যিক প্রক্রিয়া।[১১] মানসিক প্রবণতার পরিপূরণ পরিবেশের শর্তসাপেক্ষ, অথবা বলা চলে, মানসিকতা অন্তর্নিহিত প্রবণতা ও বহির্জগতের বিষয়বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে সমন্বিত ও গঠিত। আবার মনে রাখা দরকার যে মানুষ প্রকৃত থেকে উদ্ভূত হলেও, পুরোপুরি প্রকৃতিজ নয়। সে আবার মানবিকও বটে। সচেতনভাবে নিজের উন্নয়নে সক্ষম। Self transcendence মানবধর্ম।[১২]

---

১০. "He is by nature neither good, nor evil ; neither benevolent, nor malevolent ; neither altruistic nor egoistic ; neither sublime, nor a beast ; etc., but simply a natural being whose attribute is : "Self-mediating". This means that he can make himself become what he is at any given time—in accordance with the prevailing circumstances—whether egoistic or otherwise" (Meszaros. Marx's Theory of Alienation : p 164)

১১ "Man is directly a natural being . he is an active natural being....he is a suffering, conditioned and limited creature, like animals & plants. That is to say, the objects of his impulses exist outside him. as objects independent of him " (Marx : Capital Vol III pp 799-800).

১২. "But man is not merely a natural being, he is a human natural being. That is to say, he is a being for himself. Therefore he is a species being, and has to confirm and manifest himself as such both in his being and in his knowing. And aseverything natural has to have its beginning, man too has his act of coming-to-be—history—which however is for him a known history, and hence is an act of coming to be,—it is a 'conscious self-transcending act' of coming-to-be. (Capital Vol I p 76)

"Conscious self-transcending act"—কথাটি মার্কস বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ভাষ্যকার মেসজারোসের ব্যাখ্যা অনুসারে মার্কসের মতে মানবিক কোনো আবেগই মানবমনের অন্তর্নিহিত ধর্ম নয়। মানবপ্রকৃতিতে অবস্থিত নয় কোনো মানসিক গুণ, সবই অর্জিত।[১৩] মার্কসের মতে আক্রমণ-প্রবৃত্তি হিংস্রতা ইত্যাদি অসদ্ধর্ম মানবপ্রকৃতিগত নয়, ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতে অর্জিত। তেমনি সদ্ধর্মও অর্জিত : self mediation এর মাধ্যমে self transcendence

ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে, সামাজিক কি ধরনের ব্যবস্থায় এই আক্রমণপ্রবৃত্তি মানুষ অর্জন করেছে, এখন আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাই।

নিজের শ্রমোৎপন্ন ফল থেকে বঞ্চিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের অবস্থা অতীব করুণ ও অসহায়। সব ব্যাপারে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। অর্থ এই সমাজে সব রকমের ঘটন-অঘটন পটীয়সী। সব কিছুর মূল্যই কাঞ্চনমূল্যে নির্ধারিত। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ দ্বারা ব্যক্তি-মূল্যায়ন হয় না। "অর্থ আস্থাকে অনাস্থা, প্রেমকে ঘৃণা, ঘৃণাকে প্রেম, পুণ্যকে পাপ, পাপকে পুণ্য, প্রভুকে ভৃত্য, ভৃত্যকে প্রভুতে রূপান্তরিত করে"। পাভলভীয় মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা চলে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের স্নায়ুসংস্থা অতিস্ববিরোধী অবস্থায় (ultraparadoxical phase) ও অস্থিরতাব্যাধিতে ভুগছে। আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষের পান-ভোজন-প্রজনন ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবিক ক্রিয়াকলাপ যান্ত্রিক জৈবিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে মানুষ নিস্পৃহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অতি-স্ববিরোধী অবস্থার দরুন মানবিক সবকিছু পাশবিক মনে হয়, পাশবিক ধর্ম মানবিক প্রতিভাত হয়। "What is animal becomes human and what is human becomes animal." পশুধর্ম যথা জিঘাংসা রিরংসা আক্রমণপ্রবণতা মানবধর্ম বলে প্রতীয়মান হবার ফলে মানুষ নির্বিচারে এইসব পাশবকর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং এর জন্য বিবেকের দংশন-জ্বালা অনুভূত হয় না। শুধু শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষেরই এই অবস্থা হয়েছে

---

১৩ "It is not at all implanted in human nature, but it is a 'human achievement' Human nature is not something fixed by nature, but, on the contrary, a 'nature' which is made by man in his acts of self transcendence" (Meszaros : Marx's Theory of alienation : p 170)

ভাবলে ভুল হবে। মার্কসের মতে মুনাফার মালিকও সমানভাবে বিচ্ছিন্নতা-পীড়িত। মনে রাখা দরকার, বিচ্ছিন্নতা এক সক্রিয় গতিশীল ধারণা ; কাজেই পরিবর্তন সম্ভাবনা এর মধ্যে সব সময়েই বিদ্যমান। বিচ্ছিন্নতার ফলে কেবলমাত্র চেতনার স্তরে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে ভাবলে ভুল হবে। বিচ্ছিন্নতার চেতনাও মানবমনে অনুভূত হচ্ছে। এবং এর ফলে বিচ্ছিন্নতা-নিরসনে মানুষ সক্রিয় ও সচেষ্ট হতে পারছে। যাঁরা সমাজ পরিবর্তনে অবিশ্বাসী, তাঁরাই শুধু বিচ্ছিন্নতাকে 'অনড় সামগ্রিক' (inert totality) বলে মনে করেন। এই সমাজে একদল মানুষ যেমন পশুধর্ম প্রভাবে আক্রমণমুখী হয়ে প্রজাতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে লিপ্ত, তেমনি আবার অন্য দল নিজেদের পশুধর্ম ও পাশব আচরণ সম্বন্ধে সজাগ এবং পশুধর্ম পরিহারের উপায় নির্ধারণেও রত। জিঘাংসা, আক্রমণ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি পশুধর্মের সীমা অতিক্রম করে মানবিক ধর্মে উত্তরণের উপায় বিমূর্ত মানবতার জয়গান নয়, ধর্ম ও শাস্ত্রীয় শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন নয়, মস্তিষ্কের টেম্‌পোরাল লোবে অস্ত্রোপচার বা অন্য কোনো কেন্দ্রে তড়িৎ-শলাকা প্রয়োগ নয়। আবার ধনতন্ত্রের উৎখাত ও ব্যক্তি-সম্পত্তির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছিন্নতার নিরসন ও মানবিকতার অভ্যুদয় ঘটবে, যান্ত্রিক জড়বাদীদের এ-ধারণাও সঠিক নয়। তবে ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে মানবিকতা উন্মেষের পক্ষে অতি আবশ্যিক প্রাথমিক পদক্ষেপ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুরণো সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধের মূল উৎপাটনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে, কিন্তু এই কাজের জন্য মানুষকে নতুন করে শিক্ষা দিতে হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, ইনষ্টিটিউশনগুলির আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

কাঠামো পরিবর্তন করাই যথেষ্ট নয় ; আদর্শ মানুষ গঠনের প্রাথমিক শর্ত মানুষের বন্ধন ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি। এই মুক্তি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান দিতে পারে বলে মনে হয় না। আত্মসত্তার সঙ্গে সংযুক্তি ও প্রজাতির অন্যান্যের সঙ্গে সংহতিসাধন বহির্বাস্তব ও অন্তরমানসের জটিল দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া সম্ভব নয়। মানবতা-নৈতিকতাবোধের উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশের প্রক্রিয়া সমাজ ও ব্যক্তিমানসের মধ্যেকার লেনদেনের প্রক্রিয়া ; two-way traffic। সমাজ থেকে গ্রহণ ও আত্তীকরণ যাকে বলা হয় internalisation, পরে সমাজকে গৃহীত মানবতা-নৈতিকবোধ প্রত্যর্পণ (externalisation) ;

আবার সমাজে অর্পিত অধিকতর ব্যাপ্ত মানবিক গুণের internalisation-এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন এবং সেই উন্নততর মানসিকতার সাহায্যে আবার সমাজের নবীকরণ। এই ব্যাপারে মার্কস বর্ণিত "self-mediation"-এর কথা মনে রাখা দরকার। "self-mediation" ছাড়া "self-transcendence" অসম্ভব। মার্কস সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে বলেছেন যে, বিচ্ছিন্নতার নিরসনের জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষকে স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে হবে না, বরং সেখানে ব্যক্তিত্ব আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নব-নব সম্ভাবনায় ভাস্বর হয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দেবে নতুন সমাজে। পাশবতা হিংস্রতা আক্রমণমুখীনতা দূরীকরণের, বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের অর্থ আত্ম-নিমজ্জন বা ব্যক্তি-সমষ্টির একীকরণ নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণপ্রকাশ, বলিষ্ঠ সামাজিক মানুষের উদ্ভব ঘটলেই বরং বিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হবে, মানব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। মার্কসের কথায়, "Alienation is transcended only if the individuals reproduce themselves, but as social individuals." ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি খণ্ডিত নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন, আবার আমলাতান্ত্রিক কালেক্টিভ সমাজে ব্যক্তি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না-হলেও, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শুধুমাত্র খাঁটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের এবং মানবিক ও সামাজিক হবার সুযোগ অধিকার সংরক্ষিত।

সংক্ষিপ্তসার

এ স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে বিশদ বা সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। অনেক কিছুই অনুক্ত ও অনুল্লেখিত থাকতে বাধ্য। হিংস্রতা উগ্রতা আক্রমণের মনোভাব ইত্যাদি পাশব প্রবৃত্তি বিশেষ সামাজিক পরিবেশে মানুষের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। আক্রমণের মনোভাব স্বভাবজাত নয় বটে, কিন্তু আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি স্বভাবজাত। আত্মরক্ষার্থে মানুষ কোনো-কোনো সময় আক্রমণমুখী হয়ে উঠতে পারে। ব্যক্তি পার্টি সম্প্রদায় জাতি বিশেষ কারণে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনে আক্রমণে হিংস্র ব্যবহারে প্রবৃত্ত হতে পারে। আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি বা পার্টি আদর্শ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আক্রমণপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে। হিংস্র আক্রমণাত্মক ব্যবহার অনেক সময় শল্যচিকিৎসকের দুষ্টক্ষতনিরাময়ার্থ অস্ত্রোপচাররূপে বিবেচিত হতে পারে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, মানবহিতের

জন্য, আক্রমণমূলক ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অর্জুনকে অভিভাবন দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ; অন্যজাতির প্রজাকে আক্রমণ করা জাতীয় কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। নিপীড়িত জাতি বা শ্রেণী উৎপীড়কের শৃঙ্খলমুক্ত হতে অনেক সময় হিংস্র আক্রমণে রত হয় এবং উৎপীড়কের রক্তের ঋণ রক্ত দিয়ে পরিশোধ করা মুক্তিযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ মনে করে। এই সময় বৈরী জাতি বা শ্রেণীভুক্ত যে কোনো ব্যক্তির ছলেবলে কৌশলে প্রাণনাশ করা গৌরবজনক বিবেচিত হয়। এই ধরনের বহুবিধ আক্রমণপ্রবৃত্তি ও হিংসাত্মক ব্যবহার প্রায়ই সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হতে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট আক্রামক বিবেকপীড়া অনুভব করে না। ব্যর্থতাবোধ থেকে আক্রমণপ্রবৃত্তির উদ্ভব ঘটলে আক্রামক ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যের উপরও আক্রোশ প্রকাশ করতে পারে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, পার্টিতে পার্টিতে সংঘর্ষ ও দুইদেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় প্রায়ই যুযুৎসুদের মধ্যে গণহিষ্টিরিয়া ও 'প্যারানইয়ার' প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তখন অত্যন্ত নিরীহ ভীরু প্রকৃতির মানুষও মারমুখী হয়ে ওঠে। নিজের সম্প্রদায়, পার্টির সভ্য ও দেশবাসীর কাছে বীরত্ব ও বাহাদুরী দেখানোর মোহে তারা অনেকসময় বিনা প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী আক্রমণাত্মক আচরণে প্রবৃত্ত হয়। তবে সাধারণত এক বিশেষ ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী যারা, তাদের মধ্যেই আক্রমণমুখী মনোভাবের প্রকাশ বেশি ঘটে। পাভলভীয় পরিভাষায় এদের বলা হয় 'কোলেরিক' বা হঠকারী টাইপ। এদের মস্তিষ্ককোষে উত্তেজনাপ্রবণতা বেশি, নিস্তেজনাক্ষমতা কম। শিকারী কুকুর, সংগ্রামী ষাঁড় বা হিংস্রভাবাপন্ন ইঁদুর এই টাইপভুক্ত। তবে এদের বেলায় "selective breeding"-এর সাহায্যে "pure strain" তৈরী করা হয়েছে; মানুষের বেলায় সেটা সম্ভব নয়। বিশেষ পন্থা বা অভিভাবনের সাহায্যে অনেককে একযোগে 'কোলেরিক' টাইপের. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনোভাবাপন্ন করা যায়। 'কোলেরিক' টাইপের কতখানি তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য ও কতখানি আশৈশব পরিবেশ প্রভাবিত; তার পরিমাপ করা কঠিন। ডেলগাডো এই অব্যবস্থিত টাইপের মগজে তড়িৎশলাকা ঢুকিয়ে হয়তো ঈপ্সিত ফল পেতে পারেন। কিন্তু সে-ফল সাময়িক হবার সম্ভাবনাই বেশি। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ও নতুন প্রশিক্ষণ ছাড়া এদের উত্তেজনাপ্রবণতাকে নিরুদ্ধ রাখা যাবে না। আর সংখ্যায় এরা নগণ্য:

অসুস্থতার চিকিৎসা হিসেবে হয়ত ডেলগাডোর পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে, কিন্তু তাতে সমাজের হিংস্রতা আক্রমণপ্রবণতার প্রশমন ঘটবে না।

আক্রমণপ্রবৃত্তির উন্মেষ বিকাশ ও সম্প্রসারণের আলোচনায় মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের উল্লেখ শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অপরিহার্য বলে মনে করি। আগেই লিখেছি, পুরণো সমাজব্যবস্থা যখন অচল হয়ে নতুনের আগমনপথ রোধ করে, তখন কিছু-সংখ্যক মানুষ পুরণো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পুরণো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ কোনো সময় মৃদু, কোনো সময় তীব্র, কখনও নীরব, কখনও সোচ্চার, কোথাও সংস্কারকামী, কোথাও ধ্বংসাত্মক। পুরণো সমাজব্যবস্থা ও পুরণো নীতিবোধের প্রতি অনাস্থা জানাবার জন্য সব পদ্ধতি যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, এবং পুরণো ব্যবস্থা যখন আপোষ করেও সমস্যা মেটাতে পারে না; তখনই সাধারণত আক্রমণমুখী হিংস্রপ্রকৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য সব বিচ্ছিন্ন মানুষই যে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে, এমন নয়। বিচ্ছিন্নতার মনোভাব প্রধানত দুইভাবে প্রকাশ পায়। অহিংস হিপী মনোভাব ও হিংসাশ্রিত ধ্বংসকামী মনোভাব। এই হিংসাশ্রিত ধ্বংসকামী মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে ও প্রতিশোধ-প্রতিহিংসামূলক আক্রমণে।

উপসংহার

সবশেষে 'পশুপ্রবৃত্তি' সম্পর্কে দু'একটি কথা দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব। 'পাশব' কথাটি আমরা খুবই হালকাভাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। হিংসাত্মক প্রতিযোগিতা, আক্রমণমূলক ব্যবহার ইত্যাদি নিন্দাসূচক আচরণ আমরা পাশব আখ্যায় অভিহিত করি। আমাদের জানা উচিত, সব পশু-প্রাণীর মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহার দেখা যায় না। প্রকৃতি সবসময় হিংস্র ভয়ানক নয়। ধনতান্ত্রিক আমলের সমাজতাত্ত্বিকরা "সোশ্যাল ডারুইনইজম" কথাটি চালু করে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ প্রকৃতি ও পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া বর্বরতা, হিংস্রতা আক্রমণমুখীনতা নিয়ে সমাজ গড়েছে; পাশবতা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তাঁরা জন্মসূত্রে পাওয়া ব্যবহার বলে চালাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ভাবধারায় অনু-প্রাণিত হয়েই আজকের কিছুসংখ্যক গবেষক মানবমস্তিষ্কে 'আক্রমণাত্মক' কেন্দ্র খুঁজে-চলেছেন। এই 'সোশ্যাল ডারুইনিজম'-এর কল্পনা একপেশে ভ্রান্ত

তথ্য-উপাত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্পেন্সার, মালথুস এবং গোড়ার দিকে টি, এইচ, হাক্সলী এই মতের সপক্ষে প্রচার চালান। পরে হাক্সলী তাঁর ভুল উপলব্ধি করেন এবং ১৮৯৩ সালে অক্সফোর্ডে 'রোমানিস বক্তৃতা' প্রসঙ্গে বলেন যে, অভিব্যক্তির পথে টিঁকে থাকার উপযুক্ততার মধ্যে অন্যের সঙ্গে নির্মম প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা বেশি ফলপ্রসূ। ক্রপটকিন (১৯০২) এই কথারই প্রতিধ্বনি করেন তাঁর "মিউচুয়াল এইড, এ ফ্যাক্টর ইন ইভোলিউশন", গ্রন্থে। আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিক লেষ্টার ওয়ার্ডও এই মত সমর্থন করেন, তাঁর 'দি এ্যাসেণ্ট অব ম্যান' পুস্তক। কিন্তু এই সময় ধনতন্ত্র একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হবার পথে পা-বাড়িয়েছে। দুর্বলকে পদদলিত করে অবাধ মুনাফার বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। নির্মম প্রতিযোগিতা ও হিংস্র আক্রমণ এদের সম্প্রসারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কাজেই শুভবুদ্ধির বাণী ও সৎ বিজ্ঞানীদের মতামত অরণ্যে রোদনের বেশি ফলপ্রসূ হল না। অ্যাশলে মণ্টেগু তাঁর বিখ্যাত পুস্তক (১৯৬০) 'অন্ বিইং হিউম্যান'-এর মধ্যে এমন অনেক জীব ও প্রাণীর উল্লেখ করেছেন যারা সহযোগিতামূলক আচরণের পথে টিঁকে রয়েছে। অধ্যাপক ডব্লিউ, সি এ্যালি (এ্যানিমল এ্যাগ্রেশন—১৯৩১) গোল্ডফিসের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তারা দল বেঁধে থাকলেই সুস্থ থাকে ও স্বজনবৃদ্ধি করে। অনেক প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রেও পরীক্ষা করে দেখা গেছে; সঙ্ঘবদ্ধতা ও অনাক্রমণমন্যতা প্রজাতিবৃদ্ধির সহায়ক। হার্বার্ট স্পেন্সারের মত খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন, "অনেক চিন্তা করে আমি হার্বার্ট স্পেন্সারের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সহযোগিতার শক্তি প্রতিযোগিতাশক্তির চেয়ে জোরালো। ...তা যদি না-হত তবে এককোষীজীব থেকে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জটিল প্রাণীর বিবর্ধন ঘটত না।" এমন অনেক আদিম মনুষ্য সমাজের সন্ধান এ্যাশলে মণ্টেগু দিয়েছেন, যারা আক্রমণাত্মক বা হিংস্র ব্যবহারে পরাঙ্মুখ।[১৪]

আমরা এই প্রবন্ধে 'আক্রমণমুখী', 'আক্রমণাত্মক', 'আক্রমণপ্রবণতা' ইত্যাদি

১৪. "The condition of conflict which arise in man do not normally originate from within him, from his organic states, but from those social conditions which have a disordering effect upon him and which fail to satisfy his needs." (Montague : On being Human : Rupa, 1960 pp 95)

শব্দগুলি 'aggressive' কথাটি বোঝাতে ব্যবহার করেছি এবং দ্বন্দ্ববিরোধ হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার ভাব 'aggressiveness'-এর মধ্যে নিহিত, এইরকম ধরে নিয়েছি। সেই অর্থেই কথাগুলিকে পাঠকরা গ্রহণ করবেন। কোনো-কোনো মনস্তাত্ত্বিক "aggressiveness" "conflict" "combativeness" ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[১৫]

বলা বাহুল্য, অনাক্রমণমূলক aggression সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য প্রযোজ্য নয়।

একটি বিশেষ জরুরী কথা এখনও বলা হয় নি।

আক্রামকের শক্তি, বল, অস্ত্রসম্ভারের সঙ্গে আক্রমণের মনোভাব বিশেষভাবে সম্পর্কিত। শক্তিমানের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করলে তার পক্ষে আক্রমণমুখী হবার সম্ভাবনা বেশি। ব্যক্তি ও জাতি দুয়ের ক্ষেত্রেই এইরকম ঘটে থাকে। শক্তিহীনের পক্ষে নতি স্বীকারের ও পলায়নী মনোবৃত্তিই স্বাভাবিক ধর্ম। অবশ্য অন্য কোনো পথ খোলা না-থাকলে শক্তিহীনও মরিয়া হয়ে মারমুখী হতে পারে। তবে রণহুঙ্কার ও আক্রমণের ডাক পরাক্রান্ত অস্ত্রায়ুধশালীই দিয়ে থাকে। ব্যক্তি যখন নিজের পেশীশক্তি-অহংকৃত, জাতি যখন শক্তিমদমত্ত, তখনই তার আক্রমণ করার মনোবৃত্তি জাগে। পশ্চিমবঙ্গে হাতবোমা ও পাইপগান সহজপ্রাপ্য হওয়ার ফলে এখানে আক্রমণমুখী মনোভাবের প্রসার ঘটেছে, এ-কথা বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না। এ-কথা বলা সত্ত্বেও, আমি অস্ত্রকে, আক্রমণীশক্তিকে প্রধান চালিকাশক্তি মনে করি না। মানুষই অস্ত্র নির্মাণ করে, অস্ত্র চালনা করে। মানুষের ন্যায়বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, মানবতাবোধ, অন্য মানুষের সঙ্গে অভিন্নতাবোধ তার শক্তিকে সংহত করে, সুপথে চালিত করে। এই সূত্রে অনেক শান্তিকামী আদর্শবাদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্ত্র উৎপাদনের সহায়ক বলে মানুষের সর্বনাশের কারণ মনে করেন। তাঁরা ভুলে যান, যে-আগুনে সব ধ্বংস হয়

১৫. "All drives may be said to be aggressive. Aggressiveness should not be equated with hostility. It is possible to be aggressive without being either hostile, combative, competitive or conflict producing. Aggression may be co-operative. It may be defined as the outward direction of energy." (I. Hendricks: Psychoanalystic Quaterly Vol II 1941 pp 33-59).

সেই আগুন ছাড়া সভ্য মানুষের শান্তির কাজ একদিনও চলে না। পারমাণবিক শক্তি ধ্বংস অথবা সৃষ্টি দুইই করতে সক্ষম। মানুষের সমাজব্যবস্থা আগ্রাসী না শান্তিকামী, তার উপর শেষপর্যন্ত সবরকম শক্তির ব্যবহার নির্ভরশীল।

এই রাজ্যের বর্তমান সঙ্কট প্রসঙ্গে একটি কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করছি।

আজ পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ক্ষোভ অস্থিরতা ক্রোধ ও আক্রমণপ্রবণতার প্রকোপবৃদ্ধিতে অনেকেই বিব্রত; কিন্তু প্রতিকারপন্থা নির্ধারণে ও কর্মসূচি গ্রহণে আমরা সবাই দ্বিধাগ্রস্ত। সকলেই শাসক ও বিরোধী দলগুলির উপর দোষারোপ করেই দায়িত্বমুক্ত হতে চাই। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বর্তমান সঙ্কটের উৎসসন্ধানে সমীক্ষকরা পরাঙ্মুখ। মানসিকতার এই বিপর্যয় আর্থনীতিক-সামাজিক বিশৃংখলার মধ্যে নিহিত; শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। এ-রাজ্যের মানুষের 'জিনে' তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে হঠাৎ কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে অথবা কোনো অজ্ঞাত কারণে তাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এটনার মত অগ্নিগর্ভ সুপ্ত-কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে; এ বোধহয় কেউই মনে করেন না। সকলেই জানেন, বহুবছর ধরে ঘনায়মান দুর্যোগের অন্তরালে উদ্যোগপর্ব চলছিল, আজ প্রকাশ্য কুরুক্ষেত্রের সূচনা দেখা দিয়েছে—এই মাত্র। আজ পঁচিশ বছর ধরে এই রাজ্য যত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার কোনটিরই সুষ্ঠু সমাধান ঘটেনি। সমস্যাবলী আজ বহুমুখী দুষ্টব্রণের রূপ নিয়ে সঙ্কটাকারে সমুপস্থিত। সেই রুগ্ন সমাজের প্রভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিমানসে আজ অস্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থা। শুধু রুগ্ন সমাজের দুষ্টব্রণের উপর অস্ত্রোপচার করলেই চলবে না। রুগ্নমানসিকতা দূরীকরণের ও বলিষ্ঠ সুস্থ মনোভাব গঠনের কর্মসূচি নির্ধারণের পরিকল্পনা অবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু তার আগে চাই আক্রমণ-মুখিনতা হিংস্রতা ধ্বংসকামিতার উৎস নির্ণয়।

পরিশিষ্ট

অরওয়েল জর্জ : (1903-1950).

'১৯৮৪'—এই বই খানির রচয়িতা হিসেবে জগৎবিখ্যাত। তাঁর জন্ম আমাদের এই বংলায়। তিনি স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধে 'লয়ালিষ্ট'দের পক্ষ হয়ে লড়াই করেন। সমাজতন্ত্রবিরোধিতাকে তিনি 'টোটালিটেরিয়ানিজম্' আখ্যায় অভিহিত করে বুর্জোয়া সুধীসমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর এই বইটি ও হাক্সলির 'ব্রেভনিউ-ওয়ারল্ড'—কমুনিষ্ট-বিরোধিতার দলিল রূপে বিশেষভাবে অভিনন্দিত। তাঁর বইয়ের ১৯৬১ সালের সংস্করণের (নিউ আমেরিকান লাইব্রেরী) পরিশিষ্টে এরিক ফ্রম লেখেন : George Orwell's 1984 is the expression of a mood, and it is a warning. The mood it expresses is that of near despair about the future of man, and the warning is that unless the course of history changes, men all over the world will lose their most human qualities, will become soulless automatons and will not be even aware of it.

ইয়ুং গুস্তাভ (1875-1961)

সুইস্ মনোরোগচিকিৎসক ও "এ্যানালিটিক্যাল সাইকলজি" স্কুলের স্থাপয়িতা। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডের শিষ্য। ১৯১১ সালে মত বিরোধের ফলে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। ইয়ুং মনে করেন, ফ্রয়েড অযথা যৌনতার উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইয়ুং মানুষকে 'এক্স্ট্রোভার্ট ও ইনট্রোভার্ট'—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। এক্স্ট্রোভার্টরা বহির্মুখীন, বাইরের জগৎ থেকে তাদের অনুভূতি চিন্তা, ভাবনা, স্বজ্ঞা ইত্যাদির উপাদান আহরণ করে। আর অন্তর্মুখীন বা ইনট্রোভার্টরা নিজেদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি গঠন করে।

নির্জ্ঞানে শুধু অবদমিত কামেচ্ছা বা অসামাজিক লিপ্সা থাকে না; (ফ্রয়েডের অভিমত) সেখানে আরো থাকে সেই সব প্রবণতা যা কোনো কারণে ব্যক্তি-সংজ্ঞানে অভিব্যক্ত হতে পারেনি। যেমন, অতিযুক্তিবাদীর প্রক্ষোভ-প্রবণতা, অতি-পৌরুষ প্রদর্শকের নারীসুলভ দুর্বলতা ইত্যাদি। ইয়ুংএর 'আর্কিটাইপ' কথাটি শিল্পী সাহিত্যিক মহলে বিশেষ সমাদৃত। ইয়ুংবাদ বিজ্ঞানীমহলে অপাঙক্তেয়, সাধারণের কাছে অসমাদৃত; তবে ধর্মবিশ্বাসী, বিশেষ করে, রোমান-ক্যাথলিকদের কাছে 'আর্কিটাইপতত্ত্ব' বিশেষ গুরুত্ববহ।

উইলসন কলিন

এঁর 'দি আউট-সাইডার' প্রথম প্রকাশিত ১৯৫৩ সালে। এক বছর আটটি সংস্করণ নিঃশেষিত। পঞ্চাশের দশকের চমকপ্রদ ও আলোড়ন জাগানো পুস্তক। 'আউট-সাইডার' সমস্যাটিকে যুগসমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত করেন উইলসন। বইটির পরিচয়লিপিতে লেখা আছে: And what is the significant figure of our own age—the age which lies beyond Darwin and Freud, Einstein and the Atom Bomb. This very remarkable book provides what may be the answer: the "Outsider." 'আউটসাইডার' সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়না—অথচ সমাজের সঙ্গে নিজেকে একাত্মীভূত ও করতে পারে না। বুর্জোয়া সমাজের এই দ্বন্দ্ব সংকটের সমাধানের উপায়—ধর্মের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ। 'আউট-সাইডার' সমস্যা ব্যক্তি-মুক্তি সমস্যা। অরওয়েলের মত রাজনৈতিক বন্ধন বা 'টোটালিটেরিয়নিজম্ থেকে মুক্তি সমস্যা নিয়ে উইলসন তত বেশি আলোচনা করেননি। তিনি বন্ধনের গভীরতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'কসমিক বিচ্ছিন্নতা' প্রধানত তাঁর আলোচ্য। 'ইষ্টার্ণ মিষ্টিকদের' প্রতি পশ্চিমী বুদ্ধি-বাদীদের' আজ যে আগ্রহ, তার মূলে অনেকখানি বোধ হয় উইলসনের এই চিত্তাকর্ষক বইটির প্রভাব।

এ্যাড্‌লার এ্যালফ্রেড্‌ (1870-1937)

অষ্টিয়ার অধিবাসী, মনোরোগ চিকিৎসক। 'ইনডিভিজুয়াল সাইকলিজি' স্কুলের স্থাপয়িতা। প্রথম জীবনে ইয়ুংএর মত ফ্রয়েডের মন্ত্রশিষ্য; ১৯১১ সালে

বিবাদ ও বিচ্ছেদ। এঁর তত্ত্বকে এক কথায় বলা চলে 'ক্ষতিপূরণ' তত্ত্ব বা "ক্ষমতালাভ অভীপ্সা"। ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতা স্বভাবজাত মনে করেন এ্যাড্‌লার। এই স্বভাব-হীনমন্যতা দূর করতে চায় সে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে। নানাভাবে এই হীনমন্যতা দূর করার ও ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে চলে। বড় হয়ে যাঁরা বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের কারো কারো শৈশবে তোতলামি ছিল; অনেক চিত্রশিল্পীর ছিল দৃষ্টি-অল্পতা; অনেক স্বরশিল্পীর ছিল আংশিক বধিরতা। নীৎসে ক্ষীণজীবি ছিলেন তাই সুপারম্যানের কল্পনা করেছিলেন, স্যাণ্ডোর ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁকে শক্তি-আয়ত্তের প্রেরণা জোগায়। অনেক সময় ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে। ভীতু লোক অন্যকে ভয় দেখাতে অভ্যস্ত হয়, খর্বকায় মানুষ অন্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। নেপোলিয়ান, হিট্‌লার, মুসোলিনি, ষ্ট্যালিন সকলেই খর্বকায় ছিলেন। যদি এসব কিছু না পারে, তবে সে নিউরোটিক হয়ে পড়ে।

মানব প্রকৃতির এই অতিসরলীকরণ তত্ত্ব দু' একটি ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হলেও, আদৌ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

কামু এ্যালবেয়ার (1913-60)

সার্ত্র-এর একসময়কার সহযোদ্ধা ও বন্ধু। এ্যালজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। শেষের দিকে তাঁদের মতভেদ ঘটে। ১৯৫৭ সালে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর "দি' আউট্ সাইডার," দি মিথ্ অফ্ সিসিফাস', দি প্লেগ"—ইত্যাদি গ্রন্থ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। নীৎসে ও শোপেনহাওয়ার কতৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত। কেন বাঁচবো? এই প্রশ্ন ও আত্মহত্যার সমস্যা—তাঁকে সারাজীবন আকৃষ্ট করেছে। মানুষের উদ্ভটত্ব, তীব্র হতাশাবাদ, প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও যুক্তিবাদবিরোধিতা প্রচারের জন্য অভিনন্দিত ও নিন্দিত। তাঁর মতে বিচ্ছিন্নতা মানবজাতির অস্তিত্ব সম্পর্কিত সমস্যা। এ সমস্যা সমাধান-অসাধ্য।

কাফকা ফ্রান্‌জ্ (1883-1924)

জন্মসূত্রে চেক, ধর্মে ইহুদী, লিখেছেন জার্মান ভাষায়। তাঁর মৃত্যুর পর লোকে তাঁর নাম জানে। ১৯৩০ সালে "দি কাস্‌ল" ও ১৯৩৫ সালে "দি ট্রায়াল" ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম শিক্ষিত মহলে

পরিচিতি লাভ করে। অকিঞ্চিৎ জীবনের 'অনিশ্চয়তা,' 'আকস্মিকতা,' ব্যক্তির অনৈচ্ছিক অর্থহীন অনুগামিতার শিল্প-রূপ তাঁর লেখায় নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত। তাঁরই প্রভাবে রচিত হয় বোধ হয়, পরবর্তীকালে অরওয়েলের '১৯৮৪'। বেকেটের উপন্যাসেও তাঁর প্রভাব প্রতিফলিত। অ্যাবসার্ড নাটকের বীজ মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সুপ্ত। সুররিলায়িষ্টদের উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রথম দিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁর লেখার কদর ছিল না। কয়েক বছর আগে তাঁর জন্মস্থান 'প্রাগে' তিনি পুণর্বাসিত হন।

কিয়ের্কেগার্ড সোরেন (1813-55)

ডেনমার্কের প্রখ্যাত রহস্যবাদী চিন্তাবিদ্। তাঁকে অস্তিবাদের জনক বলা চলে। 'দি কন্‌সেপ্ট অফ ফিয়ার' (1844) ও 'দি সিকনেস্ আনটু ডেথ' (1849) ;—তাঁর প্রধান রচনা। বইদুটিতে আছে আদিপাপ ও নানারকমের সন্দেহ হতাশার বিবরণ। হেগেলকে তিনি 'এক্‌ষ্ট্রিম্ সাব্‌জেক্‌টিভিজম'-এর অবস্থান থেকে সমালোচনা করেছেন। সত্য এঁর কাছে সব সময়েই 'সাবজেকটিভ'। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আপেক্ষিক নীতিবাদের সমর্থক। তাঁর মতে ভীরুতা, নৈরাশ্যবোধ ও ঘৃণার মনোভাব জনমানসের বৈশিষ্ট্য। ধর্মভিত্তিক অস্তিত্বই তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বমণ্ডিত। মানব-অস্তিত্ব সীমা ও অসীমের, অস্থায়ী ও চিরস্থায়ীর সংশ্লেষণ। শেষ জীবনে তিনি সরকারী চার্চের সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষার ও ধ্যানধারণায় প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে, মার্সেল ও জ্যাসপার্সএর উপর।

কোন-বেণ্ডিট

গ্যাব্রিয়েষল (১৯৩৬) ও ড্যানিয়েল (১৯৪৫) Obsolete Communism, The Left Wing Alternative এর লেখক। ১৯৬৮ সালের ফরাসী ছাত্র বিপ্লবের নায়ক হিসেবে ড্যানিয়েল (রেড্‌ড্যানি) বিশ্বখ্যাত।

পাভলভ ইভান পেত্রভিচ (1849-1936)

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অভ্যাসলব্ধ পরাবর্তক্রিয়া (কনডিশন্‌ড্ রিফ্লেস) সম্বন্ধে গবেষণারত ছিলেন। তাঁর পরীক্ষাপদ্ধতি শারীরবিদ্যার

গবেষণায় যুগান্তকারী। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করে মস্তিষ্ক-নির্ভর বা বিজ্ঞানসম্মত মনোবিদ্যা গড়ে ওঠে। পাভলভতত্ত্ব-অনুসারে—মানবচৈতন্যসহ যাবতীয় মননক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। ওয়াট্‌সন প্রবর্তিত ও স্কিনার কর্তৃক সমৃদ্ধ ব্যবহারবাদের সঙ্গে অথবা যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পাভলভ-বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

ফ্রয়েড সিগমুণ্ড: (1856-1936)

নির্জ্ঞানতত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণবাদের জনক ফ্রয়েড সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি নিজেকে 'মেটাসাইকলজিষ্ট' মনে করতেন এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন মননক্রিয়া ও মনোরোগব্যাখ্যা ও মনোরোগচিকিৎসার পত্তন করেন। বর্তমানে ফ্রয়েডের উত্তরসূরীরা ফ্রয়েডবাদকে অনেকাংশে সংস্কৃত-মার্জিত করেছেন। অবশ্য তাঁরা ভাববাদী প্রত্যয়ে অটল; কিন্তু সব ব্যাপারে 'লিবিডো-তত্ত্বকে' প্রাধান্য দিতে চান না। এঁদের মধ্যে প্রধান এরিক ফ্রম মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহী। তাই তাঁর উল্লেখ বারবার আমাদের লেখায় এসেছে। 'মার্কস, ফ্রয়েড ও বিপ্লব' শীর্ষক আলোচনায় এরিক ফ্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বর্তমানে ইয়োরোপ-আমেরিকায় চিকিৎসার ব্যাপারে ফ্রয়েড-বাদের চেয়ে ব্যবহারবাদ অনেক বেশি প্রভাবশালী। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের উপর ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান, স্বপ্নপ্রতীক ও অন্যান্য প্রকল্পের প্রভাব অপরিসীম। ফ্রয়েডবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্করহিত।

সার্ত্র জাঁ পল (জন্মে ১৯০৫)

যুদ্ধ বিরোধী, শান্তিবাদী মানবদরদী ফরাসী লেখক ও দার্শনিক। নিরীশ্বর অস্তিবাদী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসীবিরোধী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি। জার্মান অস্তিবাদী দর্শনের প্রধান প্রবক্তা মার্টিন হাইডেগার ও ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। মার্কসবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু ভাববাদী দর্শনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারার জন্য মার্কসবাদকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। মার্কসবাদ ও অস্তিবাদ মিশিয়ে তিনি এক সম্পূর্ণ জীবনদর্শন গড়ে তুলতে চান। ব্যক্তি মুক্তির উপাসক শিল্পী লেখকদের উপর সার্ত্র-এর প্রভাব অনস্বীকার্য্য। 'বীইং ফর হিম্‌সেলফ্',

"বীইং ইন্ ইট্‌সেলফ্', 'ম্যান্ ইজ্ হোয়াট হি মেক্‌স্ হিমসেল্ফ'—তাঁর রচনার এই উদ্ধৃতিগুলো খুবই পরিচিত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি সম্যক্ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত নয়—এই অভিমত প্রচারের জন্য ও মার্কসবাদের সমালোচনার জন্য তিনি কমিউনিষ্ট মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি, যদিও মাঝে মাঝে পার্টির হয়ে তিনি অনেক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাকে তীব্রভাবে অনুভব করেছেন ও সমষ্টির সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেছেন ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাইডেগার মার্টিন

অস্তিবাদ দর্শনের প্রধান প্রবক্তা। জার্মান (পার্থিব বা অনাধ্যাত্মিক) তত্ত্বের প্রচারক। অন্তর্জাত প্রক্ষোভ বা স্বতঃস্ফূর্ত অর্দ্ধস্ফুট চেতনা দ্বারা মানুষমাত্রেই পরিচালিত। সব সময়ে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি—এই উপলব্ধি মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য, গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং উদ্দেশ্য, আদর্শ, বৈজ্ঞানিক বিমূর্তায়ন ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। নৈরাশ্যবাদ ও বিজ্ঞানবিরোধিতার জন্য বিদিত। নাৎসীদর্শনের সমর্থক। কামু ও সাত্র্-তাঁর মত নিরীশ্বর অস্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসিবিরোধী।

হাক্‌স্‌লি আলডু (1894-1963).

উপন্যাস, কবিতা নিয়ে প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থের প্রণেতা। বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক লেখার জন্য বিখ্যাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর লেখায় যে আশার আলো ফুটে উঠেছিল পরবর্তীকালে তিরিশের দশকের সে আলোর চিহ্ন আর দেখা যায় না। তিনি ঘোষণা করেন যে, অপরাধ আর মূর্খতার ফলে ব্যক্তি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে—এ ছাড়া জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করার আর কিছু নেই। ক্রমশ তিনি সমাজ বাস্তব ছেড়ে রহস্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। শেষ জীবনে এল-এস-ডি সেবন নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর 'ব্রেভ নিউওয়ার্লড' নেতিবাচক ইয়োটোপিয়া (negative utopia) প্রচার ও সমাজবাদ বিরোধিতার দরুণ এক শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত।